জবানবন্দি

অমরেন্দ্র ঘোষ

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥
॥ কলিকাতা—৬ ॥

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ-পট :
শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬০

মুদ্রাকর :
মহাদেব মণ্ডল
রূপরেখা প্রেস
৩৩-ডি মদন মিত্র লেন
কোলকাতা-৬

জবানবন্দি

ভূমিকা

সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ আজ আর নেই; কিন্তু তিনি আজ আর এক মূর্তিতে আমাদের কাছে সমুপস্থিত "জবানবন্দি" নিয়ে। "জবানবন্দি" জীবনচরিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সাহিত্যিকের জীবনচরিত হওয়াতে অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে। জীবনের কথা সত্যি সত্যি সাহিত্যের কথা হয়েছে।

অমরেন্দ্র ঘোষের জীবন কুসুমাস্তৃত পথে চলে নাই, তাঁর জীবন-পথ কণ্টকাকীর্ণ। পদে পদে তিনি হোঁচট খেয়েছেন পদে পদে তিনি নাকানি চবানি হয়েছেন; কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রকৃতি সাহিত্যিক কিছুতেই দমেন নি। তাঁর আত্মীক বল ছিল অসাধারণ। সেই বলেই তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষকে অনেকে লেফটিস্ট বা বামপন্থী সাহিত্যিক বলতেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন হিউমেনিস্ট বা মানব দরদী। যেখানেই তিনি দেখেছেন বৈষম্য ও পীড়ন সেখানেই তিনি হয়ে পড়েছেন দুর্দম ও অনমনীয় এবং তাঁর লেখনী হয়েছে অনলবর্ষী। কিন্তু এই অনলে কেহই দগ্ধ হন নি; বরং তাঁর বক্তব্য অগ্নিশুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য হয়েছে। তাঁর "চরকাশেম", "বে-আইনি জনতা" বিশেষ করে "ভাঙছে শুধু ভাঙছে" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ মনের আনন্দে গেয়ে গেছেন—যা দেখেছি যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। অমরেন্দ্র ঘোষও দেখেছেন প্রচুর কিন্তু পাওয়ার অঙ্ক সাহিত্যিকের পক্ষে ছিল কলঙ্কজনক। বাইশখানা বই লিখেও তিনি অভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এর জন্য দায়ী কে?—লেখক না বেদরদী পাঠক সমাজ না সামাজিক অব্যবস্থা? ভবিষ্যৎকালে হয়ত এর উত্তর মিলবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বইর তালিকা

১। দক্ষিণের বিল ১ খণ্ড, ২ খণ্ড
২। চরকাশেম
৩। ভাঙছে শুধু ভাঙছে
৪। পদ্মদিঘীর বেদেনী
৫। মন্থন
৬। কুসুমের স্মৃতি
৭। বে-আইনি জনতা
৮। কনকপুরের কবি
৯। জোটের মহল
১০। একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী
১১। ঠিকানা বদল
১২। অহল্যা কন্যা
১৩। রোদন ভরা এবসন্ত
১৪। স্বনির্বাচিত গল্প
১৫। মন দেয়া নেয়া
১৬। নাগিনী মুদ্রা
১৭। কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু
১৮। অমরেন্দ্র ঘোষের সেরাগল্প (যন্ত্রস্থ)
১৯। একটি স্মরণীয় রাত্রি
২০। মৃগকস্তুরি
২১। দক্ষিণের বিল তৃতীয় খণ্ড
২২। জিহজোর

মুখবন্ধ

লেখকের জন্মকাল—

(ইং) ১৯০৭, ৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(বাং) ১৩১৩, ২২শে মাঘ।

জবানবন্দি রচনার কাল : ৩১.১২.৫৭—২৮.২.৫৯

কল্লোল যুগে লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৪ সনে 'বঙ্গবাণী' আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর 'শ্মশানে বসন্ত' কবিতা প্রথম প্রকাশিত রচনা। ঐ বছরই ভাদ্র সংখ্যা 'কল্লোল'-য়ে তাঁর প্রথম গল্প 'কলের নৌকা' ছাপা হয়। তারপর 'প্রগতি' 'ধূপছায়া' 'কল্লোল' 'বঙ্গবাণী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি কাগজে কিছু গল্প কবিতা লিখে দীর্ঘদিন সাহিত্য থেকে অজ্ঞাতবাস। এ সময় তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরে, নিজের আদিবাস পূর্ববঙ্গে গিয়ে স্থায়ী বসবাস সুরু করেন।

একেবারে অজ পল্লীগ্রাম। সপ্তাহে একদিন মাত্র ডাক বিলি হয়। তাও আবার একটু অজুহাত পেলেই বন্ধ। নিকটে পাঁচ সাত মাইলের ভিতর একটা তেমন ইস্কুল পর্যন্ত নেই। কলেজ, লাইব্রেরী তো আকাশকুসুম, এইভাবেই লেখক নদী বিল ঝিলের বেষ্টনীতে আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসিত হয়ে থাকেন। পুঁথির বদলে পাঠ করেন মানুষ। মাটির সঙ্গে যারা অন্তরঙ্গ তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অর্জন করেন জীবন।

১৯৪৭ 'বাঙলা ও পাঞ্জাবে ঐতিহাসিক ভাঙন' অমরেন্দ্র ঘোষ সপরিবারে ভাসতে ভাসতে আবার কলকাতায় এসে আশ্রয় নিলেন। প্রায় দুই যুগ বাদে সাহিত্যে পুনরাবির্ভাব। এখন দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠা, না সাহিত্যে? তিনি বেছে নিলেন সাহিত্য। 'চরকাশেম' এবং 'পদ্মদীঘির বেদেনী' উপন্যাস দুখানা এক তারিখে পুস্তকাকারে বেরুবামাত্র সে প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন করলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মাশুল দিতে হল চালু স্বাস্থ্যটি।

১৯৫৩-তে তাঁর স্বাস্থ্য আরো ভাঙল। ১৯৫৭-তে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। এই সময় তাঁর খেয়াল হল, এত কাল এ সমাজের যা খেয়েছেন তার তো হিসাব-নিকাশ দেয়া হয়নি! শ্রীঘোষ 'জবানবন্দি' রচনায় হাত দিলেন, এবং একপাতা লিখেই হাসপাতালে চলে গেলেন। অস্ত্রোপচার ব্যতীত তাঁর বাঁচার উপায় নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার ক' বছর ধরে শ্রীঘোষকে ১২৫৲ টাকার একটি মাসিক সাহায্য দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর ব্যয়ের তুলনায় এ বুদ্বুদবিন্দু। কয়েকটি পত্র-পত্রিকা সংবাদপত্রে তাঁর সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা বেরিয়ে পড়ে।

বহু গুণমুগ্ধ পাঠক পাঠিকা সুধী বন্ধুজন সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শুভেচ্ছা ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও দেড়শত টাকা সাহায্য করেন। শ্রীঘোষের ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসার তুলনায় এ সাহায্যও কিছু নয়। তবু তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে, এই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি সম্বল করে অনিবার্যকে আপাতত ঠেলে সরিয়ে দেন। এবং শেষ করেন জবানবন্দি লেখা। এ গ্রন্থ তাঁর পরিণত মনীষার অন্যতম সাহিত্য-কীর্তি।

বিনীত
প্রকাশক

॥ এক ॥

৪।১।১২।৫৭ রাত ২—বেলা ১০টা

মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছি। একেবারে সজ্ঞানে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আজ বোধ হয় একান্ন বছরের অপরাহ্ণ। অপরাহ্ণ নয়, সায়াহ্ণ নেমে এসেছে আমার জীবনে। ওষুধে ডাক্তারে কাজ হচ্ছে না। আমি সাধারণ লাক্ষ্যণিক চিকিৎসার নাকি বাইরে। তবু সংগ্রাম করছি, বাঁচতে চাই!

এ পৃথিবীর ফুল জল নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা মনে আসছে না, রূপ রস মধুর জন্যও এ মুহূর্তে কোন আকর্ষণ নেই, শুধু একটু নিষ্কলঙ্ক বায়ু চাই। প্রতি মুহূর্তে শ্বাস বোধ হয়ে আসছে, বায়ু বায়ু পরমায়ু চাই।

শীতের নিশুতি রাত। পৌষের হিমেল হাওয়া চাবুক চালাচ্ছে। পথচারী কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। দু'একটা ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসছে বটে, কিন্তু আমিও লাঠি নিয়ে তৈরী। টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছি, আবার পিছিয়ে আসছি। চেষ্টা করছি একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য। বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি, তবু সংগ্রাম করছি। কুকুরের কামড়ে আমি মরতে রাজী নই।

একটু হাসি পায়—হায়রে পাড়ার কুকুর, তবু চিনতে চায় না। ওদের অনেকের মতো আমিও উৎখাত তবু সহানুভূতি নেই।

আমার দৃঢ়তা দেখে তিনটা হটে গিয়ে, পাঁচটাকে ডেকে নিয়ে আসে। সদন্ত ঘেউ ঘেউ—এবার তিন দিক থেকে অভিযান।

ভোলার বন্যায় মরিনি। পদ্মা-মেঘনার তুফানে ডরাইনি। দেখেছি অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত। বসত ঘরেও কি ক'বার

আগুন লাগেনি! এক মাসে না হয় তিন সের ওজন কমেছি। তবু অস্থি মজ্জায় শক্তি আছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে লাঠি ঘোরাই। আমি থোড়াই গ্রাহ্য করি এই চরিত্রহীন কুকুরগুলোকে।

ওরা পিছিয়ে যায়।

আমি এগিয়ে চলি।

ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসে চীৎকার।

আবার নিস্তব্ধতা। খানিকটা কুয়াশা, খানিকটা অন্ধকার। বাল্‌ব নেই। হয়ত চোরের এ প্রাথমিক কর্ম। কিন্তু আজ সুবিধা হবে না। একটা বিনা মাইনের পাহারাওয়ালা ঘুরছে।

আহা গৃহস্থ ঘুমাক!

এবার আমি শীতের সাঁইত্রিশটা রাত ঘুমাতে পারছি নে। এমনি কেটেছে আরো চারটে বছর। এবার মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। আহা যে যেখানে আছ—ঘুমাও, আমি জেগে রয়েছি পাহারাদার।

পায়ে ডবল মোজা। জঙ্ঘা থেকে কোমর পর্যন্ত লেপটান গেঞ্জির ট্রাউজার, তার ওপর ফাল্‌তু লুঙ্গি। গায় তুটো গেঞ্জি। একটা ফুলহাতার সোয়েটার, তার ওপর দামী উলের পুলওভার। তবু বুকটার জন্য আশঙ্কা। একটা স্কটস্ উলের পাঞ্জাবী। সবগুলোর ওপর একটা হাওয়াই কোট, সুতীর। তবু শিশিরের ভয় গরম চাদর। মাফলার জড়ালে শ্বাসকষ্ট আরো বেড়ে যায়। তাই প্রকাণ্ড একটা সাদা কাপড়ের ফালি মাথায় এবং গলায় জড়ান।

পাগল নাকি?

কুকুরগুলোর দোষ দিয়ে লাভ নেই। দিনের বেলা তারা আমায় এভাবে কখনো দেখেনি।

আমি 'চরকাশেম'-এর কথাশিল্পী—আমি 'কনকপুরের কবি' মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি।

কুয়াশা ছাড়িয়ে নির্মল বাতাস। খানিকটা হাঁ করে পান করে নি-ই। মেরুদণ্ডটা সোজা করে দাঁড়াই। ষোলো আনা সোজা

হয় না। শুধু একটা ভঙ্গী আসে। 'জোটের মহল'-এর নায়ক দিবাকরের কথা মনে পড়ে। সেই বিপ্লবী বিদ্রোহী নেতার কি আজ কোমর ভেঙ্গেছে ?

না, না তা ভাঙতে পারে না। সাময়িক একটু জখম হয়েছে মাত্র। অনিবার্যকে সে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। বন্ধু বলেছেন, **Cowards die many times before their death.**

হঠাৎ অনুভব করি ভূমিষ্ঠ হচ্ছি যেন। শিশুর ক্রন্দন শুনতে পাই। বিপুল লড়াইয়ের কান্না। তার পরই দেখতে পাই একটি বলিষ্ঠ তুধে-হলদে কিশোর কামাখ্যা পাহাড়ের চড়াই ভাঙছে। পিঠে হ্যাভার স্যাকের মতো কি যেন ওজনদার। মেরুদণ্ডটা একটু বাঁকা।

আমি বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকি।

কিশোর অমরেন্দ্র চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ী চড়াই।

আজ কি বেশী ভেঙেছে শিরদাঁড়া ?

কামাখ্যা পাহাড়ে সূর্য উঠেছে। ঘুমন্ত কলকাতা একবার ওঠো—সত্য হলেও মিথ্যা একটা সান্ত্বনা দাও। এ রুগ্ন বুড়োকে বাঁচাও। এখনোও তার অনেক বাকি রয়েছে লেখা। সে তার মেরুদণ্ডটা ঠিক দেখতে পাচ্ছে না।

তু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে চোখের পালক বেয়ে।

সংগ্রামীর অশ্রু ?

না, না তোমরা—বন্ধুরা, হতাশ হ'য়ো না। ও চোখের জল নয়। তা পুড়ে বাষ্প হয়ে অনেক দিন উড়ে গেছে। শীতের রাত্তির, অনেক শিশির ঝরেছে কিনা !

নেই নেই বলেও আমার জন্য শিশির ঝরাবার বন্ধুর অভাব নেই। দূরে নিকটে পরিচিত অপরিচিত। এবার তুঃখের কষ্টিপাথরে খাঁটি মেকি যাচাই হয়ে যাচ্ছে। তাইতো বাঁচতে চাই।

দাঁড়াও, একটু হাঁপাতে দাও—বড্ড কনকনে হাওয়া দিচ্ছে

উত্তুরে। একটু হাঁটতে দাও। উর্ধ্বগতি পেটের বায়ু হৃদপিণ্ডে এসে ঠেকেছে। হতাশ ডাক্তার আত্মীয় বন্ধুরা বলছে, দিন রাত্রে মোটে না ঘুমাইলে নাকি বাঁচব না। তাই হাই ডোজে বিষাক্ত ঘুমের ওষুধ খাওয়া। তার নিচুমুখী চাপও রয়েছে হৃদপিণ্ডে। দু'মুখেই ছুরি। একান্ত চাষাড়ে শিল্পী, সেই জন্যই বোধ হয় ভেদ হচ্ছে না কলজেটা।

দাঁড়াও সবুর করো, অনেক কথা বলার আছে। হে সংবেদনশীল পাঠক, তুমি কি আমার অক্ষমতাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে না?

শ্রদ্ধা এবং ধৈর্য না থাকলে তুমি সিনেমায় অথবা যেখানে খুশি যাও। আমার কাহিনী wishful thinking নয়। বাস্তব নিষ্ঠুর তিক্ত-কষায়, হয়ত মাধুর্যও থাকবে।

কিন্তু এখনো মাত্রা বলতে পারছি নে। মহৎ কিছু থাকলে তা চয়ন করে নিতে হবে জহুরীর মত। এখন আর আমি কোন দায়িত্ব নেবো না। অসুস্থ মানুষ, কেবল জবানবন্দী দিয়ে যাবো।

ন্যায়দণ্ডের প্রতিভূ হাকিমের কাছে কে কে জবানবন্দী দেয় জানো? প্রধানতঃ বাদী বিবাদী। কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে। শুধু একটি লোকের জবানবন্দী প্রায় প্রশ্নাতীত। সে হচ্ছে মুমূর্ষু। আমাতে এবং মুমূর্ষুতে এখন তফাৎ কি?

আমি জীবনের সমস্ত বৃত্ত প্রায় পরিক্রমা করে এসেছি। প্রভাতে সূর্যকে প্রণতি জানিয়েছি। ঘাম ঝরিয়েছি সমস্ত মধ্যাহ্নের জ্বালায়। এখন দেখছি সমস্ত তেজের আকর সেই সূর্যের সকরুণ মহান রূপ। এর পর অন্ধকার। কালো তুলির টানে একাকার হয়ে যাবে এপার ওপারের সব দৃশ্যপট। এই অভিজ্ঞতার কাহিনীই বলব। একটু দাঁড়াও নিঃশ্বাস নিতে দাও বন্ধু।

১।১।৫৮ বেকাল ৪-৬টা

রাত অনেকখানি শেষ রাত্তির দিকে গড়িয়ে গেছে। শহরতলির শেয়ালগুলো নির্ভয়ে উঠেছে ডেকে। পথচারী কুক্কুরগুলো কাপুরুষের মতো চ্যালেঞ্জ করছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। কিন্তু আমার বেলা ঠিক উল্টো। ওদের বন্ধু উঞ্ছবৃত্তি করে করে আর চরিত্র নেই। যে জামা-কাপড়েই থাকি, আমি ওদের পাড়ার মানুষ তো।

ভোরের আভাস পাচ্ছি। শুকতারাটা জ্বল জ্বল করছে পূর্বাকাশে। বিস্মৃতির স্মৃতির মত একটা দোয়েল ডেকে চলেছে দূরে। ভোরের ট্রেনের সিগন্যাল ডাউন হয়েছে, সবুজ সিগন্যাল। সিল্‌ক মিলে শোনা যাবে ছটার বাঁশী। হ্যাঁ ঠিক বলেছি, ঐ যে একাদশী চায়ের দোকান খুলেছে। এক্ষুনি বায়ুতে পরমায়ু এসে পড়বে অপর্যাপ্ত। সূর্যালোকে রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ অক্সিজেন।

তখন আমার বক্তব্যটা খুব জমবে, শীগ্‌গিরই সকাল হবে, —নিশ্চয় জেনো। তাই বহুত মিনতি করি একটু ধৈর্য ধরো।

তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো, তোমার তো অদ্ভুত কাঙালপনা বাঁচার জন্য! অনিবার্যের জন্য প্রস্তুতি নেই। মুখে বড় বড় কথা, মনে ছেলেমানুষি আকুতি!

ছিঃ ছিঃ লজ্জা দিও না আমায়। একদা আমার পাখীর শিষে ঘুম ভেঙেছে। এখন নিত্য জল-কল নিয়ে ক্ষেন্তির গলাও শুনছি। দেখেছি তট অরণ্য বালুকা বিস্তার, কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবর্ণ-দ্যুতি, এখন কংক্রিট, পাইখানায় লাইন। খতিয়ে দেখলে কোন সাধ আমার অপূর্ণ নেই। ভালবাসা দিয়েছি ও পেয়েছি বিস্তর। কি স্বকীয়; কি পরকীয়া। জেনেছিও বিস্তর। আজ আমার আর কোন মোহ নেই। এই রোগ যন্ত্রণার ভিতরও মন আমার বর্ষার গাঙের মত তৃপ্তিতে ভরপুর। এখনো যে কত সহানুভূতি পাচ্ছি দূর ও নিকটের, কত শুভেচ্ছার রাশী!

তাই তো বাঁচতে চাই। আমার তুচ্ছ এ-জীবনের জবানবন্দী শোনাবার জন্য নয়। আমি কণ্ঠ—তোমরা গান, আমি ভেলা—তোমরা যাত্রী, আমি আরশি—তোমরা জ্যোতি, এই অনুভূতিগুলি দরদী মরমিয়া পাঠক-জনতার কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

ঐ ভোরের আলো। সূর্য উঠলো বলে, বাতাসে পাচ্ছি অক্সিজেনের পুরো গন্ধ, আর আমায় ঠেকায় কে? আজ তো আমি বাঁচব। তবে ভোর থেকেই গল্প শুরু করি।—হে সূর্য প্রণাম।

কবি বলেছেন—

'মৃত্যুরে মন্থন করি নবজন্ম কাঁপে থরোথরো।'

(বুদ্ধদেব বসু)

॥ দুই ॥

আমি যদি ভেলা হই, যাত্রীর কথা বলতে হলে আমার ইতিহাস কিছু এসে পড়বেই—কারণ যিনিই পারাপার হয়ে থাকুন আমার বুকেই তো পা ছুঁইয়েছেন! আলোর উৎস সন্ধানে বেরুলে আয়নাকে বাদ দেওয়া যায় না। তেমনি রামচন্দ্রকে খুঁজতে হলে অবশ্যই জেগে উঠবে অহল্যা। যত তুচ্ছই হক মহাকাব্য থেকে মুছে ফেলা যাবে না শবরীর প্রতীক্ষা।

আমি আমার পারিবারিক পরিচয় এখানে সংক্ষেপেই দেব। কারণ বিস্তৃত ভাবে সে ইতিহাস 'দক্ষিণের বিলে' লিখেছি। সেকালের পটভূমি এবং পরিবেশ রচনা করে চিরকালের একটা কাহিনী বলতে প্রয়াস পেয়েছি। শুরু করেছিলাম ক্লাসিক ধরতাই দিয়ে ঢিমা তালে। সেকালের গতি প্রকৃতিও ছিল অমনি ঢিমা। মাঝ বরাবর এসে কোন রকমে সোনালী ফসল—নানা জাতের সরু মোটা ধানের ঐশ্বর্য ঘরে তুলে আমাকে কলম থামাতে হল। সে এক দুঃখের কাহিনী। শুরুতেই না বলে সময় মতো বলা যাবে।

তবু এখানে একটু সূত্র না রেখে জোর মিলাতে পারছি নে। ক্ষমা করো পাঠক আমি নিরুপায় কিন্তু।

স্বনামধন্য প্রকাশক বলেছিলেন—এত মোটা এক নামে কি একখানা কেউ বই লেখে, যার আছে ন্যূনতম কমার্শিয়াল কাণ্ডজ্ঞান! এ বলা নয়, প্রবীণ প্রাচীন প্রকাশকের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। আমার কানে ঠেকল যেন ধমক! আমি দরিদ্র লেখক চমকে গেলাম।

চুপি চুপি একজন কেরাণীকে বললাম, আপনাদের একখানা বইয়ের তালিকা দেবেন কি?

বড় আফসোসের কথা তাঁর নামটি আজ স্মরণ করতে পারছি না। অনেক মুখের মেলায় মুখখানাও হারিয়ে ফেলেছি—তিনি আমার মনের কথা বুঝে দু'তিনখানা তালিকা এনে দিলেন। পেন্সিল টেনে ইংগিতে বুঝিয়ে দিলেন যে বঙ্কিম এবং শরৎচন্দ্রের খুব কম বই-ই আছে যার দাম তিন টাকা।

তবে কি শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরীরা এ কাণ্ডজ্ঞান মগজে রেখেই কলম ধরেছিলেন?

ধন্য ধন্য বলে আমি মাথা নোয়ালাম নীরবে। আজ খুব একটা শিক্ষা হল এটা ঠিক, বিংশ শতকের মধ্য পর্ব। উনিশ শ' একান্ন—তবু এ যুগে এদেশে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেতে হলে—পেতে হলে দ্বাদশ পঞ্চদশ সংস্করণের সম্মান, দামটা হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কোথায় তোমার রসিয়ে রসিয়ে বহুধা বক্তব্য বলার জায়গা? থাকলে প্রচুর মালমশলা তা গুটিয়ে রাখাই ভাল।

৩।১।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা।

প্রশ্ন উঠতে পারে নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা কি করে ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেল? সেখানে প্রকাশকের জমিদারী মেজাজ খাটাবার সুযোগ নেই। খাস ঠাকুর স্টেট, বনামে বিশ্বভারতী।

বলতে গেলে লেখকই প্রকাশক। অতএব মূল্য বেঁধে দেওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু তবু কি রবীন্দ্রনাথ তেমন সংস্করণ সম্মান পেয়েছেন? ঐতিহাসিক, গবেষক ছাত্রমণ্ডলী ভেবে দেখবেন কেন তিনি পৌঁছুতে পারেননি উপন্যাসের মাধ্যমে ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে'? এর কৈফিয়ৎ কি শুধু দাম?

আমি অনেক দিন বাদে সবে ক'বছর সাহিত্যের বাজারে ঘোরা-ফেরা করছি। আমার জানা সম্ভব নয় এ দুনিয়ার সমস্ত সালতামামীর হিসাব। দু' কথা মনে এলো লিখে গেলাম—ভুল ভ্রান্তি শুদ্ধ করবেন ঐতিহাসিক, পণ্ডিতেরা। এ বিষয় সজনীদা' আমার মনে হয় পারঙ্গম। তাঁর আত্মস্মৃতিতে রয়েছে, নৌকাডুবির নাট্যরূপ না বাণীরূপ দিতে গিয়ে যেন অনেক আদাজল খাওয়ার কথা।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট এবং বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে বলছি—এখান থেকে ক কদম আর "আত্মস্মৃতি" প্রকাশকের প্রতিষ্ঠান? উৎসাহী বুদ্ধিমান পাঠকের আর বইও কেনা লাগবে না। একটু হাঁটলেই যাচাই হয়ে যাবে আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য।

৪।১।৫৮ সকাল ৯-১০½টা

কেরাণীটি শেষকালে ফিসফিসিয়ে বললেন, এবার থেকে ফর্মা হিসেব করে লিখবেন—নইলে প্রকাশে অসুবিধে। বারো চৌদ্দ ফর্মাই যথেষ্ট। সেই একই তো কথা, বেশি ফেনিয়ে লাভ কি! আর জেনে রাখুন এক নামে খণ্ড খণ্ড বই এদেশে চলে না। তবে তেমন নাম-কাম হলে তবু খানিকটা—।

বুঝলাম প্রাজ্ঞ প্রভুর মুখের বাণী। সেদিন উঠে পড়লাম। বাইরে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে সব ভুলতে চেষ্টা করলাম। এবং আজ ভুলেই গেছি তাঁর মুখখানা যিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাথমিক ভূ-পরিচয়—গান নয়, সাহিত্যের গ্রামার।

আমার অকৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ার জন্যে এ লেখা নয়। আগামী দিনের যোদ্ধাদের জন্য লিখছি। আমার অনুরোধ তাঁরা লেফ্‌ট রাইটে যেন কাঁচা না থাকেন। থাকলেই অ্যাবাউট টার্নের মুখে গড়িয়ে পড়বেন। এক স্বস্তি ছিল, যদি ইতিহাসের শিক্ষায় কেউ এপথে পা না বাড়াতেন। কিন্তু প্রীতি-ভাজন অধ্যাপক বন্ধু শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি জব্বর কথা একদিনে বলেছিল, অবশ্য কথাটা রবীন্দ্রনাথেরই, 'অমরদা সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড় !'

সে যাই হোক, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। আবার 'দক্ষিণের বিলে' চলে যাই, যে উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ জড়িত। নায়ক বিপ্রপদ সেকালের প্রতিভূমূলক চরিত্র। নায়িকা কমলকামিনীও তাই। কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই কম্পাস ঘুরিয়েছি। এ আমার ইচ্ছা নয়, এরও কারণ আছে—তা ধাপে ধাপে এসে পড়বে।

৫।১।৫৮ সকাল ৪ ৬টা

'দক্ষিণের বিল' পড়লেই বোঝা যাবে সেকালের ও একালের সমাজ আদর্শে কত পার্থক্য। তখন মানুষ ছিল আদর্শবাদে বিশ্বাসী। এখন জীবনবাদে। তখন সমস্ত শ্রেয় বোধ ছিল ঈশ্বরে নির্ভরশীল। এখন মানুষে। তখন সব কথার শেষ কথা ছিল ত্যাগ, আজ দেখতে পাচ্ছি ভোগ। তখন জীবনটাই ছিল বাণী। এখন বাণীর সঙ্গে জীবনাদর্শের কোন সঙ্গতি নেই। তখন ছিল গলা, এখন মাইক। তখন ঘরে বাইরে বস্ত্র ছিল একখানাই। এখন সর্বত্রই শুনতে পাই, মিটিংকা কাপড়া লে আও বেয়ারা। অন্তত উঁচু মহলে তো বটেই। নীচুতলা তো একেবারেই উলঙ্গ। মধ্যবিত্তও প্রায় নিম্নবিত্তের মতই বিবস্ত্র। এদের কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু বলতে হচ্ছে সে জন্যই—এখনো অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার

মত কিছু মহত্ত্ব এদের মধ্যে প্রবহমান। যখন দেখি তখনি বিস্মিত হই! মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। এখনো তেমন নৈরাশ্যের কিছু নেই।

কত শক হূন মোগল পাঠানের রক্তাক্ত তলোয়ারে এই ভারত ভূমির কৃষ্টি, সভ্যতা বার বার টুকরো টুকরো হয়েছে, ইংরেজের তোপের মুখেও ধ্বংস হয়েছে বহু সংস্কৃতি। তবু মনে হয় পর্বত কন্দরে ঘাসে জলে মাঠে—অতীত হতে বর্তমানে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল গৈরিক বসনা গায়ত্রী, যার জপমালার প্রতিটি রুদ্রাক্ষে লেখা 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আমরা আর কোন বাদে বিশ্বাসী নই—চাই হিউম্যানিটি। আমাদের সমস্ত তপস্যার কাম্যফল হিউম্যানিজম!

পাঠক তুমি কি অস্বীকার করো এ কথা? যে বাদের পথ ধরে আমরা আজ এগোই না কেন, মিশতে হবে গিয়ে সাগর মোহানায়—সর্বকালের সব মানুষের শেষ ঠিকানা।

সেই ঠিকানা পর্যন্ত 'দক্ষিণের বিল'কে টেনে নেওয়ার আগ্রহ ছিল। কিন্তু ক্যানভাসে তুলি বুলাতে না বুলাতে হাত টেনে ধরলেন প্রকাশক। তাই 'দক্ষিণের বিলে' স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা কাহিনী থাকলেও, আসলে অসম্পূর্ণ দুখণ্ড উপন্যাস। যদি তুমি পড়ে থাকো, আর যদি তোমার ভালও লেগে থাকে, তবু বলব আমি যা লিখতে চেয়েছি তার প্রস্তাবনা মাত্র। দেখান হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। শুধু ফসল তোলা হয়েছে। তার ঐশ্বর্যে যে কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্থান পতন হল, তার চিত্র তো আকতে পারিনি।

তুমি বলতে পারো, এখন আবার নতুন করে লেখো, নতুন উদ্যমে কলম ধরো।' সব গানেই তো যেখানে শেষ সেখান থেকে আবার সুরু। 'দক্ষিণের বিল' অনেক দূরে ফেলে এসেছি, অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির কাঁটা ঝোপে চাপা পড়েছে, সে ঝিকিমিকি ছবি। তখন কৃষক ছিলাম, এখন সাহিত্যের মজুর। রোগে দারিদ্রে পথ

হারিয়েছি। সব চেয়ে বড় কথা—'এক চাকাতেই বাঁধা, পাকের ঘোরে আঁধা,' আমায় হারান সুর খোঁজার ছুটি দিচ্ছে কে? রাহা খরচও তো হাতে নেই।

৫।১।৫৮ বৈকাল ৬-৭টা

কোন বাদকে নিন্দা কিম্বা ব্যঙ্গ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা বলে যে যুগ পালটাচ্ছে একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই। অনেক ভাল গেছে, তার বদলে নতুন ভাল এসেছে। আলোর সঙ্গে উপমা যদি দেই, অন্ধকারও যে এসেছে একথা মানতেই হবে। যে শক্তিহীন সে সন্ধি করুক, যে সুবিধাবাদী মাথা বিকিয়ে দিক, আমি কিন্তু লড়বই। ধ্যানাসনা গায়ত্রীকে আমি তোমাদের মধ্যে দেখেছি। তোমরা শান্তি চাও, তোমাদের জপমালাও মানবতা-বোধের রুদ্রাক্ষ সমষ্টি। তাই তোমরা কালোবাজার দেখলে ক্ষেপে ওঠো, মিথ্যাকে দ্বর্থহীন মনে ঘৃণা করো। তোমাদের বিরাট অংশ এখনো হিউম্যানিটির পূজারী। নইলে কেন তোমরা নার্স হয়ে সেবা করো? পর্বত কন্দর ডিঙিয়ে কেন তোমরা মেডিকেল মিশন নিয়ে চায়নায় যাও? কেন তোমরা ডাঃ কুটনিশ কা অমর কাহিনী সৃষ্টি করো? আর উপমা বাড়ান বোধহয় বাহুল্য।

আমার বাবার নাম জানকীকুমার ঘোষ, মার নাম শিবসুন্দরী। তাদের হুবহু চরিত্র চিত্রন আমার সাধ্যাতীত—তবে ক্ষীর তুলতে চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য রেখেছি যুগের দিকে। তাই ফটো না হয়ে বোধহয় কিছুটা আর্টের পর্য্যায় পৌঁছেছে। অনেক দরদী পাঠকের রায় শুনেই একথা বলতে আজ সাহস পাচ্ছি।

৬।১।৫৮ বৈকাল ৬-৭½টা

'দক্ষিণের বিল' তখনও বসুমতী মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুচ্ছে। উনিশ শ' আটচল্লিশ থেকে উনিশ শ' পঞ্চাশের কথা বলছি।

Encyclopædia of Information & General Knowledge নামে একখানা বই বেরিয়েছে। Literature in 1950. Chief Collaborators পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—কিন্তু নানা কারণেই নামগোত্রহীন হয়েছিলেন আসল সম্পাদক বিজয় ব্যানার্জি। এও হয়ত প্রকাশকের দয়া, বইয়ের ব্যবস্থার সা-রে-গা-মা। তখন পর্যন্ত হারমনিয়মই ধরতে শিখিনি, ষোল আনা টাকা আনা পাইব গোমড় কি করে বলি! বিজয়বাবুর সঙ্গেও নতুন আলাপ। তিনিও তো সম্মান খুইয়ে সব ফাঁস করতে পারেন না আমার কাছে।

এখন আর রমেশদা'—ওরফে রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব কথা না বলে উপায় নেই। বুঝতে পারছি আবার প্রসঙ্গান্তরে পাঠককে নিয়ে যাচ্ছি। তার ধৈর্যের ওপর চালাচ্ছি ছুরি। কিন্তু যখনই রমেশদার পরিচয় পাবে, তখনই তুমি বিস্ময়ে চমকে উঠবে —এমন চরিত্রও বাঙলা সাহিত্যে পুরোপুরি কাগজ কলমে কালির অক্ষরে অনুপস্থিত ছিল!

রমেশদার প্রধান পরিচয় মাথায় একটি চকচকে পাকা টাক, মুখে প্রতিবাদ—বুকে মায়ের স্নেহ নির্ঝর। ভাষা দার্ঢ্যে যুক্তিতে অনমনীয়। তবু বলব রোম্যান্টিক। তুমি ভাল লেখা পাঠ করে শোনাও, অমনি রসিক চিত্ত উদ্বেল হয়ে চোখে দেখা দেবে জল। তখন পুরুলেন্সের চমশা খুলে তিনি কাপড়ের খোঁট খুঁজতে ব্যস্ত, বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি হয়ত একমত নন। কিন্তু যেখানে মহৎ তা তাঁকে আকর্ষণ করবেই। এমন একখানা কষ্টিপাথরেই যাচাই করে আমি নতুন করে 'দক্ষিণের বিল', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'বে-আইনি জনতা' প্রভৃতি লিখেছি। প্রতিভার চেয়েও বড়, তার পাণ্ডুলিপিতে স্বীকৃতি। এ উৎসাহের বলিষ্ঠ রসায়ন আমি আজও পাচ্ছি। আমি রুগ্ন অভাবে অভিযোগে আমি শ্বাস ফেলতে পারছি নে, তবু বলতে চাও আমি মরব কি? বলতো আমার মত ক'জনে এমন এলিকসার-ডি-ভাইন্ পেয়েছে!

৭।১।৫৮ বৈকাল ৪-৮টা

আর একটি বন্ধুর কথা এসে পড়ছে—রমেশদার মত আমাদের একই বাড়ির বাসিন্দা। ৩৮ প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড কলিকাতা ৩৩-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্র। সাহিত্যিক নয়, পাঠক নয়—স্রেফ শ্রমিক। কোন্ এক যেন ফার্মে কাজ করেন। ল্যাবরেটরিতে আট ঘণ্টা, বাইরে আট ঘণ্টা, তবে এ আইবুড়ো মানুষটির বোন ভাগ্নে ভাগ্নী মার পেট চলে। রাত বারটায় ফিরেও একবার উঁকি মারতে ভুল হয় না—কেমন আছেন ঘোষ মশাই? আজ একটু বেশি করে টাইকোপেপিন খাবেন। আমি যত দিন আছি ওষুধের জন্য ভাববেন না। এই নিন দু' আউন্স।

র‍্যাপারের নিচে দিয়ে একটি কাগজে মোড়া শিশি বেরিয়ে আসে সবিনয় নিবেদনের মত। সময়াভাবে ক'দিন দাঁড়ি গোঁফ বোধ হয় কামান হয়নি। সেই জংলা মুখে সকৃতজ্ঞ খুশির হাসি।

স্ত্রীকে বলি আলোটা বাড়িয়ে দাও। ভিতরে আসতে বলো ওঁকে।

স্ত্রী ভাবেন, আবার বুঝি বায়ুর চাপ বেড়েছে—আঘাত আসছে ইনসোমনিয়ার। তিনি শশব্যস্তে হ্যারিকেনের কলটা ঘুরান।

উজ্জ্বল আলোতে আমি অসাধারণকে দেখছি! ইনসোমনিয়া আমার তখনকার মত ছুটে পালিয়েছে?

ফণীবাবু বললেন, এখন আর ভিতরে ঢুকব না যে আটতলা-পটতলা পর্দার। বেশ শীত পড়েছে, বিশ্রাম করুন।

স্ত্রী বললেন, উনি এখনো খাননি। রাত একটা দুটো এইভাবে কাটিয়ে দিতে চান। তারপর বাকিটার সঙ্গে লড়াই করা চলে।

আপনি খেয়েছেন?

স্ত্রী একটু মাত্র হাসলেন। আসল জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, উনি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

তবে আমি দু মিনিটের মধ্যে খেয়ে আসছি, নইলে ওরা বসে থাকবে।

তাই আস্থন।

রাত বারটা বেজে গেছে। শীতের রাত্তির—লেপমুড়ি দিয়েছে বাড়ির প্রায় সবাই। খেয়ে-দেয়ে দিনমানের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফণীবাবু এলেন কিনা সঙ্গ দিতে? চোখে নিবিড় শ্রান্তির ঘুম, এলেন ইনসোমনিয়ার রোগীকে আগলাতে। একটা ঘণ্টা বসা মানেও তো একটা যুগ গত করে দেওয়া। একি সাহিত্য প্রীতি—না অন্য কিছু? আমি মনকে বলি দেখে নাও শিখে নাও—এমন সৌভাগ্য মানুষের জীবনে আসে কদাচিৎ।

পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢোকা মানে দুনিয়া ঠেলে আসা। ছোটবড় ওষুধের শিশি কৌটা বোতল ফিডিংকাপ পিকদানি কোন্‌টা উল্টায় ঠিক নেই। এক ফালি একখানা বারান্দা, তাতে বিছানা, সাহিত্য, রান্না।

ফণীবাবু গল্প সুরু করেন, আসামের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে রাজপুতনার মরুভূমি। বুনো হাতী, মার্বেল পাহাড়, মনিপুরী নাচ, পাহাড়ী বন্যা, মরুভূমির আঁধি কিছুই বাদ যায় না। কথায় অভিজ্ঞতায় খাদ নেই, ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের হাজার হাজার মাইল। এখন পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ, শেষকালে গুমড়ে ওঠেন যাবতীয় অসম বণ্টনের ওপর, প্রভুদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতজামাইয়ের নামে বাড়ী, পিপেয় পিপেয় মদ—আমদানির নামে জাহাজ চুরি। শুধু দিনখাটা মানুষ একটু কিছু দাবি করলেই মাথা গরম। আর বলেন কেন ঘোষ মশাই, সাধে কি মেহনতি মানুষ এত ক্ষেপে, সাধে কি এত ধর্মঘট, এত ঘেরাও?

বুঝলাম এ বাঘ একবার পিঁজরা ভাঙলে সর্বনাশ।

ফণীবাবু ফের এক মরুভূমির শেঠজীর লাল কুঠির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিকটের এক হ্রদের বর্ণনা করে যান, কি চমৎকার জল, কি চমৎকার দৃশ্য, ময়ূরগুলো পেখম মেলে নাচছে।

অমনি পেখম মেলে ফণীবাবুর মনও নাচতে চায়, মুক্তি চায় এ যুবক।

রাত দুটো ফণীবাবু উঠলেন, পরশু আবার দু-আউন্স এনে দেবো, আমি থাকতে মাত্রা কমিয়ে খাবেন না।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, দামটা নেবেন না?

ছিঃ ছিঃ ও কথা বললে আমি আর আসব না।

৭।১।৫৮ রাত্রি ৩-৬½টা

অন্ধের এক জনই গাইড থাকে। আমার জুটেছিল দু জন, কখনো ফণীবাবুর কখনো রমেশদার কাঁধে হাত রেখে ইদানীং বেরুতাম। ভিক্ষায় না বেরিয়ে তো উপায় নেই।

বিজয় ব্যানার্জির কাছে রমেশদাই আমায় প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নিন, সেই জল মাটিমাখা পূর্ব বাঙলার সাহিত্যিক।

নমস্কার, আসুন—বসুন।

এক প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, আজো মনে আছে স্পষ্ট সেই হ্যারিসন রোডের চিলতে কোঠাটির কথা। ভিতরে একজন জোর জবরদস্তি করে শোয়া যায়—বসলে দুজন। সুমুখে দক্ষিণ খোলা রাস্তার ওপর জানালা। ছিটকানি নেই, দড়ি দিয়ে বাঁধা, এই জানালার বিপরীত ফুটে আর এক জোড়া জানালা— বোধ হয় কোন মেয়ে হস্টেলের। এই ঘরে ঢুকতে গিয়েই একদিন 'সূর্যমুখীর মৃত্যু' গল্পটার পরিকল্পনা। আজ নায়ক নেই, নায়িকা নেই—গল্পটা কিন্তু রয়েছে। যখনই পাতা ওলটাই বন্ধু বিচ্ছেদে বিধুর হয়ে ওঠে মনটা, থাক সে কথা, যা বলছিলাম তাই বলি। ছোট একখানা বেঞ্চির মত তক্তপোশ ঘরের ভিতর। যেটুকু নড়াচড়ার জায়গা, তা পুঁথি পুস্তকে ঠাসা, ফাউন্টেন পেন, ক্যালেণ্ডার, টুথব্রাসের কাছে জুতার কালি।

মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে বিজয়বাবুর, মুখে কিন্তু টাটকা

হাসি। দাঁতে সুন্দরী সুলভ জ্যোতি, চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি, ইনি নাকি অনেকগুলো ভাষার অধিকারী। প্রশস্ত ললাটে যেন জ্ঞানের স্বাক্ষর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সসম্ভ্রমে আমিও বললাম, নমস্কার। একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম তাই দেরী হয়ে গেল হাত তুলতে, লজ্জিত হয়ে রইলাম।

একটু শংকিতও হয়েছিলাম ভিতরে ভিতরে।

বিষয়টা তবে খুলেই বলি, তখনো ১৯৪৮—৫০ স্বাস্থ্যটা এমনি ভাঙেনি, বই লিখলে কি হয়। দিনরাত জীবিকার দায়ে কলকাতা চষে ফিরি, আজো রমেশদা গাইড, তখনো ছিলেন গাইড। এখন রুগ্ন অক্ষম বন্ধুর—তখন উদীয়মান এক কথা সাহিত্যিকের। সচিব এবং সখার কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পড়েছি—ফ্রেণ্ড ফিলসফার এবং গাইডের কথা পড়েছি ইংরেজি সাহিত্যে। কলেজের পাঠ শুধু পড়েই গেছি, কিন্তু এতগুলো গুণের সংমিশ্রণ দেখলাম পরিণত বয়সে। তাই এক এক সময় দুঃখকে দুঃখ বলে মনে হয় না—মনে হয় এই বুঝি আসল রিয়েলিজেসন। মাঝে মাঝে পথ হারাবার, বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার কারণ না ঘটলে কি এসে দেখা দেয় বন্ধু, প্রজ্ঞা এবং পথপ্রদর্শক?

৯।১।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা

সারাদিন জীবিকার জন্য যাদের সঙ্গে, কাষ্টমের চড়াই ভাঙি, তারা ভাটিয়া, সিন্ধি, গুজরাটি ব্যবসাদার। কথায় কথায় চাঁদির জুতোর ঠোক্কর মারে। সাহিত্য, পাণ্ডিত্য তাদের ত্রিসীমায়ও নেই!

বিজয় ব্যানার্জির জগৎ ঠিক উলটো। এর আস্বাদ অর্থে নয়, চাঁদির চাকতি নয়—নিত্যকালের। তপস্বীর কাছে ব্রহ্মের স্বাদ, সংগ্রামীর কাছে হাতিয়ার, আর্তের কাছে জীবন-রসায়ন।

বললেন, লিটারেচার ইন্ 1950 পড়েছেন?

আমি বললাম, না।

রমেশদা বললেন, আপনারা এখন প্রেমালাপ করুন—আমি একটু ঘুরে আসি।

একটু ভুল হয়েছে গ্রন্থনে। এ যাত্রাই প্রথম সাক্ষাৎ নয় বিজয় ব্যানার্জির সঙ্গে। সাহিত্য-প্রেমিক সুধাংশু মোহন রায়ের বাড়ি অথবা রমেশদার ঘরেই যেন প্রথম আলাপ। দেখতে এলেন, আমার মত কাষ্টমে দিন খাটা একটা হ্যাঙলা-বাঙলা মানুষও নাকি লেখে? 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র পাণ্ডুলিপিটা একপাতা পড়ে নিয়ে গেলেন বগলে করে। তারপর আর পূর্বরাগের কোন প্রলম্বিত প্রস্তুতি নেই। ফের দেখা হওয়া মাত্র চিরকুমারের কৌমার্য ভাঙল। একেবারে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন। আমি যুবতী কুমারী নই তাই হয়ত বাঁচলাম, কিন্তু প্রতি অঙ্গে, হৃদপিণ্ডে রয়ে গেছে বিগতের রূপ-রস-গন্ধ।

বিজয় ব্যানার্জি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ ইনফরমেশন-খানা আমাব হাতে দিলেন, আমার হাত কাঁপতে লাগল।

...But most powerful and objective type of fiction, and yet romantic, produced in the recent time in Bengali are those of Amarendra Ghosh. His two outstanding works are 'Char Kashem' and 'Padma Dighir Bedini.' His 'Dakshhiner bil' which is being published in Basumati has the qualities of an epic and yet different in treatment compared with the other two books. Here is a genius whose creative mind can conceive of varied ideas and forms. He has already proved himself to be the most powerful writer since Sarat chandra...

এ নিতান্তই প্রীতির পুষ্পার্ঘ, তবু আমার জীবনে প্রথম কালির অক্ষরে অভিনন্দন, আমি যেন নেশায় অভিভূত হয়ে

পড়লাম। 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' বই হয়ে বেরিয়েছে। বুঝতে পারছি একটা যেন দুয়ার খুলেছে প্রায় দুই যুগ করাঘাত করে। শুরু করেছিলাম কৈশোরে কল্লোল যুগে আজ প্রৌঢ়। দুই যুগ বই কি। খোলা দুয়ারে বেরিয়ে, দেখলাম এবার সজ্জিত তোরণ। একটি নয় অনেকগুলি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই পথেই আমার আবার যাত্রা শুরু হক।

১০।১।৫৮ সকাল ৯-১১টা

'দক্ষিণের বিলে' খুঁজলে কিশোর অমরেন্দ্রকে পাওয়া যাবে আর তার কিশোরী অনুরাগিনীকে। এখানে দুজনেই রয়েছে ছন্দবেশে বেনামে। কিন্তু স্বনামে রয়েছেন অনুরাগিনী 'কনক-পুরের কবি'-তে ? চৌদ্দ পনের বছরের প্রথম প্রেম যে কী জিনিস ! অমৃতের স্বাদও কল্পনা করা যায়, কিন্তু এর আস্বাদ অবর্ণনীয়। পরকীয়া বলে আরো হয়ত অতুলনীয়। এখানেই বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে বোধ হয় আমার জীবন কাব্য মিশেছে। সে বয়সে যা বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পাই নি, শুধু পাগল হয়ে ঘুরেছি—আজ তা জ্ঞানের চোখে দেখছি। লিখছি মৃত্যুর সুমুখে দাঁড়িয়ে। জীবনে যা ঘটেছে, উপন্যাসে তা হুবহু দেওয়া যায় না। ছায়াও তো কায়ারই প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। তখন ছিল প্লেটনিক—মনটাই প্রধান। এখন হয়ত আর লিখব না। পাঠক তুমি এযুগের প্রতিভূ যা ইংগিতে রেখে যাচ্ছি তা কি স্বীকার করো না ? অবশ্য ভালবেসে পাগল হওয়া চাই—পরকীয়া নইলে তো অসম্পূর্ণ। তোমার কোনো মন্তব্য করারই অধিকার নেই।

এখনো আমার কি মনে হয় জানো ? যদি আমি এখনো গভীর রাত্রে গিয়ে নাম ধরে ডাক দিই, তবে সে বিনা প্রশ্নে স্বামী সংসার যোগ্য ছেলে মেয়ে ছেড়ে এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসতে পারে। দেহজ হলে শ্রান্তি আনত, এখানে এখনো আনন্দ। এ যুক্তি তর্ক বাগ্-বিতণ্ডার বিষয় নয়, শুধু অনুভূতি. একাগ্র মনে বুঁদ হয়ে শুধু ভাবো।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যক্তি জীবনের প্রেম-প্রণয় পাঠক জেনে করবে কি ? আমি এই জন্যই লিখছি, যদি আমার উপন্যাস, গল্প, প্রেমে কোথাও সার্থক হয়ে থাকে, তা কুসুমের মহিমায়। তবে তার একার দাবিই পূর্ণাঙ্গ নয়। আরো অনেকে আছেন, স্মরণে বিস্মরণে। যদি মালা গাঁথতে গাঁথতে এসে পড়েন অভ্যর্থনা জানাব। নইলে আজ ক্ষমা চাওয়ার পালা। ক্ষমা ক'রো হে বান্ধবী যত বিস্মৃতি।

আরো অনেকের কাছে এই অবসরে ক্ষমা চেয়ে নিতে হচ্ছে—যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা, জীবন-দর্শন আমার অস্থি মজ্জায় মিশিয়ে দিয়ে আজ অস্পষ্ট। ভূমিহীন কৃষাণ শ্রমিক থেকে মহাবিত্তশালী কূটবুদ্ধি ধুরন্ধর। তাঁদের অভিজ্ঞতার অভিধান আমি, নইলে শুধু প্রতিভার যে কতটুকু তোমরা মূল্য দাও তা আমার অজানা নয়। তাই বারবার ক্ষমা চাইছি এ জীবন সায়াহ্নের প্রদোষালোকে দাঁড়িয়ে। আমি মানুষ আমার স্মৃতি সীমিত।

৫।১।৫৮ বেলা ২-৪টা

অনেকে ডাইরী রাখেন, আমি তা রাখতে পারিনি। যে মানসিক, দৈহিক এবং আর্থিক ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে আমি এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছি, তা বলার নয়। তার ভিতর ডাইরী তো বিলাস! সামান্য জমা খরচই তো রাখা হয়নি। কতবার নিজেই তো খরচের খাতায় উঠতে উঠতে বেঁচে গেছি।

ডাইরী রাখা মানে পূর্বপরিকল্পিত নিয়মতান্ত্রিক পথে একটি শিক্ষিত মনকে চালিয়ে নেওয়া। কিন্তু সে মন আমার কোথায় ছিল! যা লেখাপড়া শিখেছিলাম, তা সাপের খোলসের মত বাধ্য হয়েই বদলাতে হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিলাম আধুনিক সভ্যতার দিনপঞ্জী, তারিখ মেনে চলা। আমার কাছে দিন রাত্রির কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না—যে বৈশিষ্ট্যে হয় রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা,

নেপোলিয়ান, হিলারী। যাঁদের প্রতিটি দিন ইতিহাস। মুহূর্ত বলতেও আপত্তি নেই।

তাই আজ স্মৃতির গহিনে নামতে হচ্ছে। যখন যা কিছু হাতে আসছে, সাল তারিখের পরোয়া না করে সাজিয়ে যাচ্ছি।

বাগানের ফুল সুন্দর সযত্নে সাজান গোছান, তা বলে কি পাহাড়ী ফুলের দলকে তুচ্ছ করা যায়? দেখ-নি কি নদীর পারের অগোছাল কাশগুচ্ছের ঢেউ?

॥ তিন ॥

আর একটা উপমা মনে পড়ছে। আমি যেন এক রাজমিস্ত্রী ভিতর থেকে হুকুম এসেছে—রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় জীবন দেবতা। আমার কল্পনায় যে অমরেন্দ্র হাঁটে, চলে, র‍্যাশন আনে, কখনো বা খাবি খায়, সে নয়। বলছে ইমারত গড়ো। প্রাচীন এবং নবীনকে এক সঙ্গে মিশিয়ে দাও। রাখীবন্ধন হক পূর্ব এবং পশ্চিমের। হু-হু-গতি ট্রেনের সঙ্গে গো-যানের। জীবনে যা পেয়েছ, সে তুমি কখনও শোধ করে যেতে পারবে না। তবু কালির অক্ষরে লিখে যাও। এ স্বীকৃতি আর কিছু না হলেও ঋণশোধের নৈতিক আকুতি।

১৮।১।৫৮ সকাল ৪-৯টা

বড় অভিমান ছিল সত্য কথা যখন লেখা যাবে না, তখন জীবনের মামুলী ক্যাটালগ লিখে হবে কি? কারণ অনেক সত্য এমন নগ্ন যা প্রকাশ করা বিপজ্জনক। নইলে বলতে হবে গোল্ডফ্লেকের কৌটা সরিয়ে রেখে বিড়ি ফোঁকার রোমাঞ্চকর কাহিনী। ভেজাল দাও তাও চলবে—খাঁটি হলেই কটুগন্ধ। কিন্তু সত্য ছাড়া কেবল দিনপঞ্জী ক্যাটালগ নয় কি?

অপ্রিয় কথা বলতে বারণ। কিন্তু প্রিয় কথায় কোনও আপত্তি নেই। সেই প্রিয় কথাই না হয় বলব। ~~কিন্তু~~ তার কি কোনও

ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকবে না—যেমন প্রদীপের নিচে অন্ধকার ? বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে তাই যথেষ্ট, সে কাউকে নিশ্চয় আঘাত দিতে বলে না। তবে বুঝতে চায়, জানতে চায় বর্তমান সমাজটাকে। তার কাছে অবশ্য বর্তমান না হয়ে অতীতও হতে পারে। অতীতে অবগাহনে নিশ্চয় বিস্ময় ও আনন্দ আছে। এখনো কি আমাদের ভাল লাগে না পড়তে—'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর ?' 'ছিয়াত্তরের বর্ণনা', কি তেরশ পঞ্চাশের বাঙলা দেখে শিউরে উঠি-নি ?

ইমারতের ভিত গাঁথছি। কোন্ ইটখানা কোন্ ভাঁটায় কবে পুড়েছে, কিংবা কোন্ পাথরখানা কখন কোন্ পাহাড় থেকে আনা হয়েছে সে তর্ক পণ্ডিত বন্ধুদের জন্য তোলা থাক। তুমি শুধু দেখ কারুকার্যে ত্রুটি হচ্ছে কিনা ? অনুরোধ একটু রসের চোখে দেখো।

পূব দিক বেশ ফর্সা হয়েছে—পঁয়তাল্লিশ বছরের আগের সীমান্তে পৌঁছান আর কঠিন নয়। এ যেন সেদিনের কথা। চোখ বুঁজলেই দেখা যায় কিশোর এক বালককে। শিলংয়ের কোনো এক পাহাড়ী ফাটল চিরে ঝিরঝিরে স্রোত বইছে। রঙিন মাছের দিকে চেয়ে রয়েছে আজকার এই বুড়ো। না, না সাত আট বছরের অমরেন্দ্র। এই রূপের সঙ্গে বহু কষ্টে একটু মুখের আদল মেলান যায়। সুমুখের দাঁত দুটোরও বুঝি ক্ষীণ মিলতি আছে। চোখাচোখি হলে কিন্তু সর্বনাশ। বালক ভয় পাবে। ছুটে পালাতে গিয়ে যদি পাথুরে পথে আছাড় খায় ! তার মা বাবা নিশ্চয় লাঠি নিয়ে আসবেন। তাই ঝাউগাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকাই ভাল এ চেহারা নিয়ে। কত স্নেহের এবং যত্নের সে অমরেন্দ্র।

১৮।১।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা

চকচকে চোখ দুটিতে কিসের আলো ?

অবাক পৃথিবী! অবাক। তোমার রঙিন কটা মাছে এত বিস্ময়! অমরেন্দ্রর জুতো মোজা খোলার আর তর সইল না। সে ট্রাউজার সমেত লাফিয়ে পড়ল জলে। বিস্ময় নেই, পালিয়ে গেছে চঞ্চল পাখায়।

আবার তরতরে ঝিরঝিরে স্রোত। খানিকটা এগিয়ে একহাঁটু গভীর! একটা পাথরে ঠেক খেয়ে ছোট ছোট ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণির পাকে পাকে রঙিন মাছ। ঘুরে এসে দাঁড়াচ্ছে পাথরটার কোলে।

ফের কিশোর হাত বাড়ালে। কিন্তু মাছ আরও গভীরে। বাঁক ঘুরে অনেকটা দূর। কাঁপছে ডানা মেলে। ফার্ণ ঝাউ দেবদারু ভেদ করে সূর্য উঠছে। শিরশিরে হাওয়ায় পাতা কাঁপছে ঝরঝর করে। উজ্জ্বল আলোতে এগিয়ে চলে কিশোর। হাত পা কনকন করে, তবু লক্ষ্য নেই। অনেক এগিয়ে খাদ আরও গভীর। ঝর্ণাও লাফিয়ে পড়ছে নিচে। চারদিকে জলের চূর্ণী।

মাছ নেই, রাগে দুঃখে শীতে অবসন্ন, পথও হারিয়েছে কিশোর, শীতের কুহেলী রাত্রির মত মনে পড়ে, একপাশে গহিন খাদে কাঁটা জংলা ঝোপ, অন্যপাশে উঁচু উঁচু টিলায় চাপ বাঁধা পাহাড়ী গাছ। সূর্যটা বাইরে না মেঘের আড়ালে তা আর স্পষ্ট মনে নেই, দু একটা বুনো শুয়োরও এখন বেরিয়ে আসতে পারে।

থাপায় করে এক খাসিয়া কৃষক পেঁৗছে দিয়ে গেল বালককে বাংলোয়। মার আতঙ্ক, বাবার রাগ। কিন্তু পরদিন আবার চুপি-চুপি অভিযান।

সে অভিযান আজও শেষ হয়নি। বিস্ময়ও কি পরিপূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে? মৃত্যু হিমেল হাতে কান ধরে টানছে, কিন্তু আমি মেষশাবক নই।

১৯।১।৫৮ সকাল ৬-৭টা

অবাক পৃথিবী, আজও অবাক লাগে, কাঁটা কম্পাস্ মেপে তো কোনো রহস্যেরই আজও সীমান্তে পেঁৗছুতে পারিনি? একই কথা

বারবার লিখেছি, তবু বারবার বিস্ময়। একই মানুষকে বারবার পাঠ করেছি, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে সে রহস্য। কোন জ্যামিতিক সংজ্ঞায় যখনই যাকে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি, সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, তার অঞ্চলে অবাধ্য চঞ্চলতা, উত্তরীয়তে কখনো গেরুয়া কখনো রক্ত-রাগের হিল্লোল। আবার হয়ত পর মুহূর্তেই মেঘের কালো থৈ থৈ রং, এই রাগ—এই হাসি। এই বিরহের দারুণ দহন, এই আলিঙ্গন। এই যাকে দেখলে ঘরে, একটু বাদে বাইরে—তারপর হয়ত আবার সাক্ষাৎ একযুগ বাদে প্রবাসে। এই শত্রু শিবিরে, পর মুহূর্তে তুমি যখনই আর্ত, তোমার জন্য হাত বাড়িয়েছে। কত লিখব, কত বলব, এর কি কোনও শেষ আছে?
২০।১।৫৮ সকাল ৬-৮টা

কিশোর অমরেন্দ্রকে এরপরই দেখতে পাই টাটকা চাক্ ভাঙা পদ্ম মধু চুষছে। খাসিয়া বস্তি থেকে কে যেন এক রাখাল ছেলে খুশী হয়ে দিয়ে গেছে।

অমনি নানা প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত মনসা মঙ্গলে এসে মাকে থামতে হয়। পদ্ম বনে মা মনসার অলৌকিক জন্ম। গল্প আর গল্প। মা অধৈর্য, ছেলের আর কৌতূহলের শেষ নেই!—তারপর? তারপর—?

ঘোড়ার ডিম, আমার কাজ আছে, কাল আবার শুনিস।

ছেলে কেঁদে কেটে হুলুস্থুল।

আমার যে কাঠ নিয়ে যেতে হবে রান্না ঘরে, চা হবে।

আমি দিয়ে আসব, তুমি গল্প বল।

বাপরে বাপ সে কি হয়? কেমন খাড়া পাথরের সিঁড়ি।

কে শোনে মার কথা, এক পাঁজা কাঠ নিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ছেলে। ভয়ে বিস্ময়ে মা হয়ত চেয়ে রইলেন পায়ের কচি কিন্তু বলিষ্ঠ গুল ছুটোর দিকে। বোধহয় মা সেদিন আশ্বস্ত হলেন—না, এ ছেলে পারবে সারা জীবন চড়াই ভাঙতে? স্বামী তাঁর ভেঙে এসেছেন; সাড়ে তিনটাকার সিপাহী থেকে

সাব-ইন্সপেক্টরের সিঁড়ি। অনেক সেলাম দিয়ে এখন সেলাম পাচ্ছেন।

মাকেও নাকি ঠিক অমনি অভাবের কঠিন সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছে, যখন তিনি প্রথম স্বামীর সঙ্গে প্রবাসে ঘর করতে এলেন। বিপ্লব করেই তাঁকেও সনাতন পরিবেশ ছাড়তে হয়েছিল ছেলে মেয়ের শিক্ষার জন্য। তুই দিদি বাবা মা—আমি জন্মালাম, পাঁচটি মুখ। মধ্যে মধ্যে অতিথ অভ্যাগত। টাকা কিন্তু সাড়ে তিনটি, মা কলা পাতায় করে মাছ ভাজতেন। দিনের পর দিন হাতা সম্বার ডাল। আজ এত অভাবের মধ্যেও বিশ্বাস করতে মন সরে না। আধুনিক বৌ-ঝিরা তো কল্পনাই করতে পারবে না—কাকে বলে পাতিল চচ্চড়ি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর স্ত্রী তবু জালায় জল পেয়ে আর্শির কাজ চালিয়েছিলেন। এযে ভাঁড়েই একেবারে কর্পূর নেই।

তবু ধন্যবাদ জানাতে হয় সেকালের ধৈর্যশীল অতিথিদের। একজন বিদায় হতে না হতে আর একজন এসে লাইন দিলেন—কেমন আছ জানকী? বৌমা তো দেশে যাবেন না, দেখতে এলাম। কই তেলের শিশি?

প্রবাসী স্নখী বৌমার অবস্থা তখন কল্পনা করে নাও পাঠক। আমি শুধু গল্প শুনেছি।

২০।১।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা

যতদূর আমার স্মরণ হয় ক্লাসিক সাহিত্যের আস্বাদ মার মুখেই প্রথম পেয়েছি। তারপর তা নানা সূত্র ধরে বেড়েছে। তাই বোধহয় আমার অনেক গল্পের ভিত ক্লাসিক উপাদানে তৈরী। কিন্তু গীতি কবিতার সুরও রয়েছে আমার নানা লেখায়।

এরপর কামাখ্যা পাহাড়ে চড়াই ভাঙার কাহিনী—তা আগেই বলেছি। গিয়েছিলাম দেবী দর্শনে কিন্তু কোন কথা মনে নেই।

শুধু মনে আছে পাহাড়ী ঝাড়-জংগল-টিয়া-ঝরণা। পাথরের দেবীর বদলে উন্মুক্ত প্রকৃতি। জড়ের বদলে জীবন।

২১।১।৫৮ সকাল ৫-৭টা

তারপর অনেকদিন ছায়া ছায়া অস্পষ্ট। আজ অনেক চেষ্টা করেও কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে। হঠাৎ একদিন দেখি পাহাড় নেই। পাহাড়ী টিয়ার রঙে যেন আকাশ প্রান্তর ছেয়ে গেছে! এযে সুজলা সুফলা বাঙলার মাটি। আসামের যাযাবর টিয়া তার সমস্ত সবুজ পালক কি ভুল করে এখানে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে?

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম। ফার্ণ ঝাউ দেবদারুর মধ্যে যাকে খুঁজে পাই-নি, এখানে যেন তাকে আবিষ্কার করলাম। ঝর্ণা নেই, কিন্তু রয়েছে বর্ষার করতোয়া, খলখল হাসি। ঢল নেমেছে দুপারে। আসাম বেঙ্গল আলাদা হয়ে গেছে, বাবা বদলি হয়ে এসেছেন বগুড়া জেলার ধুনট থানাতে। আমার এখন মস্ত বড় একটা টারজেট হয়েছে বাবার পরিত্যক্ত প্রেটকোটটা, তখন আমি আরও বড় হয়েছি। মনসা মঙ্গল পুরান হয়ে গেছে। রাম রাবণের যুদ্ধের গল্প শুনছি। কখনো বা মহাভারতের কাহিনী। শুনতে শুনতে পাকা ধানুকী হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে মা কেবলই লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিতে চাইতেন—আহা-হা নষ্ট করলি অমন জিনিসটা! আসুক আজ উনি।

মাকে শত্রুপক্ষ ধরে নেয়াও যাবে না, কিছু বলেও বোঝান যাবে না—তখন মনের দুঃখে বনে চলে যেতাম এক এক দিন। ঝিঁ ঝিঁ ডাক তখন মনে হত কান্না। বন মানে বাড়ির পাশের বাঁশঝাড় আম তেঁতুলের বাগান। নয়ত কোন মাথা সমান উঁচু পাটের ক্ষেত। সাপ খোপের গ্রাহ্য নেই। আজ কামড়ায় যদি খুব ভাল হয়। কল্পনায় ভেসে আসত রামের বনবাস থেকে বেহুলার বেদনা-বিধুর অশ্রুসিক্ত মুখ। মনের রঙে কৌশল কখনো বা বেহুলা সাজিয়ে মাকে কাঁদাতাম।

আশ্চর্য মার চোখের জল! সত্য নয়—কল্পনায়। ক' ফোঁটা ঝরাতে না ঝরাতে অভিমান উবে যেত। সন্ধ্যা হতে না হতেই মার কাছে হাজির। আবার যথারীতি গল্প বলার জন্য সবিনয় আকুতি।

২১।১।৫৮ বৈকাল ৫-৭টা

মা নেই—কৈশোরের সে ক্ষণ-মুহূর্তগুলি স্মরণ করলে আজ আমার চোখ উলটে ভরে আসে। মা হচ্ছেন স্তন্যদায়িনী! সমাজ ব্যবস্থা পালটে গেছে। আজ আর সে যুগের মা বড় বেশি বেঁচে নেই। মা হয়েছে ফিডিং বটল, পাউডার মিল্ক, বড় জোর মাইনে করা আয়া। একালে বসে সেকালের জন্য দুঃখ করা ছাড়া গতি কি! এখন আর মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারত নেই, তার বদলে এসেছে পাঁচ সিকা দেড় টাকার ফর্মা দেড়েক ছড়া ও ছবি। লেখা কম, রঙ বেশি। অভিভাবক, ছেলে, মেয়ে সকলের হয়েছে সময়ের টান। তাই পঠিতব্য অল্প, ক্লাসিকের মেড-ইজির বাজারে আবির্ভাব।

গল্প বলা মার চাহিদা ফুরিয়েছে, তাই তিনি চির বিদায় নিয়েছেন।

২২।১।৫৮ বৈকাল ৫-৬½টা

তখনকার দিনের থানা মানে সাত দেশের সাত জাতের জন পনর অফিসার, পুলিশ। অনেকের সঙ্গেই অনেকের ভাষা ভাবনার ঐক্য নেই। তেমন অর্থ নৈতিক চাপও নেই, যার জন্যে অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করবে ছেলেমেয়েরা। লেখাপড়া শেখেনি, আচ্ছা দারোগাগিরি করে খাবে—এমন কথা আজ ব্যঙ্গ বলে মনে হয় কিন্তু তখন আমরা সত্য বলে ধরে নিয়েছি।

বাবা ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। নিজে বোধহয় ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। অর্থাভাবেই আর তিনি এগুতে পারেননি। তবু নিজের মেধা ও চেষ্টায় ইংরেজি ব্যাঙলায় ডাইরি লিখতেন

চমৎকার। সেই জন্যেই চাকরিতে উন্নতি। আর শরীরটাও ছিল সহায়ক। শ্রীর সঙ্গে শক্তি এবং গঠন পারিপাট্যের এমন সমন্বয় আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

তবে দুটি গল্প বলি। সত্য হলেও আজ চমক লাগবে।

বাবা আহ্নিক করছেন সকালবেলা। সুমুখে একটা শক্ত কাঠের জলচৌকির ওপর লোহার সিন্ধুকটা। মায়ের নাম খোদা—শিবসুন্দরী ঘোষ। কি যেন একটা অসুবিধা হচ্ছে পাশের দরজা খুলতে।

প্রকাণ্ড একজোড়া ফরমাসী কাঁঠাল কাঠের সৌখিন খড়ম পায়ে দিতেন বাবা। ঐ খড়ম পায়ে উবু হয়ে বসেই তিনি দু হাতে তুলে সিন্ধুকটা সরিয়ে রাখলেন। শুনেছিলাম সাড়ে আট মন ওজন, সকলে ফিসফাস করে বলাবলি করলে দৈত্য! মা কিন্তু খুব বকলেন।

আর একদিনের কাহিনী, কাদা চর। ভাঁটায় জল নেবে গেছে অনেক নিচে নদীর গর্ভে। একটা শুকনো খালে রয়েছে বড় একখানা কাঠামি নাও কাদায় আটকে। জোয়ার নইলে নৌকা নাবানো যাবে না।

বাবা বললেন সেকি কথা? হাট হয়ে গেছে, তবু হাটে বসে থাকব?

একপাশের কোল বাতা ধরলেন বাবা, অন্যপাশে আঠার জন। নাও নামল হেঁইও টানে গাঙে। হাট সমেত লোক অবাক।

সব শুনে মা নাকি সেদিনও বকেছিলেন। এ দস্যুপনা ভাল নয়। অতিরিক্ত দুঃসাহসে দুঃখ হয়।

বাবার সম্বন্ধে মার উক্তি একেবারেই যুক্তিসহ নয়—নিতান্তই নারী সুলভ আশঙ্কা। বাবা দুঃসাহসে ভর করেই সাড়ে তিন টাকার নায়ে ওপার পাড়ি জমিয়েছিলেন। দুঃসাহসের নৌকা দুঃখের পারাবার না-ও পার হতে পারত। ঝড় ঝাপটায় ডুবে যেতে পারত মাঝ সমুদ্রে। কিন্তু ওপারের বন্দর ছুঁয়েছে। পণ্য করেছেন

ইচ্ছামত। তারপর সোনা জহরৎ বোঝাই ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে দেশে ফিরেছেন। নাম যশ খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রচুর। যাঁর ঘরে এক বেলারও অন্ন ছিল প্রশ্ন, আজ তা কে খায়! দান ধ্যান পুকুর এবং দেবতা প্রতিষ্ঠা—কোনটাই বাদ যায়নি। বিষয় সম্পত্তি হয়েছে যথেষ্ট। বাবার দুঃসাহসে দুঃখ হয়নি বরং হয়েছে অপার ঐশ্বর্য।

কিন্তু তবু মার কথায় যুক্তি না থাকলেও একটা অভিযোগ ছিল। তাঁর আশঙ্কার মর্মমূলে পেঁছাতে আমার লেগেছে প্রায় ত্রিশ বছর। আজ ভাবলে অবাক লাগে—প্রায় নিরক্ষর এই মহিলারও ছিল নিজস্ব একটা অন্তর্দৃষ্টি।

॥ চার ॥

২৩।১।৫৮ সকাল ৪-৬টা

বাবার শারীরিক শক্তির অনুপাতে বুদ্ধিটা যেন তেমন তীক্ষ্ণ নয়, এই ছিল মার প্রকৃত নালিশ। জ্ঞাতি গোষ্ঠী গুরু পুরুতকে অযথা বিশ্বাস করে তিনি যা কিছু বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন, তা হয়েছিল তাসের ঘর। ভিত নেই, বাঁশ বাখারী নেই, শুধু ছাউনি। একটু দমকা হাওয়া—ব্যস, সব কাত। মোদ্দা কথা স্বার্থান্বেষীর দল তামাক খেয়ে পালিয়েছিল বাবার হাতে। পরিণামে শেষ জীবনে আবার দুঃখ। কাটারি ভোগ চালের বদলে আউশ। তাও এক একদিন জুটতে চাইত না। তিনি বলতেন জীবনে যে কতবার বুদ্ধিমান ও বোকা হলাম! তবে আমি মরলে তোদের এ দুঃখ থাকবে না। এক একজন চিরদুঃখের পসরা নিয়ে আসে।

গলা দিয়ে আকাড়ি আউশের ভাত তল হত না, আর কত কথাই যে বলতেন! বুদ্ধি-বিদ্যা-অধ্যবসায় কিছু নয়, নিয়তি গরীয়ান। পারিপার্শ্বিকের যেমন পাত্র তেমনি জলের রূপ। তখন পঁয়ত্রিশ বছরে একথা স্বীকার করে নিতে মন সায় দিত না।

ভাবতাম জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের এ গ্লানি। হতাশ মনোবৃত্তি থেকে এ দর্শনের জন্ম। কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে মনে হয়, ঠিক তা নয়! মানুষের কাঠামোতেই কোথায় রয়েছে যেন কি এক দুর্বলতা। একের পক্ষে যা সত্য, অন্যের পক্ষে তা নয়, কেউ দানে সত্য, কেউ গ্রহণে। কেউ সঞ্চয়ে, কেউ বা ব্যয়ে। একদল যখন কলম পিষে মহৎ চিন্তা করে দিন গত পাপক্ষয় করার মত ভাত কাপড় জোটাতে হিমসিম খেয়ে যায়, তখন অন্যদল উড়ো জাহাজে চড়ে এদের শ্রম ভাঙিয়ে নাম যশ প্রতিপত্তি এবং অভিনন্দনের মালা ঘরে আনে। মেরু অভিযানে কুকুর, বলগা হরিণ গাইড যদিও প্রধান অঙ্গ, কিন্তু ইতিহাস হন যিনি পারিপার্শ্বিকের বলে হতে পারেন হিলারী অথবা ফুক্স।

তবু অধ্যবসায়-নিষ্ঠা-তপস্যাকে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দেওয়া যায় না অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে, আমাদের লক্ষ্য শুধু খ্যাতি নয়, যশ নয়—মেরুজয়।

২৩।১।৫৮ সন্ধ্যা ৬-১০টা

ধুনোট থানায় আবার ফিরতে হল। এখন আর বর্ষা নেই, করতোয়ার দু'পারে ঢল নেই—শুকিয়ে মিলিয়ে গেছে খলখল হাসি। এপার-ওপারে শুধু ঝিকমিকে বালি আর বালি। কাঁকুড় বাঙির সবুজ লতা ঢলঢল করছে রোদে। শীর্ণতোয়া নদীর বুকে মাছের মিছিল। ক্ষুধার্ত কাক চিলের কলবর—তার মধ্যে দুর্ধর্ষ বাজের ছোবল। বালক বয়স কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি? সেই সাত সকালে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়েছি। ধুনোট—শুধু ধুলোর পথ, হেঁটে চলেছি। কর্কশ পাহাড়ে কেবল হিম, কুয়াশা বর্ষা ও বরফ দেখেছি—রোদ ছিল দুরাশার মত ক্ষণস্থায়ী। এখানে প্রকৃতির শান্ত নাতিশীতোষ্ণ রূপ—ঘরছাড়া করেছে আমায়। ও কিসের ডাক?—বৌ কথা কও?

মা চিনিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। পাহাড়ে তো এমন ডাক 'কখনও শুনি-নি। সেখানে ছিল মানুষের ভাষাও বোঝা কঠিন, এখানে যে পাখির ভাষাও সহজ সরল মর্মস্পর্শী। তাই গাছপালার ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি।

কার বৌ কার সঙ্গে কথা বলবে? সে বৌয়ের রঙ কেমন, গড়ন কেমন? কিছুই তো ছাই কল্পনা করতে পারিনি। একটা বিয়েও তো হতে দেখিনি এ জীবনে। বড় দুঃখ হয়, নিজেকে বড় ছোট লাগে।

তারপর ভাই-বোন, জ্ঞাতি-বন্ধু, নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কম করে দশ বিশটা। অনেক বৌ অনেক বরের সঙ্গে কথা বলেছে। সেই অনুপাতে আমিও নাকানি-চোবানি খেয়েছি বিস্তর। আজ সেই কালো ঠোঁট হলুদবর্ণ পাখীটার কথা ভুলেই গেছি একেবারে।

কিন্তু হঠাৎ ডাকলে চলে যাই বোধহয় কৈশোরের সেই ধুলোট পথে। একপাশে এঁকে বেঁকে করতোয়া ঘুমিয়ে রয়েছে।

ওঃ। বড় ভুল হয়েছে। বাবার কথার সূত্র ধরে মার কথা কিছু বলার বাকি ছিল। করতোয়ার পারে না হয় আর একবার আসা যাবে, এখন 'দক্ষিণের বিলে'র নায়িকার কথা কিছু শোন। নিশ্চয়ই কমলকামিনীকে তুমি ভুলে যাও-নি। চল উত্তর থেকে পূর্ববাঙলায়—যেখানে গোলা বোঝাই ধান, গোয়াল ভরা গরু। 'চর তো নয় দুধের সর।'

বাবা জীবনপাত করে আয় রোজগার ব্রাহ্মণ-ভোজন দেব-সেবা করিয়েছিলেন—কিন্তু সবাই বলত মা হচ্ছেন ঘোষ বংশের সৌভাগ্যদায়িনী। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এ একটা ট্র্যাজেডি। কিন্তু আমি জানি মায়ের উদয়াচলে একটু কুহেলী থাকলেও তাঁর পরিক্রমার বৃত্ত ঘুরে অস্তাচল পর্যন্ত শুধু সুখ ও সৌভাগ্যের দ্যুতি। তেমন মারাত্মক কোন শোক দুঃখের আঁচড়টি তাঁর গায়ে লাগেনি।

তাঁর মৃত্যু তো দেবী বিসর্জন। তাঁর শ্মশান তো হয়েছিল অনুগত, গুণমুগ্ধ হিন্দু-মুসলমান আত্মীয়-অনাত্মীয়ের পীঠস্থান। সে এক সুমহান দৃশ্য! না দেখলে বোঝান কঠিন। এ সত্যিকারের ভাগ্য না কর্মযোগ পাঠক তুমি ভেবে দেখো। আর ভাবতে হয় না, যদি আমাকে আজ নিরপেক্ষ বলে ধরে নাও। আমি বাধ্য হয়ে রিপিট করছি, ট্র্যাজেডি। তাই হিন্দু-দর্শন চিন্তার সমুদ্র মন্থন করে, কর্মকে কখনই অস্বীকার করেনি, কিন্তু কর্মফলে রাখতে নিষেধ করেছে আসক্তি।

২৪।১।৫৮ ভোর ৪-৬টা

পড়ার মত করে গীতা পাঠের আমার তেমন কখনও সৌভাগ্য হয়নি—তবে ঝড়-ঝাপটার মুখে কেবলই মৃত পিতার মুখের ধ্বনি শুনেছি—'মা ফলেষু কদাচন'। ঠিক ফলের আশা করে আজও পথ চলছিনে, কিন্তু লিখছি, কখনো তুহাত উজাড় করে দিচ্ছি, কখনো তু'হাতের অঞ্জলি পেতে পরম শ্রদ্ধায় নিচ্ছি—এ যদি তোমার যুক্তির পাথরে মেকি হয়ে থাকে, এই মেকিই আমার খাঁটি।

এবার বৌ কথা কও নেই—ধুলোট পথের বুড়ো বটের মগডালে হরিয়ালের শিষ। ফল খেতে এসেছে যাযাবর পাখী নিরালা তুপুরে। কি মিষ্টি গলা! মাঝে মাঝে ঘুমঘুম ঘুঘুর ডাক। স্বর্ণলতা, বটের ঝুরি—পাকা আনারসের গন্ধ। পায়ের ছন্দ ঢিমিয়ে আসে—থেমে পড়ি। ম-ম গন্ধে অধীর হয়ে ঝাড় জঙ্গল ভাঙি।

এমনি একটা পরিবেশেই রাখাল ছেলেদের সঙ্গে আলাপ। তারপর কৃষকদের সঙ্গে। আমার ফুটফুটে রং লাল পাতলা পালাত চুল দেখে কেউ আলাপ জমাতে আসেনি। এরা আমার প্রশ্নভরা চোখ মুখ দেখে বোকা ঠাহর করেছে।

বাঙলা দেশের ছেলে, ছিলাম প্রবাসে পাহাড়ে সঙ্গীহীন। এবার দেশের ছেলের সঙ্গ পেলাম—যারা মাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ। এরা এই দেশের আম কাঁঠাল আনারসের স্বাদ শেখালে। আমি ধন্য হলাম।

ফেরার মুখে সূর্য বসেছে পাটে। আম তেঁতুলে রক্তপলাশের ছটা। ওপারের হাটে খেয়া পারাপারের জন্য হাটুরে মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে। একটা মায়ার সাক্ষ্য নীলাঞ্জন নেমে আসছে ধীরে ধীরে। নদী-পথ-ঘাট এপার ওপারের জন্য যেন একটা টান বোধ করি নাড়ীতে। হঠাৎ মন সকরুণ হয়ে একটা গান ভেসে আসে, 'এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি!'

২৫।১।৫৮ রাত্রি ২-৫টা

আমার মা ও বাবার জীবনীর যে দ্বন্দ্বময় অংশটুকু বলেছি তার সঙ্গে গীতার বক্তব্যটুকু মনে আসছে। সেই সাত সকালে যে বালক বেরিয়েছিল, আজ সে আগেই তো বলেছি ঘাত প্রতিঘাতে প্রাচীন হয়েছে। যত কিছু দ্বন্দ্ব সমস্যা বাণী প্রজ্ঞা আজ পরিপক্ক হয়ে, তার ভিতর দিয়ে চোলাই হয়ে বার হচ্ছে।

২৬।২৭।২৮ শে জানুয়ারী—

ক' দিন লেখাটা বন্ধ যাচ্ছে। একেবারে নিষ্ঠুর প্রত্যহ।

আজ ২৯. ১. ৫৮—সকাল ১১টা। ভাবছি অন্তত চারটে লাইনও লিখব। এমন বন্ধ আরো গেছে। কিন্তু এবার কৈফিয়ৎ দিতে নৈতিক দায়িত্ব বোধ করছি। আমি যে হাকিমের দরবারে জবানবন্দী দিচ্ছি, তার এজলাস বন্ধ নেই—হলিডে নেই। তার আয় কম, খরচ বেশি, তাই ঘাম ঝরাতে হয় অন্য ও প্রত্যহ। জনতা এজলাস বন্ধ দিতে পারে না। কিন্তু আমি যে কদিন খাবি খাচ্ছি। কোন্ খোকা ছেলে যেন কৌতুক করে আমার নিশ্বাসের ব্লাডারটা যতটা চাপছে, ততটা ছাড়ছে না। সময় সময় পেটে ও পাঁজরে বক্সিং চালাচ্ছে খেয়াল খুশি মত। মনে হচ্ছে আর বুঝি বলা হল না। এ পরিচ্ছেদটাও অন্তত যদি শেষ হত!

গীতায় রয়েছ 'মা ফলেষু কদা চন'। কিন্তু এই যে শেষ হল না, এর জন্য দুঃখ পাচ্ছি কেন?

কাল সকালে রমেশদাকে ডেকে, আমার স্ত্রীর সুমুখে যা কিছু

দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছি? বলেছি, আমি উড়নচণ্ডী নই, মাতাল নই—যা কিছু আমার বাবুয়ানা বিড়ি, তবু কিছু রেখে যেতে পারলাম না। এতগুলো নাবালক ছেলে মেয়ে রইল।

উঃ ধরো, ধরো!

সমস্ত পাঁজরার সুমুখ দিকটায় খিঁচুনি উঠেছে। হাড় এবং মাংসপেশীগুলো উঠেছে ধনুকের মত বেঁকে।

রমেশদা একটু দিশা হারালেন। স্ত্রী পঙ্কজিনী ঠিক দিশা রেখেই এগিয়ে এলেন—যে দিশা তাঁকে প্রায় তের বছর বয়স থেকেই রাখতে হয়েছিল। কারণ আমি চিররুগ্ন শুধু মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল ছ' থেকে বোধ হয় কুড়ি বছর। আঠারতে পড়েই বিয়ে, দিব্যি চকচকে স্বাস্থ্য তখন, কাঁচা হলুদ রং, সুঠাম যোয়ান। কোয়ালিফিকেশন কেবল ম্যাট্রিক দিয়েছি। কুস্তি লড়ি ডন বৈঠক দি। আর গল্প কবিতা লেখা বাই। স্ত্রী ঐ বয়সের ভিতরই বঙ্কিম, শরৎ পড়েছেন। স্বামী হিসাবে আমাকে পেয়ে ভারি খুশী। সখীদের বরেরা চাকরি বাকরি করে। পঙ্কজিনী বলতেন, আমার বর রাইটার—লেখক। সখীরা হয়ত হকচকিয়ে যেত।

আমি আমার স্ত্রীর কপালে যে টকটকে তেল সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলাম, তা বোধহয় চীন দেশের এক নম্বর পাতা থেকেও লাল, চির স্বাস্থ্যবতীর কপালে পরিয়ে দিয়েছিলাম তখনকার মত সুপ্ত রুগ্নবুকের রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

আমরা তিন ভাই, পাঁচ বোন, দিদি মৃনালিনী ছিলেন প্রায় বছর দশেকের বড় আমার চেয়ে, বলতে গেলে তাঁর আওতায়ই আমি মানুষ। দিদি এখন গত কিন্তু তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম মায়ের মত। মা ছিলেন বহু সন্তানের জননী, শৈশবে কৈশোরে কটি বোন বিদায় নিয়েছিল সে হিসাব আজ আর মনে নেই। কিন্তু তাদের কথা শুনে মায়ের সঙ্গে যে কত চোখের জল ফেলেছি!

এই সাধারণ পারিবারিক কাহিনীও কি আমার কল্পনা প্রসারে সাহায্য কম করেছে!

দিদি ছিলেন এক অসামান্য কর্মী মহিলা। আগুনের মত ধক ধকে রূপ, সধবা অবস্থায় কপালে একটা বড় সিঁদুরের ফোঁটা—দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যেত, এমন মহিমাময়ী মূর্তি আমি খুব কমই দেখেছি। দেশ বিভাগের ফলে সবাই এলাম নিঃস্ব উদ্বাস্তু হয়ে ফের এই কলকাতার বুকে। দিদি তখন বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে দেয়ার পরই বেকার হল জামাই। ভাগ্যের এ আর এক রাজযোগ। তখন তাঁর রূপের মহিমা জাগ্রত হল চরিত্রে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, তবু লিখছি এইজন্য যে, ব্যক্তির যোগফলে সমষ্টি। সমষ্টির সমন্বয়েই সমাজ। এই বাজারে মাত্র দশটি টাকা মাসোহারা দিতাম আমি। যখন নগদে সম্ভব হত না, তখন যে কোনো পরিপূরকে। অমুকের কাছ থেকে আমার নাম করে চেয়ে নিও। তাও যখন সম্ভব হত না, তখন ভিক্ষা লব্ধ নিজেদের বরাদ্দের চাল আটার থেকে তুলে দিতেন পঙ্কজিনী। এই সামান্য মূলধন সম্বল করে দিদি মেয়ে জামাইকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিধানপল্লী কলোনীতে একখানা বাড়ি সৃষ্টি করলেন। সে কি তাঁর সংগ্রাম! সে কি তাঁর তিল তিল আয়ুক্ষয়! শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হলেন। কিন্তু বাঁচলেন না বেশিদিন। যত ব্যক্তিমুখিই হোক এ কল্যাণ তপস্যা, আমাদের প্রণাম না জানিয়ে উপায় নেই। স্ত্রী বলেন এই সাধনার দানা নাকি রয়েছে আমারও মজ্জায়। যখনই শুনতাম আয়ুরসে সঞ্জীবিত হতাম।

পথ চলতে চলতে আরো তিনটি ছোট বোন অকালে হারিয়ে গেছে পথের ধূলায় ঘর সংসার ফেলে, অবশ্য মা বাবা মারা যাওয়ার পর। ছোটটি বেলা, এখন এই বাড়িতেই ভাড়াটে। আছে অপার পরিশ্রমী মেজো-ভাইটিও এই বাড়িতে, সে টি.বি. এবং বহুমূত্রে মরণাপন্ন। ছোট ভাই বেশ একটু দূরে সেই বিধানপল্লীতে। এখন

তিন জনেই পৃথক আমরা। বাবা কি বুঝে নাম রেখেছিলেন এদের দুটির তা আমি জানতাম, কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে ডাক দিতে পারেননি। আমি নাস্তিক হলেও দেহের আর্তিতে ডাক দিলাম, নারায়ণ, জনার্দন! স্ত্রী হয়ত আমার ডাকটা প্রলম্বিত করে দিলেন। শুধু নারায়ণ নয়, এ সময় হঠাৎ এসে উঠল জনার্দনও। অনেক ভুল ভ্রান্তি নিজেদের মধ্যে থাকলেও, এ ডাক বিষম ডাক। তোমাকে নাড়ীর টানে উপস্থিত হতেই হবে। এলো বেলা-মিনু-বাবু, এলো মেজো ভাইয়ের বৌ বকুল, এলো এবাড়ির প্রায় সবাই। সংগ্রাম আমার আমরণ সংকল্প হলেও মহাযাত্রার বিদায় চাইলাম।

কিন্তু কেউই তা দিলে না। ছোট্ট দুটো ছেলে মেয়ে অশোক রেবাই বুঝি বেশী বাদী হল চোখের জলে। সেদিন বুঝলাম বাসুদেবটা একান্তই কাপুরুষ! ছিঃ ছিঃ! অমন করে চোখ মোছে কোনো সাবালক ছেলে! রুগ্ন মেজোভায়ের মুখখানাও থমথমে, একজন শুধু পাথর সেদিন, প্রয়োজন পরিচর্যায় লীন। হারিয়ে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে রয়েছেন জনারণ্যে। তিনিই কি মহাশক্তি, মহা-ধৈর্যবতী এই ভেঙে যাওয়া তথাকথিত ভীরু বাঙালীর প্রতি ঘরে? এঁরাই কি উদ্দেশ্যের তাগিদে ব্যাখ্যাত হন কুসংস্কার এবং অশিক্ষার জালে বন্দিনী?

আর একজন এলেন আমার সম্পর্কে বড় কিন্তু বয়সে কিছু ছোট, স-প্রীতি স্নেহশীলা মেজো শালী হেমলতা দত্ত। বললেন, অমর, তোমার চোখের জ্যোতি বলছে তুমি দীর্ঘায়ু, অতএব আমি বলছি ভয় নেই।

তবু বিদায় চাই মেজদি, অনেক মনের এবং স্নেহের দেনা রয়েছে আপনার কাছে, কোন হিল্লাই করা গেল না।

—সে কি কথা, দেনা রেখে মরতে চাও? সে হবে না ভাই। আমি তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেব না। হেসে ফেললাম

একটু। ভাবলাম এই প্রীতিঘন অন্তরটুকুই করেছে এই মহিলাকে আমার জন্য বিপন্ন।

সামান্য একটু সামলে নিলেও হাঁপানি চলছে পুরোদমে, সেকি বুকের পাঁজরার চড়াই ওৎরাই! রমেশদা বললেন, অমরবাবু যেমন সহনশীল, আমার বিশ্বাস তিনি এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠবেনই। গড্ ফরবিড, একটা অনভিপ্রেত কিছু ঘটলেও আমরা সবাই রয়েছি।

কষ্টর জন্যই কষ্ট হচ্ছে—মৃত্যুর জন্য নয়। মরণের সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের মর্মান্তিক পরিচয়। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ? বর্তমানের খোরাক পোষাক? সে কথা ভেবে তো এ পথে পা বাড়াই-নি। আর তুটো ব্যাঙ্ক ব্যালান্স? সে কথাও তুচ্ছ মনে করি। প্রতি বছর কমপক্ষে হাজার কাঠি ধান পেতাম। মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় মাসে ব্যয় করছি দেড়শ মণ চাল। অঢেল ঘর তুয়ার। এখন রেশন ব্যাগ, পায়রার খোপে বকবকুম। জগতে কোন্‌টা কায়েমী?

পাঠক আমি কি ভুল করেছি? এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাদের কাছে চুপি চুপি বলি—সেকালের আঠার বছরের রাই-টারের স্ত্রী একালে যখনি এসব কথা ওঠে মন্তব্য করেন,—ভুলই আমাদের ভাল।

তোমরা কি বলো?

৩০।১।৫৮ বৈকাল ৪টা

আবার এক দিন বাদ পড়ে যাচ্ছে। তারিখ এবং সময় বসিয়েও কাজ হচ্ছে না। আমার ইচ্ছার চাইতেও প্রতিবন্ধক এসেছে গুরুতর। ডাক্তার বন্ধু অসুস্থ। তাঁর খবর নিতে যেতে হবে। এঁরাই হচ্ছেন আমার জবানবন্দীর উপজীব্য। এখন এঁর পরিচয় দেব না। ইনি আমার প্রত্যহ জুড়ে নেই, দেখা হয়েছে সায়াহ্নের প্রদোষালোকে সমুদ্র মোহানায়। যখন সব গান

থামার মুখে। আবার সুরু হয় নতুন গান। তখনো ধুঁকছিলাম, হাতে হাত ঠেকতেই বুঝেছিলাম, অন্ধকারের অতলান্ত জুড়েও রয়েছে সুমহান বিস্তার। কয়েক পাতা আগেই ডাঃ কুটনিসের কথা উল্লেখ করেছি। তার চাইতে ভাল উপমা আর জোগাচ্ছে না। এ ডাক্তার কিন্তু চায়নায় যাননি। তবু স্ত্রীর সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছেন একটি ঘরোয়া মেডিকেল মিশন। এখানকার ঠিকানা—৭।২w জামির লেন। একবার ঝড়ে দুর্দিনে এসে দেখ না!

৩১।১।৫৮ সকাল ৮-১০টা

আগের সূত্রে ফিরে যাই।

পাঁজরার খিঁচুনি কমেছে, রোগীর শয্যার শিয়রে অসমাপ্ত জবানবন্দীর পাণ্ডুলিপি, লেখা হয়েছে মাত্র ফর্মা দুই, তার সুমুখেই হাত দেড়েক পথ বাদ দিয়ে রান্না, আমি সুস্থ থাকলে সংক্ষিপ্ত সাধারণ—এখন রাজসূয়, চা, বার্লি, ডিম, পেঁপে, টেংরি ভাতের লেই, হয়ত কোনটাই খাব না, তবু তল্পিতল্পা বেচে, ভিক্ষা করে সংগ্রহ, এ এক ধরনের কঠোর শ্লেষ। ভাষায় হলে সহ্য করা যায়, বড় অসহ্য টাকার টাটানি।

রমেশদা বিগতদার, উপযুক্ত ছেলে দুটি বিদেশে, একটি মাত্র মেয়ে, ক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে, তাই রমেশদা আপাতত আমাদের কি বলা যায়? পেয়িং গেস্ট। তবে বাজার হাট নিজেই করে দেন, এমন হিসাব যে একটি লংকাও কম বেশী হওয়ার যো-টি নেই, এই হিসাবই তাঁর জীবন। আশ্চর্য, মিতব্যয়িতার তিনি একখানা পাটিগণিত। তবু এখানে দু পক্ষেরই প্রচুর লাভ। পাউণ্ড শিলিংয়ে খতিয়ে দেখলে জিরো। কিন্তু মনের দিকে চেয়ে দেখলে দেয়া-নেয়ার আনন্দ। রমেশদা প্রথম পক্ষ, তিনি তখন আশ্বাস দিয়ে উঠে গেছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হচ্ছেন আমার স্ত্রী, তিনি সুমুখে বসে মুসাবিদা করছেন রমেশদার, দুবেলার রান্নার। আমি রোগী—

তৃতীয় ব্যক্তি, কিছু বলতে পারছি না। আমার মনের আর্শিতে পড়েছে দুজনারই প্রতিবিম্ব, ওষুধে কাজ হচ্ছে না—কিন্তু এ সঞ্জীবনী শক্তি অনস্বীকার্য।

রমেশদা উঠে যেতে না যেতেই ভানু এসে উপস্থিত, আমার বাল্যবন্ধু।

কেমন আছিস কনকপুরের কবি?

ভানু ওরফে রাম—ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর খাতায় রাম পরায়ণ রায়। রমেশদা যেমন গোটগাট মুগুরের মত ঠাঁশ বুনোট, এ হচ্ছে লম্বা চওড়া যোয়ান, কণ্ঠে ঝংকার। জিজ্ঞাসার ভিতরই যেন কুশলের জবাব। এ গলা না শুনলে বোঝান যায় না। এ ভাষা তুমি আমি ব্যবহার করলেও রামের মত হবে না। এ ভাষা প্রাণদা—মৃত্যুর মৃত্যুবান। রাম এলো তো না যেন শবরীর কাছে এলো নবঘনশ্যাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কার্জন পার্কে আবার সাক্ষাৎ, ছেলে-মানুষের মত বলি, জবানবন্দীটা তো শুনেছিস, একটু বাঁচিয়ে রাখ, যাতে শেষ করে যেতে পারি। গীতায় রয়েছে 'মা ফলেষু কদাচন,' কিন্তু এটা শেষ করে যাওয়ার প্রলোভন কেন?

ভানু আমার শুধু বন্ধু নয়—জীবন-জিজ্ঞাসার ধ্বন্যালোক।

সাহিত্যের শুরু থেকেই স্ত্রী আমার প্রথম সহজিয়া সমঝদার। তাঁর ছাড়পত্র ছাড়া একটি লাইনও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তারপরই উৎসাহী এবং বিচারক রমেশদা। সেখানেও রয়েছে যথেষ্ট দরদ। কিন্তু ধ্বন্যালোক ছাড়া নিজেকে সমগ্রভাবে বোঝার সুযোগ হত না, কারণ অনেক অর্থই শুধু বাচ্যার্থ নয়। ব্যঞ্জনাটাই তো প্রাণ সম্পদ!

এই ভানুকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছি, তা পরে শোনাব। এখন আমার মনের সে পরিবেশ নেই। দ্বন্দ্ব সংঘাতে আমি ক্লান্ত।

কার্জন পার্কে বসে ভানু অনেক কথা বললে। আমি পেলাম

গীতার নতুন ভাষ্য। কোন কার্যই নিরুদ্দেশে করা চলে না। তবে ফললাভ না হলে যে মর্মান্তিক হতাশা ও গ্লানি আসে, তা থেকে দূরে থাকার জন্যই ও বাণীর জন্ম। মা ফলেষু...বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনা নিগূঢ়। এ অঙ্কের মত বোঝার বস্তু নয়, কবিতার মত ব্যাপ্ত রসাল।

॥ পাঁচ ॥

১।২।৫৮ সকাল ৬-৮টা

ডাক্তার কিম্বা একজন ইঞ্জিনিয়র হতে হবে আমাকে। বাবা ও বড় ভগ্নীপতি জোর করে ভর্তি করে দিলেন আই. এস.-সি. পড়তে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে ঢুকে দেখলাম ধূলি মালিন্য বীজানুমুক্ত ডেস্টিল ওয়াটার চোলাই হচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা নির্মল জল।

বাবা ও মার জীবন অধ্যয়ন করে বুঝেছিলাম নিয়তি দুর্বার। আরও অনেকের জীবন পাঠ করেছি, আমার ধারণা বদলায়নি। আজও বলছি নিয়তি প্রধান। দেখছি চোলাই করা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কর্মে যেটুকু ফল লাভ তা ছেলেমানুষি অহমিকা পূরণ মাত্র। এ কথা শুধু ব্যক্তির বেলা নয়, জাতির বেলাও সত্য—সত্য সমগ্র মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে। অনন্ত কোটি গ্রহলোক সম্বন্ধেও আমার এই ধারণা বদ্ধমূল।

এটা হতাশার কথা! কিন্তু তা নয়। এটা নৈরাশ্যবাদী কাপুরুষের উক্তি! কিন্তু তাও নয়।

এবার একটা গল্প বলতে হচ্ছে। আমি শুধু যুক্তি আশ্রয় না নিয়ে রসের মাধ্যমে বলে বোধহয় বক্তব্যটা ভাল করে পেশ করতে পারব। গল্পটার নাম, সমুদ্রপোত। বছর দুই আগে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে প্রীতিভাজন সতীর্থ প্রণয়

গোস্বামী। আশার কথা সে আজও হয়ত প্রয়োজনে সাক্ষ্য দেবে। কারণ এখনো তার সঙ্গে প্রণয় চটে-নি অথবা বিরহ ঘটে-নি। এ কথা এই জন্যই বলছি—অনেক প্রতিশ্রুতি আমার কাছে হাফ-প্যান্ট পরে এসেছে, দিনের পর দিন প্রেরণা নিয়েছে—স্নেহে প্রেমে আমি সম্বর্ধনাও জানিয়েছি বিস্তর, তাবপর সাহিত্যে খ্যাতিও হয়েছে, কিন্তু আজ তাদেব দেখছিনে। আজ সাহিত্য নয়, সঙ্গ চাই—কিন্তু মুছে ফেলে দিয়েছে জলেব আলপনা। আমি প্রীতি-ভাজনদের ক্ষমা করি। তবু নিঃসঙ্গ কুহেলী ক্লান্ত বাত্রে যখন একা একা হেঁটে বেড়াই, তখন বুকটা খচখচ কবে। এ ব্যথা নিতান্ত মানুষী। সান্ত্বনা নেই গীতায়।

প্রণয় হচ্ছে ব্যতিক্রম। সে যেমন গল্প কুড়াবাব সঙ্গী, তেমনি অনেক মানুষ কুড়িয়ে দেওয়ারও সাথী। যেমন ঝড় বন্যায় আলো নেই, তখন সে বাতিদান। তার মাধ্যম ছাড়া কি করে পবিত্র-কুমার রায় কিম্বা চিরকুমার নীরেন্দ্র গুপ্তের সন্ধান পেতাম? একজন হেঁটে এসেছেন অগ্নি এবং সন্ত্রাস-যুগের আগুন পেরিয়ে, আর এক-জনের হাতে কবিতার টাটকা স্তবক। দেখলাম নীরেন্দ্র গুপ্তেব মনটাই কাব্যময়। প্রশ্ন জাগে তাই কি মনেব মত মানবী পাওয়া সম্ভব হবে না কোন দিন? অথবা পেয়ে এত একান্ত হয়ে গেছে যে রক্ত মাংস মেদ মজ্জার আর মোহ নেই? ইতিপূর্বে নৈষ্ঠিক কর্মী কান্তি ভট্টাচার্যকে চিনেছিলাম। ছিল এই ব্যারাক বাড়িরই বাসিন্দা। তার গোষ্ঠীটাই বিদ্যুৎ শিখা। একদিন তার ভগ্নী বকুলের জবানবন্দীতে এক পুলিশ বাহিনীকে 440 ভোল্টে ধাক্কা খেতে দেখেছিলাম, যখন কান্তিরা দুই ভাই আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, পুরান আইনের চোখে নতুনরা বে-আইনি। আবার একদিন পুঁথি পুস্তক ঠাসা জ্যোতির্ময় ইনিস্‌টিটিউশনে অনিল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়। প্রণয়ের আলোতে আরো যে কত বন্ধু পেলাম! এই তো বলা হয়নি কামাখ্যা গোবিন্দ চংদারের কথা। নামটি যেমন অসাধারণ,

মানুষটিও তাই। ইস্পাতের মত এঁর যুক্তি এবং বিধৃতি। এই প্রীতিভাজন যুবকের ভিতর একটা মহাজিজ্ঞাসার আকুতি দেখলাম। জানি না সে জিজ্ঞাসার শপথ কবে বাণী মূর্তি নেবে। প্রথম সাক্ষাতেই একবার পরাজয় বরণ করে মানিক কুড়ালাম। তোমরা কেউ যদি রত্নসন্ধানী হও, আমার কাছে এসো দেখিয়ে দেব প্রণয়ের বাতিদান। পুরুষ জ্বলছে, তার রমণী গলছে, এর বেশি ব্যাখ্যা আমি জানি না। কে প্রধান সে বিচার তাদের প্রতিবেশী কবি নীরেন্দ্র গুপ্ত হয়ত করতে পারেন। আমি আবার 'সমুদ্রপোত'-এর খোঁজে এগিয়ে চললাম।

গিরিশ মুখার্জি রোডের ঠিক বিপরীত ফুটে কতগুলো খেলনা একটা গামলায়। পূজার মরশুম এসেছে। প্রণয়কে বলি, একটা গল্প পেলাম।

—তবে লিখে ফেলুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কাগজ কলম দেব নাকি?

ঠাট্টা করছ? কাল বিকাল নাগাদ বাড়ি গিয়ে শুনে এসো। ঐ সুমুখেই বিষয়বস্তু।

একা স্টিমসিপ পরিক্রমা করছে। ফট্‌ফট্ ফট্‌ফট্ কি তার বেগ মুখর শব্দ। চারিদিকের দর্শক তো অবাক। আমার পান্না একেবারে স্তম্ভিত!

একটু একটু ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন দেখা যাচ্ছে। জলরাশি তোলপাড়। ঢেউ ভেঙ্গে ঘুরে ঘুরে চলেছে জাহাজখানা। যেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসছে।

আমিও স্তম্ভিত হয়ে দেখছি। অভিনব নীল সমুদ্র। পরিক্রমা করছে একখানা সুপরিকল্পিত আধুনিক জাহাজ। হাল আছে, মাস্তুল আছে। কিন্তু নাবিক নেই। তবু চলেছে। বৃত্তচ্যুত হচ্ছে না কিছুতেই।

আমেরিকা কিংবা ইংল্যাণ্ডের কোনও ডক থেকে এখানা তৈরী করে আনা হয়নি। কোনো বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মএর কনট্রাক্ট পায়নি। প্রশান্ত মহাসাগরে এখানা কখনও পাড়ি জমাবে না। লোহিত-সমুদ্রের কোনো বন্দরেও এখানা ভিড়বে না।

তবু উগ্র কৌতূহলে সবাই চেয়েছে। আমাদের কলোনীর নবীন কর্মকারই এর স্রষ্টা। নীল সমুদ্র একটা গামলা। নিশ্চয় রান্নার পর সে ওটা নিয়ে বেরিয়েছে। কাপড় কাচার পর একটু নীল জল হয়ত অনুগ্রহ করে দিয়েছে কোনো কলোনীর বৌ। আহা! বেচারী যদি দুটো পয়সা পায় পাক না।

আমিও সমস্ত দিন জীবন-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে বাস থেকে নেমেছি। ঘোর সন্ধ্যা। ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির উঠানে এসে পা দিয়েছি।

পান্না বলে, আমাকে আজ একটা জাহাজ কিনে দাও না?

অনেকদিন ভাঁড়িয়েছি। আজও বলি,—জাহাজ কোথায়?

—কেন বড় রাস্তায় দেখ-নি?

বলি, না তো—কোথায় আবার জাহাজ? পান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। পকেটে পয়সা নেই, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলি,—চল শাকচুন্নি চল দেখি।

ঘরের ভিতর থেকে স্ত্রী বলে, ছিঃ ছিঃ ভর সন্ধ্যায় তুমি ওকে কি বলছ? একটা মাত্তর মেয়ে! যদি একটা খেলনা কিনে দেওয়ার সামর্থ না থাকে—দিও না, তা বলে যা তা বলবে কেন?

কথাটা ঠিক। অহমিকায় ঘা লাগে। জোর করে পা ফেলি। কয়েকটা আমগাছ ছাড়িয়ে নবীনের বাড়ি। বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়। শুধু একখানা ডাইনি-চুলো ঘর। বাঁয়ে রেখে আমরা সোজা রাস্তায় উঠি। কিছুদূর এগিয়েই ফটফট শব্দ। এইটুকু পথ যেতেই পান্না ছটফট করে। আমার দেরি তার অসহ্য

কিন্তু শ্রান্ত পা আর জোরে চালানো যায় না। মেয়েটা বলে,—একটু পা চালিয়ে এসো বাবা, নইলে সব বিক্রি হয়ে যাবে।

গেলে মন্দ হয় না!

কিন্তু গিয়ে দেখি একখানা ভাসছে। আর ডজন খানেক সাজান রয়েছে। অর্ণবযানের মিছিল দেখছে ছেলেমেয়েরা। কিছু বয়স্ক বালকও আছে। সমস্ত দিন গোমড়া মুখে খেটে, এখন বিনা পয়সায় একটু হাসছে।

বিস্মিত হচ্ছে কেউ কেউ।

দুপাশে উড়ন্ত নিশান —মাঝখানে মাস্তুল—শেষ প্রান্তে হাল, গলুইতে শৃঙ্খলিত নোঙর।—কোন বন্দরে ভিড়বে জাহাজ? প্রশ্নটা আমি করিনি—পান্না করেছে।

ভিড়ের মধ্যে আমি অনাবশ্যক ভেবে জবাব দিই-নি। না, ঠিক তা নয়—আমি নিজের জাহাজের খবরই বলতে পারিনে। একটা জীবনই প্রায় দিশেহারা দিক্‌চক্রহীন মহাসমুদ্রে কাটল, ওটার কথায় কি বলব?

লবনাক্ত লাগছে নিজের নোনা ঘাম।

যত গরীবের মেয়েই হক—আধুনিক মেয়ে পান্না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যমেরুতে তার জন্ম।

তাই বুঝি সমুদ্রাভিসারের জন্য তার অপরিসীম কান্না!

সে আবার বলে, একটা অমনি যদি জাহাজ পাই, তবে সাত সমুদ্দুর ঘুরে বেড়াই। আমি মনে মনে বলি,—মাগো হাঙ্গর আছে। ভিড়ের মধ্যে তাকে একটু দেহের সঙ্গে চেপে ধরি।

এবার অর্ণবযান আরও যেন দ্রুততালে ঘুরতে থাকে।

তখন একটু কাঁদলে কি হয়, মেয়ে আমার ভদ্র। আমাকে আর বিরক্ত না করে গামলার দিকে চেয়ে থাকে। গতিশীল রহস্যের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ।—কিন্তু ও তো জানে না, ঐ অর্ণবযান দুর্বার কুটিল খেলনা। ঠিক খেলনা নয়, ভাগ্য—

তোমাকে আমাকে নিয়ে পুতুল নাচায়। আশ্চর্য! হাসি পায়। পান্না ওকে দু-আনায় কিনতে চায়!

আজ আমার পকেটে পয়সা নেই। ভাবি সহস্র কোহিনূর থাকলেও আমি রাজী ছিলাম।

আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস্, ঔরংজেব, হিটলার কে না চেয়েছে? আরও অনেক দূর এগিয়ে হস্তিনায় চলে যাই, প্রজ্জ্বলন্ত ট্রয় পড়ে দৃষ্টিপথে। তারপর মিশরীয় পিরামিড। বহুযুগের ধ্বংস তপ্ত বালুকা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ি। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছি, একটু বিশ্রাম করি অন্ধকারে।

ম্যমিরা জেগে ওঠে। স্বর্ণ মুক্তা হীরা পান্নার—পেটি খুলে বলে, আমরাও রাজী আছি এ দুর্লভ বাণিজ্য করতে।

এশিয়ার প্রান্ত থেকে লবংগ, দারুচিনি, কর্পূরের গন্ধ আসে। বোধিদ্রুম তল থেকে গৌতম বুদ্ধ ডেকে বলে,—আমিও।

আবার পিছিয়ে যাই কয়েক হাজার বছর। চলে যাই মহাকাব্যের যুগে।—দ্বারকায় শরাহত মুমূর্ষ কৃষ্ণ কাঁদে!

সর্বশেষে নীলসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়—সফেন তরংগ।

ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত যীশু ছলছল চোখে করুণ মিনতি জানায়। আমাকে ভুলে যেও না কিন্তু।—

চোখ মেলে ছিলাম না। খুলে দেখি চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। নবীন কখন তার বাতিটা নিভিয়ে চলে গেছে। হয়ত তার একটা খেলনাও বিক্রি হয়নি! মেয়ে সব বোঝে। কাঁদে না, শুধু অভিমানে মুখ ফুলিয়ে বলে,—আজও দিলে না?

আমি বলি,—দেব দেব!

মেয়ে হয়ত আশায় আশায় চলে।

পরদিন আমিই প্রণয়দের বাড়ি যাই। গল্পটা শুনে বিস্ময়ে

আনন্দে প্রণয় চুপ। তার স্ত্রী উষা বলে ভাল। ফিরে এলে পঙ্কজিনী কিন্তু একটু জোর দিয়েই মন্তব্য করেন, আর একটা সেরা গল্প হল।

১।২।৫৮ বিকাল ৩-৫টা

এতক্ষণ বসে বুঝি ভাবলে ?

বিশ্বাস না হয় তোমার ধ্বন্যালোককে শুনিয়ে এসো।

বয়েই গেছে অত ঝামেলা করতে ?—কিন্তু চুপি চুপি রামের বাড়ি যাই। ফিরে এসে স্ত্রীকে বলি, তুমিই ঠিক বলেছ। শুনে এলাম কাব্যময় মর্মার্থ। এমন ব্যাখ্যা কখনও কল্পনা করিনি।

এখন আর প্রথম শ্রেণীর মাসিকে পাঠাতে দোষ নেই। ছাপা হল সেবার পূজা সংখ্যায়। তখনকার রেওয়াজ মত সাপ্তাহিক 'দেশে' বিজ্ঞাপন দেওয়া হল মাসিকটির। ছোট বড় সব লেখকের নাম আছে বিজ্ঞাপনের পাতা জুড়ে, শুধু আমারটি নেই।

তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য হ'চ্ছ পাঠক। এমন গল্পটার বিজ্ঞাপন নেই! এখন এ জগতে কিছুই আশ্চর্য নয়। একে ইংরেজিতে বলে, কিলিং বাই সায়লেন্স—বাংলায় বলে আঁতুড় ঘরে গলা টিপে মারা। কিন্তু আমার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ মৃত্যুই এখনও পর্যন্ত ষোল আনা এঁটে উঠতে পারেনি। নিয়তিকে স্বীকৃতি দিলেও আমি আশায় আশায় এগিয়ে চলি। আমার প্রত্যয় প্রতীতি সিদ্ধ।

॥ ছয় ॥

৩।২।৫৮ রাত্রি ১-৪টা

যে আশাবাদী সে-ই সংগ্রামী।

নিয়তি মানেই শুধু অদৃশ্য অদৃষ্ট নয়—পরিপূর্ণ হতাশাও বলা যায় না। তুমি আমি পরিষ্কার দিনের পর দিন অনেক কিছু দেখছি। আজ যে জন্মাচ্ছে, দিন কয়েক হাসি অশ্রুর পর সে চির-বিদায় নিচ্ছে। এর চাইতে বোধহয় নিয়তির বড় নজির নেই।

তবু তুমি কেরানী ফাইল সাজাচ্ছ। শ্রমিক চালাচ্ছ গাঁইতি।

অপারেটর মেয়েটি হ্যালো নাম্বার প্লিজ বলে অনুরোধ জানাচ্ছে। কলেজ করিডোরে কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে একটি চঞ্চল-নয়না ছাত্রী। সৈনিক টারজেট লক্ষ্য করছে। কৃষক বুনছে ফসল। আমি কথা-শিল্পী তোমাদের সংগ্রামের মালা গাঁথছি ভাষায়। সুর জোগাচ্ছে গায়ক। রঙে রেখায় মূর্ত করছে ভাস্কর। নিয়তিকে মেনে কেউ বসে নেই।

আমরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক দূর এগিয়েছি—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শিশু চাঁদের যুগে। কিন্তু তবু অনেক কিছু অদৃশ্য থেকে যায়—যা কনট্রোল রুমে বসে কনট্রোল করা যায় না। ভোট নাও, জগতের নিরানব্বুই জন শান্তিকামী। কিন্তু তৈরী হচ্ছে হাইড্রোজেন বম। তখন আবার সংগ্রাম। কেরানী, অপারেটর মেয়ে, কৃষক, ছাত্র, ভাস্কর, জিজ্ঞাসু। এ সব অন্যায় সমাজে করে কে?

আমি কথা-শিল্পী হয়ত মুখোস খুলে শত্রুকে দেখিয়ে দি। তোমরা মানচিত্র এঁকে যাত্রা শুরু করো—এই হল ঐতিহাসিক বিপ্লব।

এ নিয়ে আমি 'কনকপুরের কবি' উপন্যাসের ছাব্বিশ সাতাশ পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করেছি। শুধু যুক্তি নয়, উপলব্ধিতে আমার যতদূর পেঁছা সম্ভব হয়েছে, তাতে ত্রুটি করিনি। স্থিতধী পাঠক সম্পূর্ণ উপন্যাসখানা পড়লেই ভাল হয়।

জবাব আসতে পারে সময় এবং শ্রদ্ধা কোথায় তোমার জন্য? আর সকলে তো চা-বাগান ও কোলিয়ারীর মালিক নয়—মানে বিলাসী রাম পরায়ণ। চশমার পরম সুহৃদ—যার হাতে অঢেল সময়, সাহিত্য হচ্ছে যার বিলাস। কিছু দালালিও করে বোধ হয়? নইলে এমন ব্যাখ্যা!

আমার জন্য দালালিতে কোনো লাভ নেই। 'কনকপুরের কবি' দ্বিতীয় সংস্করণের মর্যাদা মূল্যও পায়নি। না শরৎ, রবীন্দ্র প্রাইজ।

তবু রাম পরায়ণ অনুভবে-দরদে-ব্যাখ্যায় বাঙ্‌ময়।

৪।২।৫৮ সকাল ৬-১০টা

এবার আর একবার ক্ষমা চাওয়ার পালা—সেই নাম ভুলে যাওয়া কবি বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইছি।

বলছি উনিশ শ তিপ্পান্ন সালের কথা। ছিলাম গভর্নমেণ্ট রেশনস্টোরের ম্যানেজার। এ চাকরিটা পেয়েছিলাম উনিশ-শ' পঞ্চাশে। 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' প্রকাশিত হল। সজনীদা কাগজ কলমে তেমন স্বীকৃতি দিলেন না, কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে দেখালেন অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা। অবশ্য তাঁর সঙ্গে বাণী রায়, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সাগরময় ঘোষও সহযোগিতা করলেন। এঁদের যৌথ সুপারিশেই দৃষ্টি আকর্ষিত হল তখনকার পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী নিশাপতি মাঝির। আর একটা বিশেষ উপকার করলেন সজনীদা—'শনিবারের চিঠি'তে লেখার জন্য জানালেন আহ্বান। এক সময় গোটা দুই লেখা পাঠিয়েছিলাম বঙ্গশ্রী'-তে। তখন ফেরত দিয়ে ছিলেন সজনীকান্ত। এখন সজনীদা সেই গল্পই ছেপে বললেন, বেশ হয়েছে লেখা দুটো। আমার মনে হয় গল্প দুটো কিন্তু এ্যাক্টিভ্ রোম্যাণ্টিসিজমের চড়া সুরে বাঁধা, সোজা কথায় প্রোগ্রেসিভ। আমি আর বেশি কিছু মন্তব্যের তকমা না পেলেও প্রীতির একটি গোপন দুয়ার খোলা পেলাম। আজও আমার সেই দুয়ার দিয়ে আনাগোনায় বিরতি নেই। আমি হয়ত বিষয়ী সজনীকান্তের কখনই তেমন স্বীকৃতি পাব না। কিন্তু মহৎ সজনীদাকে কখনই ভুলব না। ভুলব না রসিক এবং জহুরী সজনীদাকে। তিনি আজীবন বহু সাহিত্যিককে খ্যাতির খেয়ায় একের পর এক সরবে পেঁাছে দিয়েছেন, আমাকেও দিয়েছেন নীরবে পেঁাছে জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের কাছে। যা পাইনি তার জন্য আমার ক্ষোভ নেই, যা পেয়েছি তাতেই আমি তৃপ্ত।

একটা গল্প মনে পড়ল, অচিন্ত্যকুমার একদিন বলেছিলেন :

কল্পনা কর অন্ধকার দেব-মন্দির, কোনো এক বিশেষ যোগে অসংখ্য মেয়ে পুরুষ দর্শনার্থীর ভিড়। কত দূর দূরান্ত থেকে যে এরা এসেছে, শিক্ষিত অশিক্ষিতের অভাব নেই, একটি অল্প বয়সী গ্রাম্য বধূ কিছুতেই দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারছিল না।··· ভিড়ে অন্ধকারে পাণ্ডা প্রশ্ন করলে, দেখেছ ?...মেয়েটি অবলীলায় জবাব দিলে, হুঁ, দেখেচি।···বলতে চাও সেকি না দেখেও অনেক বেশি দেখেনি, না পেয়েও অনেক বেশী পায়নি তার অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে ? সত্যিকারের দেবতা কি তখন লুকিয়েছিলেন বিগ্রহের শিলাখণ্ডে ?···আমি তেমনি করেই পেয়েছিলাম সজনীদাকে। সব রেশনস্টোর গুলো গেল উঠে। দলে দলে লোককে ট্রেনিং দিয়ে জমিদারি তুলে দেওয়া খাতে পাঠাচ্ছে মাঠে মাঠে বন বাদাড়ে। এমন সব আইন কানুন তিন মাসের মধ্যে শিখতে হচ্ছে যা ঝানু আই-সি-এসরাও বোধ হয় পঁচিশবছর কাজ করে শিখতে পারেনি। সব ম্যানেজারদেরই কিছু টাকা পাওনা রয়েছে পুরান ডিপার্টমেণ্টে। কেউ তা আংশিক পেয়েছে, কেউ পায়নি, বিলি ব্যবস্থার চরম হট্টগোল। অথচ বিদেশ বিভূঁইয়ে যাত্রার জন্য সকলেরই অর্থের প্রয়োজন।

কবির সঙ্গে আলাপ গোপালনগরে ল্যাণ্ড রেকর্ড অফিসে—আমাদের ট্রেনিং সেণ্টারে। ক্লাশ হয় দশটা পাঁচটা। প্রায় সকলেই বিদ্যায় দিগ্‌গজ। যারা দু একটি জুয়েল ছেলে ছিল, তারাও এতকাল ম্যানেজারী করে গাধা বনে গেছে। সকলেরই চিন্তা কি করে এ আইন কানুন মুখস্থ করে পাস করবে ? হাজার হাজার এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট করেও ভূমি ব্যবস্থার গলদ দূর হয়নি। বরং হয়েছে জটিল। আমাদের মত বুড়োদের নিত্য নতুন আইনের মার প্যাঁচ দেখে চক্ষুস্থির। ভাগ্যিস মেয়ে ম্যানেজার ছিল না। তা হলে তাদের চোখের জল কে সামলাত ?

আমি ভাবছি ফেল করব। সাদা খাতা পরীক্ষায় দাখিল করে বরাবরই ট্রেনিংয়ে রয়ে যাবো। নিশ্চিন্তে ক্লাশের এক কোণে বসে হাঁপাই। কারণ তখন আমার শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছে।

একদিন একজন বললে, ব্ল্যাঙ্ক খাতা সাবমিট করলেও রেহাই নেই, পাস লিখে পাঠাবে। এঁরা কাউকে বসিয়ে খাওয়াবে না।

আমার মাথায় বাজ পড়ল যেন।

ওদিকে ক্লাশে তখন কোনও ইনস্ট্রাকটর নেই। এক বাবড়ি চুলো পঁয়ত্রিশ বছুরে ছাত্র আবৃত্তি করছে কবিতা—উদাত্ত কণ্ঠ, ওস্তাদী মাথা নাড়া।

৪।২।৫৮ বেলা ৩-৫টা

যে পরিবেশই হক, তবু কাব্য। আমি কথা-শিল্পী। মনে চমক জাগল বেশ, একটু সাবেক ধরনের কবিতা হলেও সুললিত ছন্দ। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করলাম। জানলাম, কবিতাগুলো তাঁর নিজেরই রচনা। শুধু রচনা নয় পুস্তকাকারে ছাপা, বাঁধাই। সম্ভ্রম হল। জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কত দিন আগের লেখা ?

প্রায় বছর দশেক আগের ছাপা এ বই।

তারপর ?

আর কিছু লেখা হয়নি। শুধু চাল চিনি আটার নির্ভুল হিসেব রেখেছি। ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে গর্তে পড়েছি। এবার নিকোবর না আন্দামান পাঠায় জানি না।

আমি বলি, তাই বুঝি কবিতা ? স্মৃতি রোমন্থন ?

কবি হাসলেন। সলজ্জ করুণ।

কে যেন বললেন,—ইনি অমরেন্দ্র ঘোষ! অনেকগুলো বই লিখেছেন। পদ্মদীঘির মাঝি, চরে ছিল কাশেম। আর কি কি যেন আপনি বলুন না! আমাদের মত ম্যানেজারের খোঁটায় বাঁধা ছিলেন।

ইনিও একজন সাবেক বি. এ.—বিদ্যা এবং শ্রদ্ধা দেখে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। চুপ করে থাকি, কিছু বলিনে। ধীরে ধীরে ভীড় পাতলা হয়।

কিন্তু কবি কথা বলিয়ে ছাড়েন। দরদে অনুরোধে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। সংক্ষিপ্ত সাহিত্য জীবন বলেই নাম বলতে হয় বইগুলোর। পদ্মদীঘির বেদেনী, চরকাশেম ইত্যাদি।

৫।২।৫৮ বিকাল ৪-৬টা

প্রায় খান পনর উপন্যাস-লেখকের নাম জানেন না—কবি লজ্জিত হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করেন।—আমিও ভালভাবেই বি. এ. পাস করেছিলাম। বাংলায় অনার্স ছিল। কাঁচা পয়সার ফাঁদে পা দিলাম, বে-থা করলাম—এখন দেখছি সবই ভুল, ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। কিন্তু উইথ সো মেনি লাইবিলিটিজ, আপনি তবু লেখাটা বজায় রেখেছেন!

আমি জবাব দেই,—স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙে গেছে। অন্ধকার গো-ডাউনে চাল গমের বস্তার মধ্যে বসে লেখা। বাইরে কাঁটা কামানের কাছে কেবলই ভয়, কখন সাদা পোষাকে টিকটিকি আসেন। ডি. এম., সুপারভাইজার, এ. ডি. এম. কর্তার অভাব নেই। সকলেই একটি বিষয় শুধু জানেন সর্ট ওয়েট ড্রাইভ।—ফের হাতজোড় করে শুরু করি, নমস্কার বেঁচেছি। যে ঝামেলার চাকরি। স্টোরের ফার্স্ট গ্রেড, সেকেণ্ড গ্রেড, দায়োয়ান, কুলি যিনিই দোষ করুন, ম্যানেজারের কান ধরে নাকানি-চোবানি। ওরে বাপরে—কৈফিয়ৎ দাও, লাইবিলিটির খেসারৎ গনো, কেন পাঁচ সের চাল ইঁদুরে খেলো? রাত্তিরে কি তোমার দারোয়ান পাহারা:দেয় না স্টোর?

কবি বলেন, আমি কিন্তু শক্ত ছিলাম, আমার স্টাফরা ট্যাঁ ফুঁ করতে পারত না—কাজ শিখেছিলাম সব রকম। ডি. আর, ক্যাশ মেমো, উইক্‌লি রিটার্ন ছিলো নখদর্পণে।

আমি কিন্তু কোন কাজ ইচ্ছে করেই শিখিনি। ছিলাম ম্যানেজার স্রেফ ম্যানেজ করে নিতাম।

কি করে ?

সব দায়িত্ব স্টাফের হাতে সঁপে দিয়ে।

আপনাকে ঘায়েল করেনি যত সব বিশ্বাসঘাতকের দল ?

না। বরং ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছি।

কবি চোখ দুটো বড় বড় করে তাকান।

আমি বলি,—এবার যেদিন বাইরে বদলি করবে চাকরি ছাড়ব। আদিত্য চক্রবর্তী ফাস্ট গ্রেড বলেছিল ম্যানেজারবাবু স্টোর থেকে বেরিয়ে আমাদের কথা লিখবেন কিন্তু।

—কে আদিত্য ? সেই 'টি' এরিয়ার নটোরিয়াস ফাস্ট গ্রেড ? সর্বনাশ !

দোষের কথাটা তার সবাই জানে। কিন্তু তার গুণের একটা বড় দিকও ছিল। আমার সঙ্গে সেইদিকটারই পরিচয় হল প্রথম। সে কুশলী নটশিল্পী। প্রথম যেদিন বদলি হয়ে এলো আমার স্টোরে, আমি তার শিল্পী সত্তার কাছে, ম্যানেজারির অহং সত্ত্বা সঁপে দিয়ে বললাম, এই চাবি ছড়ানি ক্যাশ—এবার নিশ্চিন্ত মনে লিখতে চাই।

দোহারা ছিপছিপে সুপুরুষ যুবা। চোখ দুটো দুখানা ছুরির ফলার মত উজ্জ্বল। রাখবে না জবাই দেবে বোঝা মুস্কিল। একটু ভেবে বললে,—আপনি শুনেছি লেখেন—তা প্রাণ ঢেলে লিখুন। যতদিন আছি সব দায়িত্ব আমার।

সত্যিই আমি প্রাণ ঢেলে 'কনকপুরের কবি' লিখলাম। গতানুগতিক উপন্যাসের ধারা গেল পালটে। হল সাবজেক্টিভ টাইপের লেখা কিন্তু রোমান্টিক, অথচ বাস্তবধর্মী এ উপন্যাসের কাঠামো। কিন্তু যাকে বলা হয় স্ত্রী-পাঠ্য আদৌ তা নয়।

৬।২।৫৮ সকাল ৬-৯টা

'দক্ষিণের বিল' অনেক দূরে ফেলে এসেছি, 'পদ্মদীঘির বেদেনী'

তার অপূর্ণ মাতৃত্ব নিয়ে যাত্রা করে গেছে যেন কোন্ নিরুদ্দেশে। 'জোটের মহলে'র নায়ক দিবাকর আর ফেরেনি। শেষ হয়ে গেছে একটি সংগীতের জন্মকাহিনী। আর কোন রেশ নেই রাধার রূপের গানের গমকের।

কানে বাজছে হুইসেল, মোটরের হুর্ন। চোখে বিঁধছে ইঁট বালি কংক্রিট। ভয় হল অনেক দূর মাটি জল ফসল ছেড়ে এগিয়ে এসেছি, এবার বুঝি হারিয়ে যাবে কনকপুরের কবি—অমরেন্দ্রের জীবন কাব্য, যৌবনের এক সংঘাতময় পরিস্থিতি, বহু অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল, রাশি রাশি কত দলিল যে পড়েছি!

এতকাল .মৃত্তিকার মাধুর্যই শুধু দেখেছি, দেখেছি তার মাতৃরূপ। কিন্তু তাকে নিয়ে যে হানাহানি কালো কারবার গড়ে উঠেছে, তা নজরে পড়েনি। তুলটে, তাম্র ফলকে বাদশাহী অঙ্গুরীর ছাপে, বণিক রাজত্বে স্ট্যাম্পের পটভূমিতে শুধু ঠকাঠকি হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থ আর স্বার্থ। অন্ধকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শুধু লোভের ইতিবৃত্ত। দেখলাম সহস্র সহস্র অর্ধাহারী অনাহারী মুখ রেশনের দোকানের কাউন্টারে।

এখন না লিখলে ভুলে তলিয়ে যাবে যত সংগ্রহ করা মাল-মসল্লা। তাই শিল্পী বন্ধু আদিত্যের আশ্বাসে লিখতে বসলাম। একবার দুবার তিনবার লিখে পাণ্ডুলিপি শেষ করলাম।

৬।২।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা

আদিত্য বললে, ভাল লাগছে, কিন্তু বড্ড কঠিন ঠেকেছে—স্ত্রী বললেন হয়েছে।

প্রায় দেড় বছর বাদে কলম থামালাম। আমি কিন্তু মনে মনে তৃপ্তি পাচ্ছিনে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, মুখে হাসি নেই কেন?

কি যেন বাকি রয়ে গেছে লিখতে। এতকাল মাটির সঙ্গে মিশে যা দেখেছি তা যেন সম্যক লেখা হয়নি। কোথায় যেন ফাঁকি রয়ে গেছে।

তোমার নায়ক কবি সব করলে, তর্ক তুললে তুমুল, জয়ন্তীরাণীকে ভাসিয়ে নিলে যুক্তিতে কিন্তু নিজে তো বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়লে না—এই পর্বটাই বাকি। তাই মিশ খাচ্ছে না। এখন না পার পরে লিখো।

আবার দ্বিতীয় খণ্ড? না, না এই খণ্ডেই লিখতে হবে, কিন্তু এ বই পড়লে কি কোনও প্রকাশক ছাপবেন? সামন্ততন্ত্রের জলসাঘরে নিতান্তই বারোয়ারি নাটক!

এ কথার জবাব আমার কাছে নেই, তবে তোমারও না লিখে কল্যাণ নেই।

জানো তো এ বই লিখতে আমার কি পরিশ্রম গেছে, তারপর যদি ছাপা না হয়। অন্ধকার গুদামে প্রায় দেড়টা বছর বন্দী ছিলাম। স্বভাবতই গ্রে-র এলিজির কথা স্মরণ হয়। মনটা ওঠে পুড়ে। কনকপুরের কবি-ও কি গ্রের-এলিজির সত্যতা প্রমাণ করবে? কবে পড়েছিলাম Full many a flower is born to blush unseen......

বসেছিলাম না। যাদের সাহায্যে, আনুকূল্যে এ পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হল, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। মুখবন্ধের মতো লিখে ছেপে দেব প্রথম দিকে। কিন্তু যখন উপন্যাস ছাপা বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরুল, তখন দেখি কৃতজ্ঞতা ছাপা হয়েছে ফেলনা বিষয়ের মত পিছনে। বুঝলাম যদি শেষ ফর্মায় একটি পাতা বাড়তি না হত, তবে হয়ত ওটুকুও লোকচক্ষুর সুমুখে আসত না। পাঠক নিশ্চয়ই জানো এখানকার নিয়ামক ঈশ্বরের চাইতেও খেয়ালী।

৬।২।৫৮ রাত্রি ১টা—৬টা

যখন ওটুকু ছাপা হয়েছে, তখন কয়েকটি কথা বলি। কৃতজ্ঞতা জানান মানে ঋণশোধ নয়। মায়ের শ্মশানে পঞ্চরত্ন তুলে কি তাঁর দুধের একটি ধারারও দেনা শোধ করা সম্ভব? তবু নিরুপায় মানুষ তা করে, যে কিছু পারে না, সে অন্তত শ্মশানঘাটের

দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে বারবার লেখে মাতৃ-পিতৃনাম। চোখের জল মোছে আর লেখে। বারবার স্মরণ ক'রে তৃপ্তি পায়।

আমি যা লিখেছি তা তুমি হয়ত পাঠ করনি। রচনায় কোন মৌলিকতা নেই, অর্থে কোন বৈশিষ্ট্য নেই—তবু লিখেছি। এক পাতায় অত্যন্ত ভয় ভয় যা লিখেছি, এ এক পাতার বিষয় নয়—উপন্যাসের মত ব্যাপ্ত ঘটনা বহুল, কিন্তু করতে হয়েছে চাপে পড়ে সঙ্কুচিত। আমি নিরুপায় জেন।

তবু খানিকটা তৃপ্তি পেয়েছি।

ভাল যদি না-ও লাগে তুমি অন্তত একবার চোখ বুলিয়ে যাও আমি আরও তৃপ্তি পাব।

কৃতজ্ঞতা

মহাকবি কালিদাস, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানান বাহুল্য। তাঁদের কাছে আমি কেন বিশ্ব সভ্যতাই ঋণী।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমসাময়িক প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুদের —সাহিত্যরসিক ও উদ্যমী তরুণ প্রকাশ সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার ও কবিবন্ধু বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচনা ব্যতীত এ উপন্যাস তিন তিনবার অদল বদল করে লেখা হত না। শেষবারে একেবারে বদলে গেছে কাঠামো।

বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছে শ্রীমান বিপুল ও মলয় চ্যাটার্জি। অধ্যাপক শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, নির্মল সিংহ, সাহিত্যিক শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান নবকুমার সিংহ ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ শ্রবণ নিন্দা ও স্তুতি করে ধন্য করেছেন।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিনা অনুমতিতে, কবির 'ক্ষুধা' কবিতাটির হুবহু প্রথম পংক্তি ও কথা-

সাহিত্যিকের লোকসংগীত সংগ্রহের তিনটি পংক্তির ছায়া গ্রহণ করেছি। তারপর যাঁরা নানা ভাবে আমার জটিল সাহিত্য-সাধনার পথে সাহায্য করেছেন, তাঁরা সাহিত্য-রসিকের চেয়েও বলব সাহিত্যিকের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল—শ্রীমান প্রভাত মৈত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ হালদার, অনিল ভদ্র, সুধীর মানিক, নীরোদবরণ ও প্রমোদ চক্রবর্তী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরথ সেনগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, বিশ্বনাথ নস্কর, নরেন্দ্র তরফদার, হরিদাস ও শ্রীযুত শঙ্করজীবন ব্যানার্জি।

অবশেষে যার কাছে আমি সবিশেষ ঋণী, সে ছিল আমার সহকর্মী তরুণ নটশিল্পী শ্রীমান আদিত্য চক্রবর্তী। তার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত এ উপন্যাসের জন্ম ছিল অসম্ভব। তাই কনকপুরের কবির সঙ্গে তার বন্ধন অচ্ছেদ্য। ইতি—

অমরেন্দ্র ঘোষ

॥ সাত ॥

৭।২।৫৮ বেলা ১-৩টা

এক মার্জিত রুচি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান চিঠি লিখেছেন, তাঁরা আমার লেখা সম্বন্ধে আগ্রহশীল। চিঠি পেয়েই ট্রামে উঠলাম, অল্প কিছু ভণিতার পর 'কনকপুরের কবি'র পাণ্ডুলিপি খুলে দেখালাম, খানিকটা পড়ে শোনালাম এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অংশীদার গোপালচন্দ্র রায়কে। নিরালা পরিবেশ, তিনি শ্রোতা, আমি পাঠক আর কেউ উপস্থিত নেই।

বললাম, কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম পংক্তি হচ্ছে—'ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনি করেছ' এই পংক্তিটির নির্যাস রয়েছে এ উপন্যাসের আদিগন্ত জোড়া। সমগ্র সমাজের আদ্যোপান্ত কাঠামো আমি মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

করেছি। এক ফোঁটা চোখের জলও। প্রেম এখানে গৌণ—বঞ্চনা এবং বৈষম্য হচ্ছে মুখ্য। বসুন্ধরার জীবন সংগীতেও এইক্ষুধা ও বঞ্চনার সংঘাত। এই ক্ষুধাকে কতিপয় বে-আইনি করেছে। শিল্পী ভাস্কর কবি করেছে সাহায্য। তারই ছদ্মবেশ খুলে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। বিষয়টা কেমন বলুন তো?

তিনি বললেন, পড়ুন।

আমি খানিকটা একটানা পড়ে গেলুম। কিছুক্ষণ বাদে বড় বড় দুটো সন্দেশ এলো, বুঝলাম পরীক্ষায় আমি কৃতকার্য। একটা অগ্রিম টাকা পয়সার কথা হল। কিন্তু বিরাম মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা ওখানেই রয়ে গেল। বুঝলাম শ্রীমুখোপাধ্যায় শুধু কবি ও সাহিত্য-রসিক নন, এখানকার চিফ হুইপ। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া উচিত নয়।

খানিক আগে পরিচয় হয়েছিল—এবার আর একটু সম্ভ্রমে গদগদ হয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম, এখন আপনার ওপর সব নির্ভর।

আমি শুধু একটিবার চোখ উলটে যাবো।

না, না ভাল করে পড়বেন। দোষ ত্রুটি থাকলে বলবেন। এখনো হাতে সময় রয়েছে ভেঙেচুরে লেখার। 'দক্ষিণের বিল' পাঁচশ' পাতা উপন্যাস আমি তিন চার বার লিখেছি।

বেশ। দিন পনর বাদে আসবেন।

আমার যে কিছু এ্যাডভান্স চাই।

কটা দিন বাদেই নেবেন।

৭।২।৫৮ বিকাল ৪-৬টা

মাত্র কখানা উপন্যাস বেরিয়েছে বাজারে। একদল বলছেন এমনটি আর হয়নি, আর একদল বলছেন যাচ্ছে তাই। যতই মাল থাক, এখনো স্টাইল ফর্ম করেনি। কোন কোন সতীর্থ বলছেন—বুড়ো বয়সে আর কোন আশা নেই! ইস এত মালমশলা

থাকতেও কিছু হল না। এই যে গায়ে পড়ে সহানুভূতিতে জলুনি টাটানি এর হেতু যে কি তা বুঝতাম না। তবে এটুকু বুঝতাম এঁরা আমার প্রতিষ্ঠা বাড়াচ্ছেন, বোধহয় গত জন্মের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বাড়ালেও, বার বার নাড়িয়ে দিচ্ছেন কমার্শিয়াল মূল্যের কাঁটাটা।

আমি তাই কটা দিন বাদে আসাই স্থির করে কাউন্টার ছাড়লাম। ভাবলাম কবি অমন একখানা কবিতা লিখেছেন বলেই এতগুলো টাকার আশ্বাস পেলাম। সব টাকাই প্রায় এ্যাডভান্স। প্রকাশক ছাপবেন বাইশ'। গেটআপের যা আইডিয়া দিলেন তা পরম লোভনীয়।

এতদিন বাদে মার্জিত রুচি পাবলিশারের হাতে পড়ে বুঝি জাতে উঠব।

নেপথ্য থেকে কবিকে ধন্যবাদ জানালে শুনবেন না, ট্রামে উঠে আবার মনে মনে আবৃত্তি করি, 'ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনি করেছ' 'ক্ষুধাকে…' সার্থক করেছে তোমার লেখা আমাকে—আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি হে বিপ্লবী কবি, তুমি জগৎ বরেণ্য হও।

অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের কি যে নিগূঢ় মিতালি!

নির্দিষ্ট তারিখটি ঠিক হিসাব রেখে ফের এখানে এলাম।

বিরামবাবু একটি মূল্যবান ইংগিত করলেন এবং বললেন ধীরে ধীরে যুক্তির শলাকা অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে, বইখানা তো হাফ্ ফিনিসড্?

ফিনিস করতে সাহস পাইনি। এখনো করে দিতে পারি। সে যে হবে আগুনে ঘৃত সংযোগ—আপনারা ছাপবেম কি?

না ছাপালেও আন্-ফিনিসড্ রাখা কি উচিত? নায়ক কবির অনুভূতি এলো, সে ভাব বিপ্লব করল—কর্ম বিপ্লব ব্যতীত স্বার্থকতা এবং সঙ্গতি রক্ষা হয় না যে!

শ্রীমুখোপাধ্যায় বসে বসে প্রুফ দেখছিলেন। ইচ্ছা হল হাতের

ফর্মাটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দি। ওঁর চেয়ার এখানে নয়, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে—যে কোনো আচার্যের আসনে।

একটা ব্যথা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিরাট গনেশ এ্যাভিন্যু ধরে এগুচ্ছি, দুধারে ইঁট পাথরের ইমারত। উত্তপ্ত রোদেও আকাশটা ধোঁয়াটে মলিন। কার কাছে জিজ্ঞাসা করি, এ অসংগতির অর্থ কি? ডজন ডজন মোটর—হু-হু গতিবেগ, কিন্তু আমিও তো তেমন এগুতে পারছিনে?

'কনকপুরের কবি'র ত্রুটিটুকু আমার মনে খচখচ করছিল, পঙ্কজিনীও দেখিয়ে দিয়েছিলেন—এবার শ্রীমুখোপাধ্যায়। হ্যাঁ তার আগে বলেছিলেন বন্ধু সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার। অতএব রসিক শ্রোতা এবং পাঠকের নির্দেশে এবার 'কনকপুরের কবি' ত্রুটি মুক্ত হল। কর্মবিপ্লবে টেনে নিয়ে এলাম গল্প, উপন্যাসের নায়ক এগিয়ে চলে। বুকে তার সংগ্রামী শপথ।

কিন্তু বই আর ছাপা হল না এখান থেকে। শ্রীমুখোপাধ্যায় কিছুতেই অনুমোদন করতে পারলেন না আমার লেখা।

কারণ জিজ্ঞাসা করলাম রমেশদার কাছে।

তিনি বললেন, ঠিক শপথ করে বলা যাবে না, কিন্তু অনুমান করলে বোঝা যায়, এখানেও রয়েছে বোধহয় আপনার গত জন্মের বন্ধুদের ভালবাসা। আসলে আমরা সামাজিক জীব, কম বেশি সকলেই সাম্প্রদায়িক।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে আমার বই ছাপা না হলেও এঁদের সৌজন্য বোধ আলাদা। বেশ কিছুটা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার জীবন সংগ্রামে। লেখকের তালিকায় তখন স্থান না পেলেও মর্মের তালিকায় স্থান পেলাম। এগিয়ে গেলাম মাস তিনেকের পথ প্রীতি শুভেচ্ছা ও বদান্যতায়। আজও পথ চলতে যখনই অহেতুক ধাক্কা খাই, তখনই ভাবি মতান্তর ঘটলেও এঁরা তো এমন কখনও পিছন থেকে ধাক্কা মারেননি।

একদিন শ্রীগোপালদাস মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন। এত বড় বই তা কে ছাপবে বলুন ? আপনার তো নাম যশ নেই। কত পার্সেন্ট রয়্যাল্টি চাই ?

—টুয়েন্টি।

—টেন। যদি রাজি থাকেন, বলুন, আজই প্রেসে দিয়ে দিই। এযে গন্ধমাদন !

যিনি এ ভার বইতে পারবেন তাঁর হাতেই সঁপে দেওয়া উচিৎ, আমি এ সুযোগ ত্যাগ করলাম না।

অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও গোপালদার সাহিত্যের বাজারে খ্যাতি অটুট। তিনি নিয়তির মত নিষ্ঠুর, আবার কর্ণের মত দানবীর। যখন কোথাও এক পার্সেন্টের আশা নেই—কপি রাইট দিতে চাইলেও ক্রেতা নেই, তখন তিনি টেন পার্সেন্ট। এই জন্য মৃত এবং জীবন্মৃত সাহিত্যিকের তিনি চির নমস্য। তাড়াহুড়ায় বহু মুদ্রণ প্রমাদ নিয়ে বেরুলেও, 'কনকপুরের কবি' আমার প্রতিষ্ঠা আর এক ধাপ বাড়াল

৮।২।৫৮ সকাল ৭-৯টা

গোপালনগর ট্রেনিং সেন্টার। সেই কবির প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে যে কত দূর ঘুরে এলাম ! বলতে বলতে যে কত কথাই বলতে ইচ্ছা করে ! পাঠক তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি আমার হয়ত দেখা হবে না, তবু গড়ে তুলতে ইচ্ছা করে নিবিড় পরিচয়। এই কথা ছাড়া আমার তো আর কোনো ঐশ্বর্যের উপঢৌকন নেই।

একখানা বই পড়তে চাইলেন কবি।

৯।২।৫৮ সকাল ৭-৯টা

রাজা তার অহংকার নিয়ে পথ চলে, চারণ তার কণ্ঠ, পূজারিনী ভক্তি অর্ঘ্যের পুষ্পাঞ্জলি—আমার কাছে অস্ত্র থাকে এক আধখানা বই। দায় ঠেকলে ঐ অস্ত্রই সম্বল। কবির হাতে তুলে দিই 'কনকপুরের কবি'—শ্রদ্ধা নিয়ে পড়েন যেন। সাধারণে বলে বড়

কঠিন। কিন্তু অসাধারণ পাঠকও আমার আছে। এ লেখা কতিপয়ের জন্য, মানে মনের দিক থেকে প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য। এই যেমন বন্ধু রামপরায়ণ রায়, অধ্যাপক কবি মাখনলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁরা বলেন, এই তোমার শ্রেষ্ঠ রচনা ভাই। আমি কিন্তু কিছু মন্তব্য করছিনে। পড়ে রায় দেবেন।

পরদিন কবি এলেন দেরিতে—বড় বড় চোখ দুটো রাঙা।

ব্যাপার কি ?

সারা রাত জেগে আপনার বই পড়েছি, ফাস্ট আওয়ারে গিয়ে ঝগড়া করে পুরান ডিপার্টমেণ্ট থেকে লাইবিলিটির জমা টাকা তুলে এনেছি, এই দেখুন এখনো আমার হাত পা কাঁপছে,—তিনি হাত বাড়িয়ে দেন সুমুখে, আমি সাগ্রহে করমর্দন করি।

ভুগছি-ধুঁকছি-লিখছি 'কনকপুরের কবি-'র প্রসঙ্গ। অনেকদিন মাখনলাল মুখোপাধ্যায় আসেন না, একটা শূন্যতা বোধ করি, একটা বিরতির নিঃসঙ্গতা! আমিও স্বাস্থ্যের জন্য খবরাখবর নিতে পারি নে।

অধ্যাপক বলতেন, আপনি 'কনকপুরের কবি'-র পর অনেকগুলো বই লিখেছেন বটে, কিন্তু এখানাকে উত্তরণ করতে পারেননি। এর সাব্‌লাইমিটি আলাদা।

কিন্তু মাখনলালের নিভৃত রাগরাগিনীর আলাপ, কবিতা, আত্মভোলা সঙ্গ—সব জড়িয়ে যে সাব্‌লাইমিটি তা তো আরও অসাধারণ। 'কনকপুরের কবি'-কে কখনো ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, এতগুলো গুণকে উত্তরণ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বসে বসে মাখনলালের কবিমনীষার অমূর্ত রূপটি মনে মনে অনুভব করি। এঁরা পুঁথি-পুস্তকে প্রকাশিত প্রচারিত নন, কিন্তু সমাজের বুনিয়াদে প্রতিদিনের সঙ্গী।

সেই সঙ্গীরই যে কতদিন সাহচর্য পাইনি।

অনেক দিন পরের কথা বলছি, আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি,

জানিনে কবি কোন্ বন-বাদাড়ে বদলি হয়ে গেছেন। আর একটি পাঠক এলো বীরেন ঠাকুরতা। গল্প লেখে, ছবি আঁকে, বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, রোগা পাতলা গঠন—সোনা ভাঙা রং, নাকটি খাঁড়ার মতো ধারাল। অমনি অধীর, অমনি উত্তেজিত। সেও রাত জেগে 'কনকপুরের কবি' পড়েছে। সঠিক বললে বলতে হয়, কে যেন পড়িয়ে ছেড়েছে। এককালে সে ছিল নাকি রাজনৈতিক কর্মী।

বললাম—অত উত্তেজিত হতে নেই, এসো বরং এক কাপ চা খাও। সেই উপলক্ষে আমিও একটু গলা ভিজিয়ে নিই।

গলা নয়, আজও ভুলে যাইনি—আমারও সারা শরীর কাঁপছিল তখন!

১০।২।৫৮ সকাল ৬-৯টা

বাবা বলতেন সুযোগ পেলে তার কেশাকর্ষণ করতে হয়। আমার বালক চিত্তে একটা ছবি ফুটে উঠত, কবি চিত্ত কল্পনায় রঙের তুলি টানত, সুযোগ যেন একটা বলগাহীন বুনো ঘোড়া। তীরের মত ছুটে চলেছে, তার হাওয়ায়-ওড়া কেশগুচ্ছ ধরে লাফিয়ে উঠতে হবে পিঠে।

লেখাপড়ার তেমন চাপ নেই, এমনি একটা ঘোড়ার খোঁজেই ঘুরে বেড়াতাম ধুনোটের ধুলো বালির পথে। কার যেন একটা সাদা ঘোড়া ছিল—একটা চোখ কানা। কিন্তু বড় দুরন্ত, সুমুখের পা দুখানায় ছাদন, তবু ধরতে গেলে ক্যাঙারুর মত লাফ। সওয়ারের অনুপাতে অনেক বড় হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া, আমার মনে হত এই সুযোগ—যদৃচ্ছা চড়ে বেড়াচ্ছে, লাগাম নেই, লাফে লাফে কেশ দুলছে।

ছাদন খুলে অতর্কিতে মুখে দড়ি পরাই দুঃসাহসে ভর করে। তারপর লাফিয়ে উঠি ঝুঁটি ধরে পিঠে। জিন নেই, গদি নেই—গলা জড়িয়ে ধরে, ঘাড়ের কেশর কামড়ে কোনো প্রকারে রক্ষা সেদিন।

কিন্তু কতটা পথ আর যেতে পারলাম!

১১।২।৫৮ সকাল ৭-৯টা

আবার জবাবদিহি করতে হচ্ছে, কাল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর চালাতে পারিনি কলম, ন'টার আগেই থামাতে হয়েছে লেখা। পরমায়ু হন্তারক বায়ু ক্ষেপেছে, হৃদপিণ্ডে দিচ্ছে গুঁতো, বিষম ধস্তাধস্তি। হাঁস মোরগের লড়াই দেখনি? জীবন মৃত্যুর ঘুঁষোঘুঁষি, দিব্যি খাবি খাচ্ছি আমি, মুখে আবোল তাবোল বকছি, গ্লানি ক্লান্তি দূর করার আর পথ নেই, তবু বুদ্ধি এবং সহন শক্তিটা রেখেছি স্থির, কালহরণ করছি, মহাশক্তিমান মৃত্যুরও আছে শ্রান্তি, এখন আমার জবানবন্দী লেখা অনেকটা বাকি।

সারাটা দিন অমনি কেটে যায়, ঘনিয়ে আসে কুয়াশা ও অন্ধকার।

আজ রমেশদার একার ওপর নির্ভর করে বেরুতে সাহস হচ্ছে না। সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে বলি—তুমিও চলো।

কোথায়?

হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনো স্থানে। শেষ জীবনে এই আমাদের হনিমুন।

চটপট সংসার গুছিয়ে ফেলেন স্ত্রী, ছোট ছেলে অশোক ও তার ছোটদি রেবা থাকবে ঘরে, বড় ছেলে বাসুদেব সবে ট্রেনিং ক্লাস করে ফিরেছে বাড়ি, সে ইস্কুল ফাইনাল দেবে, পেটে দাউ দাউ ক্ষিধে, চারটি মুখে দিয়েই পড়তে বসবে, তারপর আমরা যতক্ষণ না ফিরি ছোট ভাই বোনের খবরদারি।

এতটুকু ঘরে এত বড় একটা সংসার! যার রোগীর যজ্ঞই হচ্ছে অনুকোটি পর্ব। তা ছাড়া রয়েছে ছেলে মেয়ের স্নেহের প্রয়োজনের সহস্র দাবী মিটানর ফর্দ। গুছালেও গোছান হয় না, চাপ পড়ে কচি কিশোরী মেয়ে রেবার ওপর, এই যেমন ভাতটা নাবিয়ে নিস, বিছানাখানা তুলে রাখিস, মুদী দোকান থেকে আসা বাকি রয়েছে তিন প্রস্থ টুকিটাকি।

অশোক বলে—মা, বাবার সঙ্গে যাও, আমি কাঁদব না, রেবাদি মায়ের মত, তার বুকের কাছে শুয়ে থাকব।

ইস্কুল ফেরত রেবারও মুখ শুকিয়ে যায়, কিন্তু পর মুহূর্তে সেও বলে—যাও মা, বাবার সঙ্গে যাও, কি আর এমন কাজ, বাসন দুখানাও না হয় মেজে রাখব।

বিশুষ্ক বাসুদেবও মাকে ছাড়পত্র দেয়,—মা তৈরী হয়ে নাও, বাবা দম নিতে পারছেন না।

আমরা বেরিয়ে পড়ি, আমার দুপাশে দুটি স্বাস্থ্যের সর্বশ্রী, স্ত্রী ও রমেশদা।

পিছনে কিন্তু কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও ক-টি বিষণ্ণ মলিন মুখ, হৃদয়ে ব্যথার অশ্রু, ঘরে মা বাবা কেউ নেই, মানে সন্তানের কাছে যেন কোনো অবলম্বনই নেই।

আমি ভাবি যাবো না, এ মায়া মোহ বন্ধন ছেড়ে নড়ব না, ঐ কুঁড়ে ঘর আমার স্বর্গ। কিন্তু কে যেন ধাক্কা মেরে ঠেলে নিয়ে চলে নাৎসী ক্যাম্পে। তবু বলি—যাব না—কিন্তু যেতে হয়।

ফিরে আসি গভীর রাত্রে, কালহরণ করে মৃত্যুকে আজকের মতো হটিয়ে দিয়েছি।

একটু এগিয়ে রমেশদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আজ কোথায় যাবেন ?

আমি জবাব দিয়েছিলাম—জানিনে।

একটু ধৈর্য ধরুন, চিন্তা করে স্থির করুন, সারারাত তো এ ভাবে ঘোরা যাবে না।

তাও জানি, এও জানি এই বাঙ্লা এবং বাঙ্লা দেশের বাইরে, এক প্রান্তে আসাম অন্য প্রান্তে পাঞ্জাব, কোথায় না একটি করে প্রদীপ জ্বালান আমার জন্য। পাঞ্জাবে সেজো জামাতা গোপাল, আসামে সেজো মেয়ে গীতা—রয়েছে গুণমুগ্ধ দরদী পাঠক-পাঠিকা, কেউ আমার রচনা পড়ছে, কেউ বা ব্যাকুল হয়ে লিখছে

চিঠি, আবার কেউ হয়ত আমার সঙ্কটময় মুহূর্তগুলো নিয়ে রচনা করছে সংবাদ, সাহিত্যিক গুরুতর অসুস্থ—সাহায্য চাই।

আমি বিশ্বাস করি আমার তিনটি বিবাহিতা মেয়ে, হেনা ছায়া গীতাই শুধু দূরে বসে আমার জন্য ব্যাকুল নয়, গিয়ে উঁকি মেরে দেখ অধ্যাপক দীলিপ গুপ্ত এখনো "অমরেন্দ্র ঘোষ তহবিল"-এর জন্য ভাবছে, মাকালপুর থেকে ঘন ঘন চিঠি লিখছে ভবানী সিংহ রায়, রানাঘাটে এক নিঃস্ব অপরিচিত বন্ধু অরবিন্দ ঘোষ হয়ত বস্ত্র কালেকসন্ করছেন রাত জেগে।

হিসাবের খাতা রেখে দীলিপ হয়ত এবার সাংঘটনিক চিঠি লিখছে, পছন্দ হচ্ছে না—আবার লিখছে, ডাইরী খুলে হয়ত টুকে রাখছে কোথায় কোথায় টেলিফোনে হাত পাতবে আমার জন্য আগামী কাল।

সাহিত্যাগ্রজ পবিত্রদা, রমেশ সেনও ঘুমিয়ে নেই, নারায়ণ (গঙ্গোপাধ্যায়) তো চিরজাগ্রত, মৌনী বুদ্ধদেবেরও ধ্যান ভেঙেছে—সাড়া দিয়েছেন মাইকেলের দুঃখে যেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নইলে অসুখের কথা শোনামাত্র কি কেউ অতগুলো টাকা বের করে দেন! স্বাধীনতায় হয়ত নাইট ডিউটি দিচ্ছেন সরোজ দত্ত, অরুণ রায়, "অমরেন্দ্র ঘোষ পীড়িত," মনে করো বুড়ো মুজাফফর আমেদও কি ঘুমন্ত? একদিন তিনিই তো বলেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষের মেয়ের বিয়েতে এসে বড় লাভ হল, অমরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ। আনন্দবাজারও সুপ্ত নয়, সেখানেও আমার জন্য একটি ঘিয়ের বাতি জ্বালা। প্রমাণের অভাব নেই, যুগান্তরের বুকেও রয়েছে আমার জন্য, একটি সার্বজনীন আহা!

ধুঁকতে ধুঁকতে কত মুখই যে মনে পড়ে! লিখে এঁকে সবগুলো যদি তোমাদের দেখান যেত! বুকে হাত দিয়ে দেখ কত অসংখ্য চোখ জাগরূক, জামির লেনে মাননীয় বান্ধবী শৈলজা চৌধুরানী, বেহালায় চিত্র-শিল্পী বীরেন ঠাকুরতার মা, ঢাকুরিয়ায় মেয়ে ছায়া,

জামাতা সন্তোষ। আত্মীয়-অনাত্মীয়ের অভাব নেই, এবার বন্ধু নন্দগোপাল সেনগুপ্তই অসুস্থ শুনে এসেছিল প্রথম, তারপর দেখে গেলেন গুরুস্থানীয় কবিশেখর কালিদাস রায়, আর কত বলব! ওঁ মধু, ওঁ মধু, আমাকে শুধু ভাবতে দাও, নোয়াতে দাও মাথা, স্মরণ করতে দাও যত মাধুর্য।

রমেশদা ফের প্রশ্ন করেন—কোথায় যাবেন বলুন?

আমি বলি—অনেক প্রদীপ জ্বালা, বেহালা-বালিগঞ্জ আসাম-পাঞ্জাব যেখানে খুশি!

রমেশদা হয়ত হাসেন, বড় মেয়ের বাড়ির বাস্ এসে পড়ে, আজ নিশ্চয় স্মরণ করেছে হেনা, রমেশদা উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, রাত দুটো ওখানেই কাটিয়ে দিয়ে আসি।

একটা গলা শুনলাম যেন বড় জামাই অনিলের—এদিকে আসুন!

হয়ত ভুল, এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই ফিরতে পারে না সে যাযাবর পাখী।

নাৎসী ক্যাম্প থেকে এই ভাবেই আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সমবেদনায় রাতের পর রাত মুক্ত হয়ে ফিরে এসে কলম ধরেছি!

মৃত্যুকে যে কতভাবে ঠকিয়েছি আমি!

১২।২।৫৮ বৈকাল ৪-৬টা

সেই শাদা ঘোড়াটার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লাম, পথে বালির জাজিম তাই রক্ষে, তীরের মত ছুটে পালাচ্ছে ঘোড়াটা, লক্ষ্য করলাম আমাকে ফেলে দিয়েও জানোয়ারটার যেন ভয় কাটেনি, অথচ ভয়-পাওয়া উচিত ছিল আমার।

যে বশ্যতা মানতে চায় না, তাকে মানাতে হবে বশ। টাটকা রক্ত তরতর করতে লাগল বুকের ভিতর, এমন বয়স নয় যে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবব, হাত পা ভাঙার ঝুঁকি মনের কোণেও

উঁকি মারেনি, এখন হলে বলতাম—ওরে সর্বনাশ, এমন দস্যুপনা করতে নেই, কিছুতেই আজ প্রৌঢ় অমরেন্দ্রকে সে কিশোর বোঝাতে পারত না—এখানে সর্বনাশ কোথায়, দস্যুপনাই বা কই, শুধু বশে আনতে চাইছি ধাবমান সুযোগটাকে।

একদিন আবার সুযোগটাকে পাকড়াও করলাম। লাগাম নেই, দড়ির ফাঁসে মুখ বাঁধা, গদির বদলে তেল তেলে পিঠ, কানা চোখটা করতোয়ার খাড়ি পাড়ের দিকে, উদ্দাম আবেগে ছুটে চলেছে ঘোড়া। আমি জয়ের আনন্দে মত্ত।

আজ মনে হয় নিয়তির পিঠে অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছি, সর্বনাশা খাড়ি, ভাঙ্গা কূল কোনো দিকে দৃকপাত নেই—ছুটছি শুধু ছুটছি।

১৩।২।৫৮ দিবা ১টা

আমাকে এনে ফেলল ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে।

বিশ্বাস করতে পারছ না? কোথায় ধুনোটের অশ্ব ক্ষুরে ধুলো বালি, এযে ঝকঝকে তকতকে মসৃণ মেজে! এখানে মানুষের নাম নেই—নম্বর। স্বাস্থ্য নেই, ঘুণে ধরা কাঠামো। তাই বেড়ে বেড়ে চিন্তা গ্লানি, ওষুধে-ডাক্তারে-নার্সে-সিস্টারে এ এক নতুন জগৎ।

কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম—ভাল হলে ভালই, নইলে মর্গ পর্যন্ত আমার পরিচয় ষোল নম্বর। একটা কেমন যেন কষ্ট হল!

১৭।৩।৫৮ বৈকাল ৫-৬টা

অনেক দিন লেখা বাদ গেছে, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ, হাসপাতালে কড়া ডিসিপ্লিন।

সেখানে বসে কি মন খুলে লেখা যায়! আর লিখব কি! শ্বাসে-কাশে জ্বরে অনিদ্রায় বায়ু ক্ষিপ্ত। যেন পাগলা কুকুর হাঁপাচ্ছে, সুমুখে পড়লে আর রক্ষা নেই! খাবলা খাবলা খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু ভেবে দেখলাম মাথাটা আমার ঠিকই আছে, কাশি এবং হাঁপানির ঝাঁকুনিতে সব অঙ্গের যেন জোড়া খুলে গেছে, শুধু ঠিক আছে মাথাটা, কলম ধরলে এখনো লেখা সম্ভব, সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এত উদ্বেগের মধ্যেও সান্ত্বনা পেলাম, কারণ এখনও অনেক ফর্মা জবানবন্দী লেখা বাকি।

মাঝে মাঝে স্পিরিট ক্লোরাফর্ম, আরও কত রকমারী ওষুধের গন্ধ যে নাকে ভেসে আসছে! সুমুখের বেডের অপরিচিত মুখ-গুলোর দিকে তাকাচ্ছি বোকা বোকা চোখ মেলে, নার্স-ডাক্তার-স্টাফ পর্যায়ক্রমে আসছেন আমার কাছে।

অবশেষে এত পরিশ্রম করে, এতগুলো উপন্যাস লিখে যা হয়নি, এবার তা হল, আমার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলেন হাউস সার্জন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। জীবন প্রেমে যেখানে বাঙময় সে পথে সার্জনের আনাগোনা নয়, জীবন আশা আকাঙ্ক্ষায় যেখানে কম্পমান সে পথেও তিনি পরিক্রমা করলেন না। মরণ এলো কোন পথে—কালো কফিনে ঢাকা মৃত্যু? রন্ধ্রে রন্ধ্রে ডাক্তার জীবন সঞ্চার করলেন, মৃত্যুর পথে পথে দেবেন মানুষের সাধ্যায়ত্ত বাঁধ। মাপা কথা মাপা জিজ্ঞাসা—এ এক অভিনব মানুষ!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ডক্টর আপনি কি যন্ত্র?—মেসিন?

ডাক্তার প্রাণ খুলে খানিকটা হাসলেন—কেন?

বুঝলাম টেথিস্‌কোপ এবং জামার নিচে রয়েছে একটা হৃদপিণ্ড। মুখের হাসির সঙ্গে ওখানে নিশ্চয় ছল ছল করছে রক্ত—যে রক্তে অহর্নিশি দয়া মায়ার কোষগুলি থাকে সঞ্জীবিত!

আমি মনে মনে বললাম, নমস্কার বন্ধু।

১৮।৩।৫৮ বৈকাল ৫-৬টা

ডাক্তার চলে গেলেন, নার্স এবং স্টাফরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ইউরিন-ব্লাড-স্টুলের ফর্দ নিয়ে, ঝামেলার কি অন্ত আছে! নিঃশ্বাস

ফেলার কি সময় আছে ওঁদের! এক এক রোগীর এক এক নির্ঘণ্ট।

এসব দেখে শুনে আমার সারা শরীর যেন রি-রি করে ওঠে, বমি আসবে বুঝি! ওয়াক থু, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভিতর কেবলই কি ইউরিন আর স্টুল?

আমার বাঁ পাশের ঘরের কোণার সতের নম্বর বেডটা খালি। ডান পাশে কে আছে তা এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করিনি, চার নম্বর কাছে এসে বললে, খুব কি কষ্ট হচ্ছে? চিন্তা করবেন না, সব ভাল হয়ে যাবে, ডাক্তার রাউণ্ডে এলে সব খুলে বলবেন।

আমি একটু হাসি, এমন তরল বিশ্বাস ও-বয়সে আমারও ছিল, এঁরা আর যাই হন, কেউ যে ধন্বন্তরি নন, তা অন্তত জানি।

এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিন। ডিরেক্টর আর. এন. চৌধুরীর আপনি রোগী—চিন্তা কি?

আবার হাসি! হ্যাঁ একেবারে নিশ্চিন্ত হতেই এসেছি।

গোটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব চুপচাপ। চার নম্বর ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়ে শুয়ে পড়েছে নিজের বেডে। স্টাফ নার্স অনেকটা দুরু দুরু বুকে এ্যাটেন্‌সন।

কি হল আবার?

চির নিশ্চিন্ত হতে একটি কিশোর বন্ধু আসছে ট্রেচারের সিংহাসনে চড়ে, সঙ্গে স্বয়ং ডিরেক্টর এবং ছোট বড় প্রায় সমস্ত স্টাফ-ডাক্তার-নার্স-সিস্টার।

আমার পাশের বেডে কোণর দিকে কঙ্কাল মূর্তিকে শোয়ান হল। স্থির বিস্ফারিত দুটো চোখ। তবু শিরা ফুটো করে রক্ত দেওয়া হচ্ছে বিন্দু বিন্দু। স্ট্যাণ্ডে রক্তের বোতল! শিরায় সুতীক্ষ্ণ নিডেল্। যন্ত্রণার কোনও অভিব্যক্তি নেই মুখে চোখে।

১৯।৩।৫৮ বিকাল ৩-৬টা

ভাবলাম বন্ধু আমার চাইতে অনেক বেশি সাধনার মার্গে

পৌঁছে গেছে। মৃত্যু তার কাছে পায়ের ভৃত্য। ঝিল্লিতে ঝিল্লিতে অনুভূতি যন্ত্রণা সে অনেক দূরে ফেলে চলে এসেছে।

বালিশ টেনে শক্ত ঘাড়টা শুইয়ে দেওয়া হল।

—আঃ!

ওকি শব্দ? ওকি অনুভূতি! ঐ সামান্য শব্দে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন চমকে উঠল। এমন যে ডিরেকটর তিনিও যেন সন্ত্রস্ত। কি যেন ভুল হচ্ছে! কি যেন ত্রুটি হল! কিন্তু ঘোড়া টেপা হয়ে গেছে মানবীক সাধ্যের, আর সংশোধনের সময় নেই। আঃ—আর ফিরে যাবে না। কিশোর আর কিছুতেই গলাধঃকরণ করতে পারবে না মর্মঘাতী উচ্চারণ। একি সমুদ্র মন্থনের চাইতেও উগ্র হলাহল? না ধিক্কার দিলে মানুষের অহং সংকল্পকে?

এরপর অনেক ইনজেকশন দেওয়া হল। টেম্পারেচার নেওয়া হল বারবার। নাড়ী এবং হার্টের বিটও দেখা হল পর্যায়ক্রমে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে লাল পর্দা এলো।

বুঝলাম এই শেষ সিগন্যাল।

বন্ধুর চোখে কিন্তু নালিশ কিংবা প্রশ্ন নেই। পর্দা ঢাকার আগে ভাল করেই দেখলাম। তবে কি আঃ শব্দটা মিথ্যা? ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে ফেললাম। হয়ত তখন কোন শব্দই শুনি-নি।

সন্ধ্যা হল। বাতি জ্বলল সমস্ত ওয়ার্ডে। ডাক্তার এলো, ওয়ার্ড বয় যথা নিয়মে আজ্ঞা পালন করলে। খাবার গাড়ি এলো যেমন রোজ ছ'টার পর আসে। যারা উঠে যাবার তারা উঠে খাবার টেবিলে গেল একে একে। কিন্তু ওয়ার্ডটা যেন ভারি ভারি থমথমে। রেডিওটা তাই হয়ত বন্ধ। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না যেন মন খুলে।

আমার আজ দুধ রুটি বরাদ্দ। ক্ষিধে নেই একেবারে, তাই চুপ চাপ বসে। কিন্তু কতক্ষণ আর এ ভাবে থাকব? হাঁপানি উঠছে বেদম।

মনে হচ্ছে কিশোরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি। পর্দার ফাঁক দিয়েও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তার শ্বাস টানার কাঁপুনি।

ষোল বছরের সঙ্গে একান্ন বছরের প্রতিযোগিতা। পারলাম না, পারা গেল না। হাঁপানির ওপর যেন হাঁপিয়ে উঠলাম, ছুটলাম তো অনেক!

ডাক্তার বললেন—এক্সপায়ার্ড।

চেয়ে দেখলাম আর সে চোখের চাহনি নেই—চাদর ঢাকা সতের নম্বর। এখন শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লেখা বাকি। তারপর হয়ত মর্গ। বন্ধু নেই, শুধু সাদা চাদরের মোড়ক।

একটু বাদেই লোহার খাটখানা সমেত লাস বারান্দায় নেয়া হল। একেবারে আমার চোখের সোজাসুজি। সারা রাত অমনি থাকবে, সকাল নাগাত যা কিছু হবে নতুন ব্যবস্থা।

ইন্‌সোমনিয়ার স্ট্রোক আসছে আবার, সারারাত, চোখ আর বোজার উপায় নেই, খুললেই লাস—সতের নম্বর। একটা ভয়, একটা আতঙ্ক। চাদর মোড়া মানুষটার জন্য যেন কোন সমবেদনা নেই এখন। বিস্ময়ের বিষয়—কতটুকুই বা দূরে গেছে! এর মধ্যে এত পর হয়ে গেল?

স্টাফকে ডেকে বলি—ওখানে ওভাবে রাখলেন কেন? আমার বেডের পাশেই না হয় শুইয়ে দিন।

ব্যঙ্গটা বুঝলেন স্টাফ, দরজা বন্ধ করে সতের নম্বরকে আর একটু আড়ালে ঠেলে দিতে হুকুম করলেন ওয়ার্ড বয় ও জমাদারকে।

২৩।৩।৫৮ সকাল ৬-৯টা

আমার জীবনের আর একটা অভিশাপ ডান হাতের কবজিতে রাইটার্স ক্র্যাম্প। কলম ধরলে কবজি বেঁকে যায়। ভাব এলেই প্রতিবন্ধক—কিছুতেই নিবটা আয়ত্তে রাখতে পারিনে। তখন কি অবস্থায় যে সময় কাটাই! বয়স হয়েছে, ঘর বোঝাই ছেলে মেয়ে পরিজন, তাই হয়ত চোখের জলটা পড়া বাকি থাকে। রেবা এবং

অশোক দেখলে প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে তুলবে। হয়ত সব বুঝলে ওরাই কাঁদবে। সেইজন্যই নিজেকে সামলাই। আর একজনও এ কান্নার অংশীদার আছেন। তাঁর কথা আর না-ই বা তুললাম। তিনি কাঁদলে শ্রাবণের বন্যাও বুঝি হার মানত।

কদিন ধরে সেই ক্র্যাম্পস-এ ভুগছি। কিছুতেই এগুতে পারছিনে লেখা, তবু কাগজ কলম একেবারে ছেড়ে উঠতে পারছিনে বারবার সংকল্প গ্রহণ করছি। সংগ্রাম আমাকে করতেই হবে। আমরণ এই তো আমার তপস্যা।

এমনি তপস্যা করতে দেখেছি রৌদ্র দগ্ধ মাঠে কৃষাণকে, এমনি তপস্যা করতে দেখেছি গৃহ কোণে স্ত্রীকে। এমনি তপস্যা করে হাঁস পায়রা ডিম ফোটায়। দশ মাস দশদিন গর্ভ ধারণ তবে তো সন্তান।

চোখের জল ফেলিনি। আমি বসে রয়েছি অপেক্ষার অঞ্জলি পেতে।

আজ কলমটা একটু বাগে এসেছে। এক একটি অক্ষর প্রসব করছে ধীরে ধীরে। আমি আনন্দে থর থর করে কাঁপছি। নারী নই, কিন্তু পাচ্ছি যেন জননীর মর্মান্তিক অনুভূতি।

তাই আবার মনে পড়ছে সতের নম্বরকে। আহা! একা শুয়ে আছে উত্তরখোলা হিমেল বারান্দায়। ও-ও তো এই ধরণীর ধুলোরই ছেলে।

রাত নটা বাজতে না বাজতে সব আলোগুলো নিভে গেল। একি? এত অন্ধকারে কি আমি বাঁচব?

দুটি শাদা প্রজাপতির পাখার মত নার্স ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের লঘু পদসঞ্চারেও নেই এতটুকু শব্দ। মুখে তাদের নিঃশব্দ বাণী যেন মরফিয়া মাখানো—ঘুম-ঘুম ঘুমোও আর্ত রুগ্ন।

আমি আঁতকে উঠি, বলতে গেলে আমার কাছে এ তো সন্ধ্যা রাত্তির। এমনি সময়তো সেদিনও প্রণয় এবং ঊষাকে গিয়ে

জ্বালিয়েছি। শেষ কথাটা লেখা ঠিক হল না। যদি কখনও উষা এ জবানবন্দী পড়ে—দুঃখ পাবে। জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি কখনও জ্বালাবার কথা মনে মনেও ভেবেছি?

পৌঁছা মাত্র খাবার থালা ঠেলে মজলিসি বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে উষা। প্রণয় ছুটেছে চা আনতে দোকানে। আমি এবং পঙ্কজিনী গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছি বিছানায়। বলে বোঝান যাবে না বন্ধু-বান্ধবীর এ আশ্রয় এই শীতের রাত্রে যে কত বড় নির্ভর।

গল্প জানে বটে উষা! উপন্যাসের নায়িকা হওয়ারই যোগ্যা। প্রণয় মিতবাক, কিন্তু অমিত বুদ্ধি শিকারী। বুঝে বুঝে ঠিক ফাঁসটি পরিয়েছে গলায়। সে দিন বুঝলাম, প্রণয়ের জীবন থেকে গল্প ফুরাবার নয়। ঘণ্টা তিনেক অনায়াসে কেটে গেল। বেরিয়ে আসবার সময় মনে মনে আশীর্বাদ করি—তোমাদের মনের পাত্রটি চিরদিন এমনি পূর্ণ থাক।

॥ নয় ॥

হাসপাতালের সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে হেঁটে বেড়াব আমি। উঠে দাঁড়াই বেতের লাঠিটা নিয়ে।—না—না এই ইনসোমনিয়ায় বসে থাকা যাবে না। তা ছাড়া আমি শয্যাশায়ী রোগী নই। একি জেলখানা?

উঠতে গিয়ে দেখি পায়ে বেড়ি।

একটি নার্স টর্চ জ্বালায়। আমাদের খাটের সঙ্গে একখানা কার্ড ঝুলছে। লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা "বেড কেস" অর্থাৎ কিনা বিছানা ছেড়ে নড়তে পারব না আমি। শোয়া বসা এমন কি বেডপ্যান ওখানেই। কিন্তু অপান বায়ু যে হৃদপিণ্ডে গুঁতো মারছে! চুপচাপ বেডে বসে থাকা অসম্ভব।

এবার একে একে হিতৈষী বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। সত্যেন সরকারের কথাই মনে আসে আগে। সে-ই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। আমার হয়ে এমন সুপারিশ সংগ্রহ করছে, যার সন্ধান অব্যর্থ। পরিণামে এই বেড কেস।

সত্যেন এই জন্যই কি তোমাকে 'কনকপুরের কবি' উৎসর্গ করেছিলাম? এত শ্রদ্ধা ও প্রীতির এই কি জবাব?

মনে পড়ে বছর তিনেক আগের কথা। তখন বোধহয় 'একটি স্মরণীয় রাত্রি' উপন্যাসখানা লিখছি। তখন তুমি নিত্য রাত্রে আমাকে সামলাতে আসতে। এমনি শীতের রাত্তির, এমনি কুয়াশা, এমনি স্ট্রোক। আর ছিলেন রমেশদা। মনে পড়ে রাত এগারটা বারোটা কোন দিন একটা?

হয়ত ভুলে গেছ একদিন এক সভায় পৌরোহিত্য করতে যাবো কলকাতার বাইরে, ধার দিলে নতুন স্যাণ্ডাল জোড়া। কাপড় জামা জাবিন হয়ে কিনে বরটি সাজিয়ে দিলে আমায়। সে টাকা তোমার আজো উসুল হয়নি। এখন আর কোনো আশাই রইল না। নিজের দোষে নিজে দিলে দণ্ড, আমি আর করব কি?

তুমি হয়তো জানো না—খানিকটা নায়ক হয়ে মিশে গেছ এই উপন্যাসে। পাছে কখনো ভুলে যাই জীবনের উপল বন্ধুর সংঘাতে, তাই সেদিন তোমায় স্মরণীয় করেছিলাম, তার কি এই প্রতিদান?

জানি তোমার আসমুদ্র হিমাচল পরিচিতি—শুধু সাহিত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে কত বেকার বিধ্বস্তকে জুটিয়ে দিয়েছ চাকরি, কারুর বা ডিগ্রী রুখেছ কোর্টে গিয়ে যা ঝুলছিল ফাঁসের দড়ির মত, দিয়েছ আশ্রয়হীনকে আশ্রয়ের সন্ধান, জ্ঞানপিপাসু দুঃস্থ ছাত্রকে দুটো ভাল টিউশনি। মৃত বন্ধুকে তুমি আজও অমর করে রেখেছ স্মৃতি তর্পণে। সুধীরলালের স্মৃতি বার্ষিক উদ্‌যাপন তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি! কত গায়ক গুণীজনের সমাবেশ।

তুমি কিন্তু অন্তরালে। আমার চোখে গুণীর চেয়েও গুণী। ধন্য মনে করি তোমার বন্ধুত্ব। ধন্য মনে করি তোমার সান্নিধ্য। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। কিন্তু কেন এ নিষ্ঠুরতা, আমার প্রতি অবিচার আজ!

ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী তোমার বিরুদ্ধেও নালিশ আছে। বন্ধু বলে আজ আর রেহাই দেব না। আমি তো তোমার কাছে এ ভাবে পরমায়ু ভিক্ষা চাই-নি। তুমি নিজেকে অক্ষমের মুখোস পরিয়ে, আমার মনে নৈরাশ্য জাগিয়ে কেন এখানে ভর্তি হওয়ার প্রেরণা জোগালে?—একটা থরো ইনভেস্টিগেশন চাই, নইলে আর পারছিনে অমরবাবু।

কেন, লাক্ষ্যণিক চিকিৎসায় তুমি কি প্রতিভার পরিচয় দাও-নি? যদি মরতেই হয়, তোমার হাতেই তো আমার মৃত্যু ছিল কাম্য।

আচ্ছা এত দুঃখ এত কষ্ট তবু আত্মহত্যা করিনি কেন এতদিন? আর কিছু না পেলেও সামান্য একগাছা দড়ি—ব্যস খতম! যত যন্ত্রণার শেষ? একদিন সত্যই ছুটে গিয়েছিলাম ডাঃ বন্ধু তোমার পরামর্শ নিতে জামির লেনে।

সস্ত্রীক তুমি বলেছিলে, আপনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিনই কি, অলিখিত হিউম্যান সংবিধান স্বীকার করে নেন-নি, যে আমি বাঁচব এবং অপরকে বাঁচাব?

এমন সহজ পথটায়ও কাঁটা দিয়েছিলে! তোমরা স্বামী স্ত্রীতে নিশ্চয় একটা পরামর্শ করেছ। দেখছি সমস্তই যোগসাজশ!

একদিন তোমরাই আমাকে কুড়িয়ে এনেছিলে। দাঁড়াও পাঠকের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দি। ভেবেছ গল্পকার বড় নিরীহ ভাল মানুষ, দাঁতে বিষ নেই মোটে? কিন্তু আমার কাছে রয়েছে তোমাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের পাণ্ডুলিপি। একেবারে নির্ভুল অঙ্ক।

কপিরাইট

বড্ড মুস্কিলে পড়লাম। গল্পটা মনের ওপর ভাসছে। টলটল করছে যেন তার রস, সংবেদনে যে কি অপূর্ব অনুভূতি জাগিয়েছিল তখন?

লোভে কাগজ কলম নিয়ে বসেছি কিন্তু লিখতে পারছি নে। কারণ নীতিগত ভাবে কপি-রাইট আমার নেই। এ সংরক্ষিত অঞ্চলে আমার অণুপ্রবেশ নাকি নিষিদ্ধ।

যাঁর গল্প, তিনি বঞ্চনা করেননি। ডাক্তার বন্ধু বলেই খালাস। কিন্তু তাঁর মহীয়সী স্ত্রী হঠাৎ আজ বললেন, এ গল্পটার কপি-রাইট কিন্তু রিজার্ভড।

আমি গল্পকার নই, শিল্পীও ঠিক আমাকে বলা চলে না। বললে বলতে হয় সাহিত্যের শ্রমিক। রোদে জলে টো টো করে ঘুরে বেড়াই, কখনো শীতে কখনো গ্রীষ্মে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি ফুটপাথে নয়ত—পার্কে যদি একটা গল্প পাই! কেন, ট্রামে বাসে আপনাদের মুখের দিকে যখন চেয়ে থাকি, আমার আর্তি কি বুঝতে পারেন না? একটু আনমনা ভাব, একটু ভেঙ্গেপড়া ভঙ্গি, একটু বিড়ম্বনা—এই কুড়িয়েই পাঁচ ফুলের সাজি। তার সঙ্গে দৈন্য দুঃখের গভীর নিকষ আলপনা, সবই আপনারা জানেন, বিশেষ করে মেয়েরা তাই তো হঠাৎ অসম্বৃত অবস্থায়ও আমায় ক্ষমা করেন, নিক না চোখের তুলি বুলিয়ে একটু, এই তো বেচারীর উপজীবিকা।

আসল গল্পটা যখন বলাই যাবে না, তখন ভূমিকাটাই বলি। দুধে আমার অধিকার নেই, কিন্তু চুপি চুপি বলি, সর তুলে এনেছি, একটু কি চেখে দেখবেন?

বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি? আমি নগণ্য হলেও হীনমন্য নই। শ্রমিক হলেও আজ পর্যন্ত কাউকে ঘোল খাওয়াতে সাহস পাইনি।

নিশ্চিন্ত চিত্তে আর একটু এগিয়ে আসুন—আরও একটু, কয়েকটা বছরের থাক পেরিয়ে।

কি দেখছেন ?

একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা। প্রকাণ্ড একটা ছাদের এক কোণে একটি বাল্‌ব মরমে মরে যেন জ্বলছে, একটু ভাল করে দেখুন, এখন দুলছে হাওয়ায় ! এবার লজ্জায় বুঝি নিববে। কেন যে তারে তারে যোগ করে এত কুণ্ঠা দিতে ওকে আনা হয়েছে এখানে ?

এবার নিশ্চয় চোখ সওয়া হয়ে গেছে এই পরিবেশটা। নিচে মানচিত্রের মত একটা শতরঞ্জি। ঘন নীলচে আঁধারগুলো যেন তার সমুদ্র চিহ্ন। বাকিটা দেশ, মহাদেশে মানুষে ঠাসা। এক এক প্রান্তে অরণ্য ভূমি, অন্য প্রান্তে কি গোবী সাহারা ? কতটা কুঁচকে দুমড়ে অতি পরিচিত হিমালয়ও সৃষ্টি হয়েছে। নদী নেই, কিন্তু রয়েছে কত যে কাঁচা পাকা বয়সের ফল্গুধারা।

শখের এবং নেশার, কারুর কারুর বা জীবিকার গরজে সপ্তাহান্তে এখানে হাজির হওয়া চাই-ই চাই। তখন মাস্টারের মনে থাকে না অঙ্ক এবং বেত, কেরাণীরা ভুলে যায় দাঁত খিঁচুনি মার্কা ফাইল, বেকার ছেলে-মেয়ে রবিবাসরীয় ভেকেন্সির কলম। পর্বত চূড়ায় চূড়ায় আজ ক-টি দেবী শাড়ি ছড়িয়ে ব'সে। তাঁদের মধ্যে একটি সাজেও নয়, বয়সেও ঠিক বলা উচিত হবে না—ভাব দ্যোতনায় যেন মহীয়সী। সুন্দরী বলে কেউ ভ্রম করবে না।—না রঙে, না তিল তিল বিচারে। কিন্তু চোখও ফেরান যায় না—এই আশ্চর্য।

এবার নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা দাবী করবেন ! মনে মনে হাসছেনও সাধে নিজের মুখে স্বীকার করে সাহিত্যের মুটে ! এ বিনয় নয়, সত্য কথা উথলে ওঠে চোঁয়া ঢেকুরের মত, যাঁর অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য নেই, নখে নেই নেইল পালিশ, ঠোঁটে নেই লিপস্টিক, তাঁর রূপ এল কোত্থেকে ? তবে কি তিনি চোখ সর্বস্ব ?

জানি নে, তবে ব্যাখ্যা দিয়ে ভাবের পোস্টমর্টেমই শুধু হতে পারে, ধরা পড়ে না ব্যঞ্জনা।

চোখ, চোখই তো সব। হাসে, কথা কয়, মহিমায় চেয়ে থাকে, আমি বলি চোখই তো জীবন। কল্পনা করুন প্রথম প্রেম, শুভদৃষ্টি তারপর শোকে দুঃখে জেগে রয়েছে প্রদীপের মত শিয়রে। সেই চোখ নিবলে?

টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, হয়ত ডুবে যেতাম অতলে। এই চোখই তাঁর হৃদয়কে বলেছিল তুলে ধরো—হুকুম করো হাত দুটোকে। হুকুমের যেন অপেক্ষা না রেখেই এগিয়ে এসেছিল হাত দুখানা।

বলা হল না, বলতে পারলাম না, ভাষায় উপমায় কুলাচ্ছে না—দুর্দিনের ঝড়ে অন্ধকারে নদীর পাড় ভাঙতে দেখেননি কখনো? আমি একটা শীর্ণ বিবর্ণ গাছের মত ধুকছিলাম। দিন গণছিলাম হয়ত অসহায় চোখ মেলে।

চার চোখে দেখা। এবার সেই চোখ দুটির আর এক রূপ। বললেন, একদিন সময় করে আমাদের বাড়ি চলুন না? এই ঠিকানা —দেওদার স্ট্রীট।

বিস্মিত হলাম। এবার খুঁটিয়ে দেখলাম, ওঁতে এবং আমাতে আসমান জমিন ব্যবধান—পায়ের জুতোর জরির কল্কা থেকে সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত।

কি বলব? টক্কর খাওয়া মানুষ, হাঁপাচ্ছিলাম।

কিন্তু পরের কথা আগে বলা তো রীতি নয়—স্টাইলে ভুল করলাম নাকি? আপনাদের চিরাচরিত গল্পের কন্‌ভেন্‌সনে ঘা লাগল বুঝি? এবারটি ক্ষমা করুন।

কত আজে বাজে কথা, কত ছেলে মেয়ের যে আমরা বে শাদি দেই সাহিত্য সভায়! সভাপতি হলে তো কথাই নেই, একেবারে নিরঙ্কুশ।

আজ আমি সেই ভাগ্যের অধিকারী। গোপনে বলি, দাদাদের অনেক তোয়াজ করে, হঠাৎ আজ শিকে ছিঁড়েছে।

এই চুপ, চুপ—নবাগতরা অনুগ্রহ করে বসুন, কবিতা আবৃত্তি করছেন উনি—

যত আমি বলি তত কিন্তু নড়িনে। জানি পাশেই সমুদ্র!

ছাদের জ্যোতিষ্ক হয়েছি আজ, শতরঞ্চির মানচিত্রে চিতাবাঘ নখে দাঁতে তছনছ করে দেব নতুন কাউকে পেলে সমালোচনা প্রসঙ্গে। নারী শাড়ি গয়না দেখে কিছু রেহাই দিতে হবে, দাদাদের নির্দেশ। বয়স বুঝে টোন্। এ চিৎ-বিন্তি মনে মনে সর্বত্রই খেলে। আমি না মানলে, আজই যে আমার আয়ু শেষ।

খুব নিজেকে ধ্যানমগ্ন করে রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু টুটা বুক, ফুটা পাঁজর পরম বেইমানি করে। বেদম কাশি। কাশির পর কাশি।

উচিৎ হচ্ছে আমাকে সসম্মানে বরখাস্ত করা। একেবারে বিষিয়ে দিলাম রবিবারের তপ্ত হাওয়া। কিন্তু এঁরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল। বলেন কিনা আজকার সভাপতি, এ্যাজমারও অধিপতি। অতএব দুপক্ষকে সামলাতে হচ্ছে। জানেনেই তো দু-নৌকায় পা দেওয়ার কি জ্বালা।

কাশি, আর হাসি। মনে মনে ভাবি, এইতো জীবন রসায়ন! এই জন্যেই বুঝি ক্যালেণ্ডারের সপ্তাহান্তিক দিনটির এত মূল্য! আমাদের উজ্জয়িনী চিরায়ু হোক।

গলা শুনে চমকে উঠি। অনেক দিন তো এমন আবৃত্তি শুনিনি —এ বয়সে কণ্ঠ এত সুরেলা! সেদিনের সভা সেই কবিতাটিতেই ভরে থাকে। সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিতান্ত ঈশ্বর প্রসন্ন সেদিন, তাই নষ্টামি ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে হয় না কাউকে।

আমি কি বললাম তার খুঁটিনাটি আজ মনে নেই। কিন্তু একটা ঝংকার বেজে আছে মধুর। একটু স্মৃতির গহনে নামলেই

শুনতে পাই। একথা বলা-কওয়া-লেখা আমার উচিত নয়—মনে হচ্ছে বড্ড পার্সোন্যাল। কিন্তু সেফ্‌টিভাল্‌বটি আমার হাতে। মহিলার অনুমতি নিয়েই হুকুমজারি করেছেন তাঁর মহাশয় গত কাল রাত্রে।—কপিরাইট যখন পেলেন না, তখন এই নিয়েই গল্প লিখুন।

আর এগোব কি? শুনতে কি তেমন ভাল লাগছে?

ভাল লাগা মনের রঙ, ভালবাসা তাও। পাখির কিচির-মিচির, মেঘের ডাক তার কি কোনো অর্থ হয়? যদি সারা রাতে চাঁদের আলোতে বসে কারুর হাতে হাত রেখে, বুকে বুক ঠেকিয়ে কথা বলে দেখতেন, তখন না বুঝলেও, পরে বুঝতেন, যে সব কথারই অর্থ হয় না। তবু লোকে বলে—তবু লোকে শোনে। এ চিরন্তন ট্রাজেডির হাত থেকে মানুষের রেহাই নেই।

এবার বাল্‌ব নিবে গেছে, শতরঞ্চি গুটিয়ে নিয়েছে। ভেঙে গেছে বহু ঈপ্সিত সভা। বাঘে মেষে তাড়াতাড়ি, ঠেলাঠেলি ছাতা জুতো নিয়ে। উঃ রাত দশটা, বাড়ি যেতে এগারোটা, খেতে শুতে বারোটা। গিন্নীর কিছু ফরমাশ ছিল, খোকার জন্য একগজ অয়েল ক্লথ—আমি তো প্রায় আসামী। শেষ রাত্তিরে বান ডাকবে, তখন জবাব দেব কি?

সে রবিবার অমনি কাটে, আরো গোটা পাঁচেক। আজ বোধ হয় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি নামছি সিঁড়ি বেয়ে। বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে আসি মহিলাকে তুলে দিতে—নমস্কার!—অতি কষ্টে হাত-জোড় করি শত্তুর বুকটাকে চেপে।

মহিলা আজ সঠিক জবাব চান, কবে যাচ্ছেন আমাদের বাড়ি।

আবার নোংরামি করতে চাইছে বুকটা, সঙ্গে সঙ্গে গলাটা। কোনো রকমে বলি, কাল বিকালে।

ঠিক তো?

মনে মনে খটকায় পড়ি, হঠাৎ এ অবিশ্বাস কেন? কোনো রকমেই তো ওঁর জানার কারণ নেই আমার ঘরোয়া কাহিনী। এমনি করেই তো আরো দুটি বড় হয়েছে। গিন্নীর বায়না একটা ফ্যাশন। বিশ বছর আগে তো লাগেনি।

দরজায় নেম-প্লেট—ক্যাপটেন···। দেখে চমকে যাই, তবে কি জাহাজী? মনে মনে মহিলা নিশ্চয় বাঙ্গালী মেম, আর নেটিভ সাহেব হচ্ছেন মহাশয়টি। এঁদের এখানে প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে না, কি করেই বা চাপব হাঁপানি? আই. এম. এস.—তিনটি অক্ষর তখন পর্যন্ত নজরে পড়েনি আমার।

ভাবছি ফিরে যাব নাকি? কড়া নাড়লাম। তারের যন্ত্রে যেন ঘা পড়ে। এক সঙ্গে বেজে ওঠে কড়ি ও কোমল।

ভিতরে আসুন।

বৈঠকখানায় ঢুকে যা দেখি, তা আমাদের ঘরে অবশ্য নেই। কিন্তু অনেক দেখেছি। কার্পেট, গালিচা, বই, মিনা-করা টেবিল। শেষেরটা জয়পুরী না বার্মিজ হয়ত তা বলতে পারব না। সব ছাপিয়ে নজরে পড়ে অদ্ভুত দুটি কালচে রঙের হাড়ের বক। মনে হয় মেয়ে পুরুষ—তনুর ভঙ্গিমায় পরিপূর্ণ শিকার সন্ধানী। অনবদ্য, নিখুঁত।

আলমারির শিয়রে নানা বাদ্য যন্ত্র। তবলা, তানপুরা, হারমোনিয়ম।

এখন বুঝি গলা কেন এত সুরেলা! কবিতা তো কারখানায় বসেও লেখা যায়।

কিন্তু ঘুঙুর কেন?

মুহূর্তে মনে হয়, একি জলসা ঘর?

অল্পে ভুল ভাঙে। মহাশয়টি ডাক্তার। হাসিতে অমৃত। চেহারায় অনঙ্গ কান্তি। একথা বাড়াবাড়ি নয়। এ বিষয়ে মিসেসটি খুব সচেতন। এই জন্যই কি নিমন্ত্রণের ভান?

না,—ঘুঙুরও বাজে না, তানপুরার তারেও ঝঙ্কার ওঠে না, তবলা থাকে নিস্তব্ধ। সময় এবং মেজাজ বুঝে এটা জলসা-ঘর হলেও আসলে ডাক্তারের চেম্বার।

আমি আপনার সম্বন্ধে সবই শুনেছি, কিছু মনে যদি না করেন তবে আপনার চিকিৎসা করতে চাই কিছুদিন। ওষুধ-পত্র আমার, আপনি শুধু অনুগ্রহ করে আসবেন।

মাথা যেন ঘুলিয়ে যেতে চায়। প্রতিটি অণু পরমাণু অসুস্থ। এর কি কোন চিকিৎসা আছে? ইনসোমনিয়া, হাঁপানি, কাশির সঙ্গে রক্ত, কোনটা বলব?

চুপ করে থাকি। একটু হাসি।

আমায় একটি বার ট্র্যায়েল দিতে দেওয়ায় আপত্তি আছে কি আপনার?

আমার তো দিন হিসেব করা। কেন পণ্ডশ্রম করবেন?

মহিলা বলেন, অনুগ্রহ করে আপত্তি তুলবেন না। চেষ্টা করায় দোষ কি?

আমি জবাব দেই, হাল ছেড়ে দিয়েছি, বিরক্ত হয়ে গেছি। আর সাধ নেই বাঁচার।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, রোগ সারবে কিনা জানিনে, আমি সাধ ফিরিয়ে আনব। বিজ্ঞান আর কিছু না এগোলেও এটুকু এগিয়েছে বিশ্বাস করুন।

তপ্ত গৌর বর্ণ। পরনে ঝকঝকে সাদা সার্ট ও প্যাণ্ট। পাশে মমতায় উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমানা এক নারী হৃদয়। আমি কোন কার্য কারণে এ উৎস সন্ধানে এলাম! জলসা-ঘর অনেক আগে মিলিয়ে গেছে, এবার চেম্বারও আমার চোখের সুমুখে নেই। আমি যেন হিমালয়ের চড়াই ভেঙে হাঁপাচ্ছি। মনে হয় যেন পেয়েছি—পেয়েছি! ধীরে ধীরে ফিরে আসি বাস্তবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে আছি। ডাক্তারবাবু বলেন, চৌবাচ্চা শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার ভর্তি করে দিতে হবে পাঁচ দশটা বছর। বয়সের হিসাবে গোঁজামিল দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। চিত্রগুপ্ত বুড়ো হয়েছেন।

চা সন্দেশ আসে। কেবল ছুঁয়ে সেদিন উঠি। জোরে জোরে হাঁটি। মনে হয়, দশটা না হলেও পাঁচ বছর এখানে গচ্ছিত রয়েছে বাড়তি পরমায়ু। আর আমায় কে ঠেকায়?

এরপর দু একদিন বাদে বাদেই আসি। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ার মত টালা থেকে টালিগঞ্জ ঘুরে। কোনদিন বা একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। বলতে গেলে যার পেটে জল হজম হওয়া কঠিন ছিল, এখন সে লুচি ডিমও ওড়ায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব করলে মহিলা বলেন, খেয়ে ফেলুন—ভয় নেই। না খাওয়াটাই একটা রোগ। সব দায়িত্ব আমার।

মা মারা গেছেন অনেক দিন। চকিতে যেন তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাই!

ডাক্তারবাবু একদিন বলেন, আজ একটু বসুন, দুটি আর্টিস্ট ছেলে আসবে, গান শুনে যাবেন।

মনের রঙ বদলে গেছে, একটু আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠও হয়েছে, সাহস করে কটাক্ষ করি, কে তবে ঘুঙুর পরবেন?

তিন জনেই খোলা মনে হেসে উঠি। তবে মহিলার মুখে যেন একটু রাঙা ছোপ। বলেন, আমার বড় মেয়ে নাচ শিখছে। একদিন সুযোগ মত দেখবেন।

আমি বলি, বেশ।

আবার কথা ঘোরে অন্য দিকে। মাংস পোলাওর মুখে যেন চাটনি।—যিনি আপনার চিকিৎসা করেন, তিনি কিন্তু প্র্যাকটিস করেন না—ওঁর আসল পেশা চাকরি।

একটু বিস্মিত হই। মন্তব্য করি, তবে কি এসব হবি?

স্পোর্টস্? পিকনিকের আনন্দও বলতে পারি! কিন্তু সুচ ফোটাতে তো ওস্তাদ উনি।

বলেই হাসি। মনে মনে ভাবি, দুদিন আগে এ হাসি কোথায় ছিল? এখানে পরমায়ু গচ্ছিত রেখেই পেলাম নাকি?

ডাক্তারবাবু একটু উদাস গলায় জবাব দেন, প্রথম জীবনে শুরু করেছিলাম, ধাতে সইল না, তাই চাকরি নিয়ে যুদ্ধে গেলাম। ফিরে এসেও চাকরি।

ওঁর গলায়ই গলা মিলিয়ে আমি উক্তি করি, তবু রে মন শিকার সন্ধানী! বক দুটি তার প্রতীক।

মহিলা বলেন, এ কিন্তু ভারী অন্যায়। শেষটায় আমাকেও জড়ালেন?

নির্মল হাসিতে আবার ঘরখানা ভরে ওঠে। একটু একটু মৃদু বোল শোনা যায় তবলা যন্ত্রের। হারমোনিয়মে নিপুণ আঙুলের নাচ। শব্দ নয়, রোমন্থন।

আর্টিস্ট দুটি এসেছে। পরিচয়ে খানিক সময় কাটে। একজন কেরানী আর একজন মিস্ত্রী।

প্রশ্ন করি, তবে আপনাদেরও কি পেশা ধাতে সয়নি?

আর্টিস্ট দুটি একটু বিমূঢ় হয়ে থাকে। একা ডাক্তারবাবুই শুধু হাসেন। মহিলা গেছেন ফের চায়ের পর্ব সামলাতে। চা এসে পড়ে।

একটু পরেই টের পাই, এরাও টুটা ফুটা—অল্প বয়সেই কার্নিশে হাতলে টক্কার খাওয়া। ধূ-ধূ মরুভূমির ভিতর চলতে চলতে দেখতে পেয়েছে ওয়েসিস। তাই আসা যাওয়া! চমৎকার শিকার! এদেরও কি পরমায়ু গচ্ছিত?

গান বাজনা চলে অনেকক্ষণ। এরপর আরো একজন আসেন। তিনি সত্যই ওস্তাদ। কিন্তু গলায় কাঁটা, দম নিতে বেদম কষ্ট—অথচ গানই তাঁর পেশা। এ মার এড়ান দায়।

আরো আসেন দুটি ভদ্রলোক, তাঁরা শিল্পী নন, সাধারণ। তেতো ওষুধ, মিষ্টি চাতে আপ্যায়ণ চলে নিয়ম মত।

ছেলে দুটি শুধু আর্টিস্ট নয় সাধক, একেবারে মশগুল হয়ে বাড়ি ফিরি, এমন ভাঙা-চোরা মানুষের কোথাও জমায়েত দেখিনি! বন্ধুর বাড়তি পয়সা বান্ধবীর ইচ্ছায় সার্থক। এই জন্য কি কবি লিখেছিলেন—

ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান!...

স্বাস্থ্য ফিরেছে, কিন্তু গল্প ফুরিয়েছে—আরো—আরো ফ্রেস্ স্টক্ চাই! নইলে কি করে জুটবে পুষ্টিকর খাদ্য পানীয়? সংসারের বোঝাও তো কম নয়। এরপর রয়েছে পূজোর তাগাদা। কয়েক বাণ্ডিল টাটকা গল্প চাই।

ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, এর কি কোনো প্রতিষেধক আছে বিজ্ঞানে? মাঘ মাস থেকে পত্রাঘাত, পূজো আশ্বিনে কি কার্তিকে।

টাকা?

ফিরে মাঘে?

তবে আমি বলি, আপনি লিখুন—শুধু শুধু সাহিত্যিকের মগজটা আর খাটাবেন না। ওটা লাগাবেন আসল সৃষ্টির কাজে।

আমি বলি, কিছুই নকল নয়! পাণ্ডুলিপির নিচে সই করলেই ঠেকলাম। পাঠক বুঝবেন না, বাকিতে না নগদে। বিস্বাদ হলেই তিনি কৈফিয়ৎ চেয়ে বসবেন।

ডাক্তার বন্ধু গোটা কয়েক গল্প শুনিয়ে দেন। লিখে আর তর সয় না। মাসিকে দৈনিকে পাঠিয়ে খালাস, খ্যাতির সঙ্গে খাদ্য, এমন রাজজোটক ভাগ্যে জুটেছে আমার।

আবার লোভে তপস্যা সুরু করি, আর একটি বড় দুর্ভিক্ষ। যা দিয়েছেন, তাতে চাহিদা মেটেনি।

মহিলা সবই শোনেন। মাসিক দৈনিক উলটে পালটে দেখেন অনুরাগে। একদিন বলেন, আমার একটি গল্প শুনবেন?

নিশ্চয়! কিন্তু এতদিন ঢেকে রেখেছিলেন কেন? তবে আপনি শুধু কবি নন, কথা সাহিত্যিকও বটেন! রাইভেল?

ডাক্তার বন্ধু হেসে ওঠেন।

মহিলা হাসলেও অস্বীকার করেন না মন্তব্য।

গল্প পাঠ শুরু হয়। সারা ঘরখানায় একটা মিষ্টি ব্যঙ্গাত্মক আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ে শেষ হলে বলি, সার্থক হয়েছে রচনা।

যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তত আরো গল্প শুনি। দাদাদের টিপ্পনির আশঙ্কা নেই, ত্রুটি বিচ্যুতি পেলে সাধ্যমত সজাগ করে দিই মহিলাকে। জানতে পারি আমার এবং ওঁর গল্পের উৎস একটিই।

মনে মনে প্রমাদ গণি, কিন্তু এক সময় ভুলে গিয়ে বলি, এবার গানটা বাকি।

তাও একদিন শোনা হয়ে যায়।

গলায় কি ছিল জানিনে. জানলেও এখন আর স্মরণ করতে পারছিনে। কিন্তু একখানা উপন্যাসের প্রেরণা জোগায়—

রোদন ভরা এ বসন্ত (সখি)

কখন আসেনি বুঝি আগে......

আমি দেখি রোদন ভরাই এ বসন্ত বটে! কেন যে নিয়েছিলাম এ বৃত্তি! ফুরিয়ে যায় উপন্যাসেরও টাকা আমা পাই। আবার দুর্ভিক্ষ, আবার খাই খাই। বঙ্কিম নেই, আজ কে বর্ণনা করে বোঝাবে এ মন্বন্তরের কাহিনী?

বড় কোন লাইব্রেরীতেও তেমন যাতায়াত নেই, বিদেশী সংকলন থেকে হুবহু না হলেও, একটু নাক চোখ পালটে মেরে দেওয়ার মত দক্ষতাও নেই। তাই আরো ঘন ঘন এখানে আসি। লজ্জায় কিছু বলতে পারিনে। প্রত্যাশারও আছে একটা সীমান্ত।

এক দিন সবে চা শেষ করে বসেছি। মহিলাও আছেন আসরে।

রাত তখন আটটা কি ন'টা, ডাক্তারবাবুর মনটা যেন ভাল নয়। কথায় হাসিতে এমন বিষাদের সুর কখনো দেখিনি। বলেন, মানুষই সব, এই যে আপনারা আসেন, যান—মনে কত ভরসা পাই।

আমি দেখি গল্প হচ্ছে—মনকে বলি সর্টহ্যাণ্ড নাও। কিন্তু মহিলার চোখও যে উজ্জ্বল! দেখা যাক কি হয়! মুখে জবাব নেই, যতটা সম্ভব সমবেদনা বজায় রাখতে চেষ্টা করি, আপনার কথা সত্য, কিন্তু...

একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আজ বন্ধু। এর ভিতর কিন্তুর কোনো অবকাশ নেই।

মাথা নত করি। বুঝতে পারি কোথায় যেন মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা দেখেছেন, দেখেছেন দুর্বিসহ অপমান, তারই এ বিস্ফোরণ।

মহিলা বলেন, জানেনই তো ওঁদের কোম্পানী কতটুকু থেকে আজ কত বড় হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে তার ব্যবসা। এখন কথায় কথায়ই বলে যে ম্যান-পাওয়ার কিছু নয়। কোম্পানী যা দিয়েছে এবং ওঁরা যা করেছেন তার নাকি হিসাব নিকাশের সময় এসেছে। তাই ওঁর মনটা খারাপ।

ডাক্তার বন্ধু বলেন, আমি লিখে জানাব সব, ছাড়ব না। এগার বছর চাকরি করছি এ ফার্মে।

আমি পূর্বের কথা টেনে বলি, কিন্তু আমরা কি করতে পারি আপনার—এই টক্কর খাওয়া মানুষগুলো? ঈশ্বর না করুন যদি কখনো বিপদেই পড়েন—

বাক্যটা আর শেষ করা হয় না। সমস্ত পরিবেশটা উর্ধ্বায়িত হয়ে যায়, চলে যাই কলকাতা থেকে কোহিমার এক ঘাঁটিতে। পাথর-জঙ্গল-ধ্বস।

ডাক্তার বন্ধু বলেন, বম্বিং হচ্ছে। জাপানীদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। বন-জঙ্গলের মধ্যে আক্রোশে হাত পা কামড়াচ্ছি। লাফিয়ে পড়ব এবার। আমাদের চারশ আর্মি

জনের ইউনিটটা গেছে চারদিকে ছড়িয়ে। হুকুম আসে পিছন থেকে, 'মেক এ সাক্‌সেস্‌ফুল রিট্রিট। আবার হাত পা কামড়াতে কামড়াতে ফিরে আসি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন?

এখনো সময় হয়নি। ক্যাম্পে ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখি, মানুষ থাকলে আবার আমরা এগোব, আবার লড়ব। আজকের যুদ্ধই চূড়ান্ত নয়। এক একদিন আর্দালি রহমানটা ফিরতে দেরী হলে, কি যে মনে হত তখন! বারবার জিজ্ঞাসা করি চারশ আশি কি মিল্‌ল?

আমি বলি, রহমান তখন পুত্রাধিক।

ডাক্তার বন্ধুর চোখ মুখ স্নেহ রসে টলটল।

রহমানকে পাওয়া গেছে, পরিস্থিতিটাও আর যুদ্ধের নয়, আমি বলি, একটু চা হোক।

নিশ্চয়, মহিলা উঠে যান। যেন, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। ফিরে আসেন চট করে।

তিনজনে চা খাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি, বড্ড ফাঁকিতে তো পড়া গেল। রহমানের গল্পটাতো গল্প নয়, একটা কাহিনীর খণ্ডাংশ। সে ছাড়া আমি কলকাতায়, ঘটনাটা ঘটেছিল আসামের কোন্‌ জঙ্গলের ক্যাম্পে, কে জানে। সে পটভূমি রচনা করাওতো বিপজ্জনক। আজকের দিনে অভিজ্ঞ পাঠকের অভাব নেই। তবে আগে পিছে তাপ্পি দিয়ে মহিলা হয়ত লিখতে পারেন। কারণ এক বালিশে শিয়র দেয়ার অনেক সুবিধা। তখন কলকাতায় বসে কালিফোর্ণিয়াও এসে যায় হাতের মুঠায়।

চা কিঁ আজ পানসে?

চিনি দেব?

না, না, বলতে বলতে চিনি আসে। কিন্তু মেশাবার অবকাশ হয় না।

আবার শুরু হয়েছে গল্প। আমার এবং মহিলার চোখ বিস্ফারিত! এবারেরটি একেবারে নিটোল, বেদনায়-ব্যঞ্জনায় মহত্তর সৃষ্টি।

আমি সবিনয় বলি, লিখব কি?

চট করে মহিলা বলেন, না—কপি-রাইট রিজার্ভড্।

আমি এবং ডাক্তার বন্ধু হেসে উঠি।

২৪।৩।৫৮ দুপুর ২-৬টা।

গল্পটা পড়ে কি মনে হচ্ছে?

বেশ টেকনিক প্রধান—না? একটু চিন্তা করে দেখলেই রস পাওয়া যাবে বক্তব্যের। সে ছাড়া একথাও বোঝা যাবে মাননীয়া বান্ধবী শৈলজা চৌধুরাণীরই যেন বিশেষ একটা কারসাজি রয়েছে এর ভিতর। ডক্টর প্রফুল্ল চৌধুরী তো শিবতুল্য মানুষ, তাঁকে আর আসামীর কাঠগোড়ায় টেনে আনা উচিত হবে না।

এঁদের সঙ্গে কি পঙ্কজিনীও রয়েছেন—যিনি স্বামী অন্তঃপ্রাণ? আছেন কি আচার্য রমেশদা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি? ষড়যন্ত্র, ঘোর ষড়যন্ত্র! এইবার দক্ষিণারঞ্জন বসুর দাক্ষিণ্যও ধরা পড়ে গেল—ধরা পড়ে গেল তাঁর মহত্ত্ব। এই জন্যই কি তিনি যুগান্তর থেকে বারবার টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছেন, ডিরেক্টর ডাঃ চৌধুরীকে, জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েসনের বেড়টি অন্তত অমরবাবুকে দেওয়া হক!

আমি তোমাদের সবাইকে হয়ত ভুল বুঝেছি এতদিন। আমার মতই হয়ত অজস্র সকরুণ নালিশ আছে তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। এই জবানবন্দী লেখার সময় সেই মর্মাহতদের যদি সন্ধান পেতাম! তবু তাদের হয়ে এই আর্জি রুজু করে গেলাম এমন আদালতে, যেখানে বিচার হয় যখন তুমিও নেই আমিও নেই—শুধু লেনদেনের সত্যটুকু কায়েম হয়ে রয়েছে!

একটি নার্স কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, আপনি উঠবেন না

—ঘুমোতে চেষ্টা করুন। অনুগ্রহ করে হাসপাতালের ডিসিপ্লিন ভাঙবেন না।

আমি তো ভাঙছি নে। ইনসোমনিয়াকে বলুন, উইণ্ডকে কন্‌ট্রোল করুন। শুকনো নির্দেশ মানা যায় না দিদি।

যদি কোথাও পড়ে যান এক্ষুনি আমার কৈফিয়ৎ তলব করবেন আর. এম. ও.।

আমি পুরান রোগী—পাঁচ বছর ধরে হাঁটছি সারা রাত। বলতে গেলে টালা-টালিগঞ্জ আমার নখদর্পণে। অন্তত আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নার্সটি বোধহয় নতুন। আর কিছু বললে না। আমি বেরিয়ে এলাম নিঃশব্দে বারান্দায়। এখানেও মুক্তি নেই। লোহার জালে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত খিলান। আত্মঘাতী হওয়ারও কারুর সুযোগ নেই।

ক্ষোভে অভিমানে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। বিড়িও ধরালাম স্বাস্থ্যের এ, বি, সি, ডি না মেনে। জালের ফুটো গলেও একটু একটু আসছে উত্তুরে হাওয়া। মন্দ লাগছে না। একা বসে রয়েছি নিঝুম অন্ধকারে।

কিন্তু কে ফোঁফাচ্ছে? দারুণ ফোঁফানি। আমার অভিমান ক্ষোভ উবে গেল। উঠে হাঁটতে শুরু করলাম লম্বা বারান্দা ধরে। পর্দার কাছে এসে থামলাম। সেই লাল পর্দা। বন্ধ সতের নম্বর চাদর ঢাকা—নীরব—কঠিন-কঠোর! কোন শব্দ নেই কোথাও। তবু যেন ফোঁফানি শোনা যাচ্ছে।—আরো উচ্চগ্রামে, আরো···

কিশোরের আত্মা ঠেলছে শবদেহটাকে। নিশ্চয় তাই। আমার কোন কুসংস্কার নেই। ঠিকই দেখছি সব!

এখন আঃ শব্দের অন্য অর্থ হয়েছে। শব বলছে—আঃ আর বিরক্ত করো না—যাও। কাঁদলে প্রকৃতির প্রতিশোধ ফেরানো যায় না। ঘুমাতে দাও।

সারারাত কিশোরের আত্মা কাঁদলে। শব তবু নড়লে না।

ভোরবেলা একখানা দেহতত্ত্বের গান শোনা গেল।—

গুরু-গো তোমার খেলার খেই যে পেলাম না।
খুঁজতে খুঁজতে সুতো জটিল হল
ছুটতে ছুটতে আমার জনম গেল
তবু তোমার খেই যে পেলাম না॥

তারপর একখানা পদাবলী।—

'আমি যোগিনী হইয়া যাবো সেই দেশে যেথায় ও নিঠুর শ্যাম···

কে গান গায়? চার নম্বর? শুনলাম তার আজ ছুটি হবে। কোথায় যাবে যোগিনী হয়ে তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না। সে আরো বললে, কি দেখছেন ষোল নম্বর? ওর ক ঘণ্টার জন্য এই জমিটুকু কেনা ছিল। নইলে পেয়িং বেডে সাতদিন থেকে ক ঘণ্টার জন্য এখানে এলো কেন?

কোন কথা না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেক অবসাদে তন্দ্রায় সময় কাটল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমিও সেই পর্দায় ঢাকা। তবে কি এই বিছানার জমিটুকুই শেষ আশ্রয়?

॥ দশ ॥

২৫।৩।৫৮ সকাল ৬-৯টা

চুপ করে শুয়ে জীবনের গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দি। বার্ধক্যের জ্ঞান ও তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে কর্ম ও কোলাহল মুখরিত প্রৌঢ় জীবন। একটার পর একটা শুধু ব্যর্থতা ও কৃতকার্যতা। তারপর যৌবনের উদ্দাম বাসনা! মনে হয়েছিল আমি অমর—চিরজীবী। আরো পিছনে গিয়ে করতোয়ার খাড়ি পার। ধাবমান অশ্বে

কিশোর, সেই শাদা ঘোড়াটার পিঠে উঠেছি। যেন উড়ে এলাম এক গৃহস্থ জনপদে। ঘোড়া থেকে নামতেই সকলে মৃদু ভর্ৎসনা করল। আমি এক মুসলমান কলুবাড়ি ঢুকে পড়লাম।

মিতা এসেছে মিতারে।—একজন বছর পঁয়ত্রিশের মানুষ বেরিয়ে এলো। কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি গোঁফে মুখখানা জঙ্গল। তার ভিতর খণ্ড খণ্ড ঝুনা নারকেলের মত দাঁত। হয়ত কোন দায় ঠেকে থানার বড় দারোগার ছেলের সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়েছে। তখন আমি সে স্বার্থের কথা বুঝিনে। আমার ভালই লাগত মিতাকে। তার চেয়েও ভাল লাগত তার একটি পয়সার আপ্যায়ন? যেদিন আসতাম মিতা একটি পয়সার বাতাসা কিনে দিত। আর এগিয়ে দিত একটা পিতলের গ্লাস। জল এনে খেতাম নিজ হাতে করতোয়ার থাক থাক মেটে পাড় ভেঙে নীচে নেবে। মিতা মুসলমান, এ অঞ্চলের বাসিন্দারাও মুসলমান। তাই মিতার কত হুঁশিয়ারি কেউ যাতে স্পর্শ না করে আমায়। আমি পা টিপে টিপে আসতাম। একেবারে বাড়ির কাছে এসে একদিন অতর্কিতে যেন ছুঁয়ে ফেলে মিতাকে ঢক৴ক করে খেয়ে ফেললাম জল।

মিতা স্তম্ভিত।

আমিও আশ্চর্য। জাত যদি যেয়েই থাকে, কিছু তো আমার বদলাবে। নইলে অন্তত মিতার কিছু হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এমন যে শিশু তাকেও আগুন ক্ষমা করে না।

পুরোপুরি দুজনেই ঠিক আছি। আমি হেসে কুটিকুটি। একটা সত্য সেদিন ধরা পড়ল কোনো মানুষই অচ্ছুৎ নয়। মনে মনে স্থির করলাম, সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে সগর্বে জানিয়ে দেব এই বার্তাটা। বিশ্বাস না করো, তোমরা পরীক্ষা করে যাচাই করে দেখো মূল সত্যটা।

আগেই বলেছি আমার মিতা জাতে মুসলমান। পেশায় কলু, সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফিরব—এখন একটু ঘানিতে চড়ে ঘুরি, অন্ধকার

ঘরে চোখ বাঁধা বলদের মত। প্রথম প্রথম মাথাটা একটু ঘুরাবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু অভ্যস্ত হতে যা তোমার দেরী।

কঞ্চির বেড়ায় বেলে দোয়াঁশ মাটির প্রলেপ। খৈল-তেল-ধোঁয়া-গোবরের গন্ধ। একটু চোখ সওয়া না হলে সহজে কিছু দেখা যায় না। চোখে ঠুসি একটা বলিষ্ঠ বলদ ঘুরছে। ঘানি এবং কাঁধের যোগসূত্র একখানা চ্যাপটা কাঠ। তার ওপর পাথর একখানা ও মানুষের বৈঠক।

অনেক দিন ঘুরেছি এমনি। শৈশবেই ঝানু হয়ে গেছি। কিন্তু রামপ্রসাদ বোধ হয় পোক্ত হতে পারেননি। অল্প ঘুরেই হতাশার গান—

আর কত ঘুরাবি মা আমায় চোখ বাঁধা বলদের মত...

বাঙালীর মজ্জা ভেঙে দিয়ে গেছেন সাধক রামপ্রসাদ এথিক্যাল চাবুকে। সভ্যতার বিপ্লবে অনেক কিছু বদলায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিতার বাড়ির বলদের আশানুরূপ ক্রম-বির্বতন ঘটেনি আজো পৃথিবীতে।

২৬।৩।৫৮ সকাল ৯-১১টা

অনেকখানি অতীতে চলে গেছি। খানিকটা পিছিয়ে আসি, এ-ও অতীত। ধুনোট ছেড়ে এবার আদমদীঘি। এ থানার এ নামকরণটি যে কি স্বার্থক হয়েছে! লোক বলে পুরান পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়! আমি ভাবি সব সময় একথাটাই শেষ কথা নয়। হাসপাতালেও বসে দেখছি দুটো আড়াআড়ি ধূ-ধূ দীঘি। একটার কাক চক্ষু জল। আর একটা ঘাস দাম বোঝাই বিষাক্ত সাপের আস্তানা। জংলা দীঘিটার একপাড়ে থানা অন্য পাড়ে আদমের দরগা। অনেক দিনের জীর্ণ স্তূপ। শ্যাওলা পরা পাতলা পাতলা ইটের পাকে পাকে প্রবীণ বটের শিকড়। মাথায় স্নিগ্ধ ছায়া। চারপাশে জলো হাওয়া প্রজাপতির পাখার তাড়ায় যেন ঘুরছে। বোটানিকেল গার্ডেন, ইডেন উদ্যান, এয়ার কণ্ডিসনড্ ঘর অনেক

দেখেছি, কিন্তু এমন শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া-সুশীতল বাঙলাকে কখনো অনুভব করিনি।

শহুরে পাঠক যদি তুমি কখনো শ্রান্তিবোধ করো, তবে গিরিডি, মধুপুর, পর্বত কন্দর না ডিঙিয়ে এমনি একটি অঞ্চল বেছে নিও বাঙলা দেশে। দেখবে এখানে ফুল-ফল-ঋতুর অদ্ভুত সমন্বয়। কখনো আকাশে খাঁ খাঁ রদ্দুর, কখনো প্রাবৃটের ঘন মেঘ। এই চিলিক মিলিক ঝিলিক, তারপরই রামধনু। চাঁপার গন্ধ ফুরাতে না ফুরাতে বেল মল্লিকা কেয়া কদম্ব জুঁই।

আদমদীঘিতেই হারুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আজ মনে হয় আমার জীবনের প্রথম নায়িকা। অর্ধস্ফুট আলো আঁধারের মতো সে সন্ধিক্ষণ জীবনে বার বার আসে না। মাথা কুটে মরলেও না। সে ছোপ-ছোপ রূপ দক্ষ শিল্পীর তুলিতেও অসম্ভব।

দরগার পাশে বসেছিলাম একা সঙ্গীহীন। বেশিক্ষণ আর এ ভাবে থাকা যায় না। একটু হাওয়া আসতেই ঝরঝর করে উঠল খিরসাপাতি তাল গাছটার মাথা। ছুটলাম তালের লোভে। এমন তাল নাকি এ তল্লাটে আর জন্মে না।

২৭।৩।৫৮ সকাল ৬-৯টা

আবছা ঝোপ ঝাড় ভেঙে ঠেলে উঠেছে খিরসাপাতি তাল গাছটা আকাশের দিকে। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু একটা সাপের খোলস। নিশ্চয় জীবন্ত সাপটাও আছে আশ-পাশে কোথাও গর্তে। ঐ তো গর্তটা খিরসাপাতির গাছটার কোলে। ভয় করলে এমন তাল সংগ্রহ করা যাবে না। সাহস করলেও ফণাতোলা নাগিনী, সমস্যা—ভীষণ সমস্যা। দুলতে থাকলাম দ্বিধা দ্বন্দ্বে।

তখন তো জানিনে এমনি সমস্যায় জীবনে বহুবার পড়তে হয়। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ স্থির করার আগেই কর্তব্যের ডাক এসে পড়ে। সংকল্প নিল্যম থাক সাপ, তাল পড়লে আমি কুড়াবই।

গর্তটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আবার ঝরঝর করে দুলে উঠল তালের ডগা ও পাতা। এবার পড়বে তাল।

এলো একটি মেয়ে। চ্যাপটা না হইলেও খাটো নাকে বেসরের চাকচিক্য। দুধে আলতা গায়ের রং, চুলের আভা বাদামী। হাতে একটা কঞ্চি।

আমায় দেখে অবাক।

বললাম, সাপ—সাপ!

২৮।৩।৫৮ সকাল ৬-৭টা

কোথায় দুশমন? মেয়েটা গর্তের ওপর গিয়ে যেন জেনে-শুনেই দাঁড়াল। খোলসটাকে দিল কঞ্চির ডগা দিয়ে দূর করে ফেলে। এই মেয়েই কি শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের বোন! এমনি ধারা ভেবেছি অনেক।

এই মেয়েকেই আবার অনেক দিন বাদে দেখেছিলাম পূর্ব বাঙলায় আর একটি মেয়ের ভিতর। বিলের কালো জলে বড় একখানা নাও ঠেলছে। এ-টি হিন্দু, ও-টি মুসলমান। একটি ফর্সা, আর একটি কালো। দুজনার চোখে তেজ দীপ্তি একই। বিলের কালো জলে কাল-বৈশাখীর ছায়া পড়েছে, তবু ভয় নেই। আমাকে ঠাট্টা করে আহ্বান জানাচ্ছে যাবো নাকি প্রমোদ ভ্রমণে? লগ্ন বটে প্রমোদ ভ্রমণের—ঝড় এলেই মৃত্যু. বিলাস কাব্য!

আরো একটি মুসলমান বৌকে দেখেছিলাম, নাম ডালিমজান—বর্ষীয়সী পাকাপোক্ত গঠন। তার স্বামী সি. টি. অ্যাক্টের দাগী। পুলিস এসে ঠিক সন্ধ্যার সময়ই হাজির পায়নি। নিয়ম বিরুদ্ধ বটে। সারা দিন যেখানেই থাকো, সারা রাত বাড়ী থাকা চাই। কিন্তু উজান জল। হাট থেকে ফিরতে দেরী হয়েছে সেদিন। পুলিসের মুখে ট্যাক্‌সো নেই। সুন্দরী বৌটাকে দেখে আরো যেন একটু মুখ খোলতাই হল।

২৯।৩।৫৮ সকাল ৬-৭টা

চুরি ডাকাতি অনেকেই করে, মুচ্ছুদ্দিরা ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে চুনোপুঁটি এ যুক্তিটা দাগীর বৌ জানতো। তারা স্বামী স্ত্রীতে একটি শান্ত অনাড়ম্বর জীবনই তো কামনা করেছিল। কিন্তু পায়নি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে ।

হঠাৎ সেদিন দাগীর বৌয়ের আত্ম-সম্মানে ঘা লাগল। সে উঠানে লাফিয়ে পড়ল ধারাল কাটারি নিয়ে। অতর্কিত আক্রমণ। অপ্রস্তুত পুলিশের দল লেজ গুটিয়ে পালাল।

ফলাফল যা-ই হক, সেদিন দেখেছিলাম সশ্রদ্ধ চোখে এক রণ-উন্মাদিনী মূর্তি। দালানে-দরবারে, পাউডারে-রুজে-পমেটমে এ মেয়েদের দেখা যায় না। দেখা যায় বিশেষ মুহূর্তে—কাল বৈশাখীর ছায়ায়, নয়ত কেঁউটের গর্তের মুখে, অথবা নারীর মর্যাদা যখন বেপরোয়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

স্বামীর জেল হয়েছে, অথবা কোথায়ও কেউ তালাক দিয়েছে বিনা দোষে—তখন এই মেয়েকেই আবার দেখেছি দিনের পর দিন কৃচ্ছ্র সাধনা করতে। অর্ধাহার অনাহার করে সুদিনের অপেক্ষায় রয়েছে। আত্মহত্যা কিংবা আত্ম-বিক্রয় করেনি।

খড়ো ঘর পচা চালের আশ্রয়ে আজ যে মেয়েকে দেখছি, সেই মেয়েই স্মরণ করিয়ে দেয় রাজপুতানার মরুভূমি। কল্পনায় দেখি পদ্মিনী জহর ব্রত পালন করছে। আগুনের লেহি-লেহি শিখায় ঝলমল করছে মার্বেল কুঠি—অথবা রানাদের অন্দর মহল।

বাদশা হারেমেরও একটা গল্প মনে পড়ে, কোন্ বাদশা যেন তারিফ করে বলেছিল—সুন্দরী তোমার হাতখানি কি সুন্দর!

অমনি তীক্ষ্ণ তলোয়ারের এক কোপ!—এই নাও হাত?

তোমার স্তন কি সুন্দর?

এই নাও। তারপর?

তোমার চোখ?

তাও নাও। এখন?

এ দৃশ্যের সত্য মিথ্যা যাচাই করায় আমাদের কাজ নেই, শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবি, কি অপরিসীম ধৈর্য-আত্মসম্মান-ধিক্কার বোধের এ ফল!

এ মেয়েই বার বার আমার লেখনী মুখে ফুটে উঠেছে। 'পদ্ম-দীঘির বেদেনী' আনায়াসে কাবু করেছে জংলি সাপটাকে, বিলের জলের মতই রং। ছিমছাম চলন।

'চরকাশেমে' এসেছে দর্পিনী ফুলমন। ভালবাসে তবু আভিজাত্যে স্বীকৃতি দেবে না। প্রিয়জনকে বলে কিনা তুই ইশকাপনের টেক্কা! তোর ছুরাৎ দেইখা মইরা যাই! কিন্তু শেষ পর্যন্ত বশ মেনেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। ফুল ফোটাতে চেয়েছে 'চরকাশেম' জুড়ে।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-তে একে একে আত্মাহুতি দিয়েছে উর্বশী মাধবী চাঁপা উর্মিলা। দেশ বিভাগের দাউ দাউ শিখায় পুড়ে গেছে গ্রন্থ গীতা। মহিয়সী বুঢ়া আম্মা তা রুখতে পারেননি। শেষ হয়ে গেছে পুর্ব বাঙলার ঐতিহ্য। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি।

এমনি বিদ্রোহিনী মুক্তা এসেছে 'জোটের মহলে', এসেছে বিপ্লবিনী কুসুম। আমি নারী চরিত্রের মহান বলিষ্ঠ রূপটি বার বার আঁকতে প্রয়াস পেয়েছ। তবে অনেকেই তারা পোশাকী নয়, তবু এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করিনি।

॥ এপার ॥

৩০।৩।৫৮ সকাল ৬-৯টা

কল্পনার আগল খুলিনি, নোঙর তুলেছি স্মৃতির। হু-হু করে ঝাপটা হাওয়া লেগেছে পালে। কতক্ষণ আর লাগল বগুড়া জেলার খানাগুলো ছাড়িয়ে আসতে! এবার আবার শালবন, চা বাগিচা, দুর্ভেদ্য ঘন অরণ্যে হাতী-হরিণ-বুনো মোষ। নেপালী সাঁওতালী ভোটানী মেয়ে পুরুষ।

টেরাই অঞ্চল—মহান হিমালয়ের পাদদেশ।

তখনো বুদ্ধি পাকা হয়নি। ঘুম ভেঙে দেখি অজস্র সোনা গলে গলে পড়ছে একটা পাহাড়ের চূড়া বেয়ে। জাহাজ ভরে নিলেও শেষ হবে না। এত চকচকে সোনা এলো কোত্থেকে?

৩১।৩।৫৮—সকাল ৮-৯টা

আজ যদি হারুকে পাওয়া যেত। কত গোলেবাখালি কন্যার যে গল্প শুনেছি ওর মুখে। দীঘির জ'লে মুখোমুখি ডুব দিয়ে কত যে আয়না-মোহর খেলা! সঙ্গিনীকে যে আজ কতদূর ফেলে এসেছি! একখানা গ্রুপ ফটো ছিল আমাদের—আদমদীঘি থানার স্মৃতি। আমার পাশটিতে হারু, গায় একখানা ঝিকমিকে ওড়না। এই ওড়নারই হয়ত বর্ণনা দিয়েছি 'চন্দ্রকাশেম'-এ ভরন্ত যৌবনে ফুলমন যখন দর্পিতা। বিয়ের আসর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বান্দা কাশেম্, সে এক দৃশ্য! কখন কোথায় প্রত্যক্ষ করেছি, অথবা দেখার মত করে বারবার শুনেছি, তা লেখার সময় মনে নেই। কিন্তু খাপ খেয়ে গেছে উপন্যাসে চমৎকার। মনস্তত্ত্বও পরিবেশের সঙ্গে বাস্তবানুগ করে ঘটনাকে কি ভাবে যে জুড়ে দিতে হয়, তা শিখতে আমার বই পড়তে হয়নি, ধার করার

প্রয়োজনও কখনো বোধ করিনি। এসে গেছে বর্ষার ঢলের মতো তোমাদেরই কিংবা হারু-কাশেমের দেওয়া অভিজ্ঞতার পথে।

বেশি হাইপোতে ডুবিয়ে অল্প ধুয়ে হারুর ফটোখানা ফটো-আর্টিস্ট মাটি করেছে। ঝলসে বিবর্ণ হয়ে গেছে রঙ। চেনা যায় না সেই মুখখানা। কিন্তু জীবন-শিল্পী আছে বৃদ্ধ যুবা কিশোর সকলেরই বুকে। একবার চেয়ে দেখো, সে কী আশ্চর্য একখানা ছবি এঁকে রেখেছে।

একটা লজ্জার কথা বলি--

একদিন তুই-না মেয়ে একছড়া সোনার হারের জন্য কত-না বিরক্ত করেছিলি তোর মাকে, ফটো তুলবো না—তুলবো না, তুলবো না।

সব শুনে আমিও বেঁকে দাঁড়ালাম।—ও নইলে ফটো তোলা থাক।

আমার মা মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন এক ছড়া হার দিয়ে হারুকে সাজিয়ে। কিন্তু তা হল না। স্বীকার করলে না সে-মেয়ে। তবু কি করে যেন শেষ পর্যন্ত ফটো তোলা হল, অত খুঁটিনাটি এখন মনে নেই।

আজ বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে বলি, ঐ দেখ কত সোনা। চল দেখি মনের মেয়ে কত পরবি গয়না ?

যত ছুটি মনে হয়, আর একটু এগুলেই সোনার পাহাড়। ঐ তো কয়েকটা ঝোপ ঝাড়, বড় জোর একখানা গ্রাম, না হয় একটা নদী।

তারপর কত যে সাগর পেরুলাম! একে একে সব সঞ্চয়ের কড়ি শেষ হল, স্বাস্থ্যের সোনাভাঙা রঙ কালো হল, তবু কি সোনার পাহাড় পেলাম! আজও আমার অন্তরলক্ষ্মী নিরাভরণ। কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। শ্মশানের শিখায়ও তো মালা হয়।

না হয় শেষ পালায় ঐ মালাই পরিয়ে যাবো। আমার যত্নের বিরাম নেই।

৩১।৩।৫৮—বৈকাল ৩-৫টা

ছোট ছেলে অশোক একটু এদিক-ওদিক গেছে। রেবা বোধহয় একফালি কাঁচা আম চাটছে—বেলা তখন এগারটা। স্ত্রীকে বলি, ভাতের হাঁড়ি একটু ঠেলে রেখে আজকার এ বেলার লেখাটুকু শুনে যাও।

স্ত্রী এলেন, হাতে হলুদ—পিঠে আঁচল নেই। মুখে গনগনে আগুনের লালিমা। এই রক্তাভা একদিন আমারও মুখে ছিল। সে আর কদিনের কথা!

একটানা পড়ে গেলাম। স্ত্রীর চোখে জল এলো! তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হল, তা আর বলব না।

তাই একটু বিশ্রাম করেই লিখতে বসেছি। লেখার ভিতর দিয়েই তো আমার হাসি-অশ্রু-সমবেদনা!

প্রায় কুড়িটা দিন হাসপাতালে কেটে গেছে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি নেই। রোগ প্রায় নির্ণয়ের পথে। হাঁপানি কমেছে খানিকটা, কিন্তু স্নায়ুটা পুরোপুরিই ক্ষিপ্ত। আর একটি সংবাদ ওজন কমছে তিলে তিলে। ক্ষয় হচ্ছে অস্থি-মজ্জা-পেশী নিঃশব্দে। এটা দৃশ্য নয়—যদি দৃশ্য হত বলা যেত, এ দৃশ্যের একমাত্র নীরব দর্শক আমি। এমন যে পঙ্কজিনী, যিনি নিত্য আসেন ঘড়ির কাঁটার মত ছুটতে ছুটতে: এমন যে বীরেন ঠাকুরতার ভাই শচীন, যে এখন পুত্রাধিক, হাসপাতালের নানা সংযোগের ঝামেলা পোহাচ্ছে আমার; সেও জানে না। শুধু একা আমি মর্মে মর্মে বুঝছি। আর একজন জানেন স্টাফদিদি। তিনি বলেন, ভাববেন না কাঁটাটাই বিগড়ান বোধ করি।

আমি সত্যই ওজনের কথা ভাবিনে—আমি নারী হৃদয়ের একটি পরম বিন্দু আহরণ করি। অনেক সিন্ধু ঘুরে এসেও রবীন্দ্রনাথের

ক্ষোভ ছিল, ঘরের পাশের শিশিরের বিন্দুটি দেখা হয়নি, আমার আর সে ক্ষোভ নেই।

১।৪।৫৮—দুপুর ১-২টা

হাসপাতালেই যখন কাহিনীর প্রান্ত টেনে আনলাম, পর্দার কথাটাও বলি। হয়ত কারুর কৌতূহল থাকতে পারে সেদিন পর্দার আড়ালে ঘটল কি ?

মিনিট পনের বাদেই দুটি নার্স দিদি এলো, আমার সেজো মেয়ে গীতার মত কচি।—আপনাকে স্পঞ্জ করিয়ে দেবো।

আমি বলি, মায়ের মত মেয়ে তোমরা, এত কষ্ট করবে কেন ? নিজেরটা আমি নিজেই করে নেবো'খন। একটু উঠতে সাহায্য করো।

না, না আপনার খুব বেশি হাঁপানি হচ্ছে, উঠবেন না। এই তো আমাদের ডিউটি।

দাও তবে, দাও সব গ্লানি দুঃখ ধুয়ে মুছে। আমি আর লজ্জা করব না। তোমরা হচ্ছ সব মায়ের মত মেয়ে।

২।৪।৫৮ বৈকাল ৪টা-৬টা

স্নান শেষ হল—পর্দাগুলো সরে গেল। এখন কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত। আমি আমার কথা বলছিনে। আমি যেন নিরপেক্ষ দর্শক। বলছি আমার আত্মার কথা, যে এখনো ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে প্রবল আগ্রহে আঁকড়ে রয়েছে। হৃদপিণ্ডের সঙ্গে হৃদপিণ্ড মিশিয়ে দিয়েছে, ধমনীতে ধমনী, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়। কিযে ভয় পেয়েছিল পর্দা দেখে !

ইন্‌জেকসন এলো, অক্সিজেন এলো, নাসারন্ধ্রে রবারের নল। কপালে তাপ্পি। একটু হাঁপানি কমল বটে, কিন্তু সাজ সরঞ্জামে মনে পড়ল কলুবাড়ির বলদটার কথা। ওটার নাকেও এমনি দড়ি পরান ছিল। ওটাকে অনেক তক্‌লিফ দিয়েছি, তারই প্রতিফল নাকি ? ঘণ্টা কয়েক বাদে আমি নিজেই সব টেনে ফেলে দিই।

স্টাফ দিদি, নার্স একটি চিৎকার করে ওঠেন, আহা! করছেন কি? করছেন কি?

আবার ঠুলি পরি। ভেবে দেখি, আর যা-ই করি, ডিসিপ্লিন ভাঙা উচিত নয়।

অনেক কিছু জানলেও চিকিৎসা সমুদ্রে আমরা নুড়ি কুড়াবারও যোগ্য নই। অতএব শুয়ে শুয়ে বাধ্য হয়েই ঘুরি সেই মিতার বাড়ির চোখ-বাঁধা বলদের মত। ক' পাতা আগে কি যেন মন্তব্য করেছি—সাধক রামপ্রসাদ ক্ষমা করো এ অজ্ঞানের যত অপরাধ।

সাত নম্বরের সঙ্গে আলাপ হল। নাম এস. কে. ব্যানার্জি। রেলওয়েতে কাজ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। মুখে চোখে বুদ্ধির ছাপ। একখানা ইংরাজী বই পড়ছিলেন, মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস।

৩।৪।৫৮ সকাল ৬-৯টা

একটু সুস্থ হয়েছি পেনিসিলিনের ক্রিয়ায়। কিন্তু এযে কতক্ষণ স্থায়ী তা আমার জানতে বাকি নেই। তাই হেঁটে চলে বেড়াই পা দুটোকে অভ্যস্থ রাখতে। হাসপাতালের এ রাজসিক বেড কেস আর কদিন? এরপর তো শুকনা পা দুটোর ওপরই নির্ভর!

ভদ্রলোক মনেপ্রাণে মার্কসিস্ট। বিজ্ঞানের ওপর অগাধ আস্থা। প্রগতিমূলক সমাজ ব্যবস্থার কথা তুলতেই তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস বিজ্ঞানের কাছে কোন সমস্যাই সমাধানের অযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখিত হল 'শিশু চাঁদে'র জন্ম বৃত্তান্ত।

এরপর তিনি বাঙলা বইয়ের কথা তুললেন। কিছু কিছু প'ড়ে সমকালের ওপর একেবারে শ্রদ্ধা হারিয়ে বসেছেন। আমি আর পরিচয় দিতে সাহস পেলাম না। শুধু ক্ষান্ত হলাম নামটা জানিয়ে। বাঁচলাম, তিনি এখন পর্যন্ত আমাকে লেখক বলে জানেন না।

কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলাম, আত্মশ্লাঘা যদি দোষনীয় হয়, আত্মগোপনও তো তাই। সমকালের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ উঠেছে, আমি কি পরকালে গিয়ে সাক্ষী দেবো? আর অভিযোগ করছেন কে? একজন প্রগতিবাদী বুদ্ধিধর্মী পাঠক। এঁকে কিছুতেই অবহেলা করা যায় না।

আমি সবিনয়ে বললাম, ক'খানা বই লিখেছি 'চরকাশেম', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'বেআইনি জনতা'। একটু দাঁত ভাঙা বলে 'কনকপুরের কবি'র আর নাম করলাম না।

'চরকাশেম'? বইখানার নাম শুনেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় পড়া হয়নি। আর দিনরাত তো থাকি রাজনীতি নিয়ে। তারপর এই শরীরটা ক বছর ধরে বড়ই বেয়াদপি করছে। পেটের উইণ্ডের ব্যথায় পাছাটা যেন ভেঙে যায়। চলতে হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

তবু বুঝি সভা সমিতি মিটিং কামাই নেই?

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন। ধরা যায় কি যায় না মুখে ক্ষাণ হাসির রেশ। নিজের প্রশংসাকে এঁরা হজম করতে বোধহয় তপস্যা করেছেন। একথা আজ আমার একদিনে মনে আসেনি। এমনি দেখেছিলাম স্বাধীনতা আফিসের সিঁড়িতে সরোজ দত্তকে। সুমুখে স্ট্যালিনের ছবি। কোণায় কাস্তে হাতুড়ি। এমনি একদিন দেখেছিলাম গোলাম কুদ্দুসকে—একদিন সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মোটা ফ্রেমের চশমায় সুকুমার মিত্র এবং অরুণ রায়কে।

মুজাফ্‌ফর আমেদের সঙ্গেও ক'দিনের মাত্র সামান্য আলাপ। এই যে তাঁর কথা লিখতে কলম ধরেছি, তাঁর বিরাট কল্যাণ যাত্রার কিছুই তো জানিনে। আমার মত অজ্ঞের অধিকার নেই, এমন স্মরণীয় জনের ইতিহাস অশুচি করার। তবু কিছু লিখছি, চুরি করছি আমি দরিদ্র, মহত্তের মাণিক্য ভাণ্ডার। কতটুকু আর নিতে পারব, জানি আমি ক্ষমা পাব ভারতের অন্যতম সাম্যমৈত্রেয়ীর

পিতৃব্যের কাছ থেকে, তিনি আমার কিছু 'কাকাবাবু' নন, শুনেছি অগণিন হিন্দু মুসলিম কণ্ঠে এ সম্বোধন।

এই কিছুদিন আগে পবিত্রকুমার রায়ই বুঝি বলেছিলেন, ১৯৩৪, বর্ধমান জেলে মিরাট ষড়যন্ত্রের মামলায় উনি বন্দী—আমরাও। একটা একটানা সান্নিধ্য পেলাম। আজ যে বাঙলা ভাষাকে শাসক শ্রেণীর দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচাবার জন্য জান কোরবানি দিলে পূর্ব-বাঙলার তরুণদল এ-সংঘটনের আদি পর্ব খিলাফৎ আন্দোলনেরও আগে। তখন কূটবুদ্ধি ইংরেজ অবিভক্ত বাঙলাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চেয়েছিল চলমান সাহিত্য ও ভাষাকে দু টুকরো করে। এতকাল যেমন রচিত হয়েছে গাঙ্গেয় কথ্য এবং লিখ্যভাষায় সাহিত্য, পূর্ববঙ্গে তেমনি রচিত হবে সাহিত্য পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়। ইংরেজের এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ চাল যাঁরা ধরে ফেলে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, বিশেষ করে মুসলমান বন্ধুরা, মুজফ্‌ফর আমেদ ছিলেন নাকি তাঁদের মধ্যে একজন পথিকৃৎ।

আরো একটা ঘটনা শুনেছিলাম পবিত্রকুমার রায়ের মুখে। প্রথম পনরই আগস্ট বড় দুঃখের স্বাধীনতা দিবস। কলকাতার বুকে ঘোর রায়ট। মুজাফ্‌ফর আমেদ ব্যাকুল হয়ে ঘুরছেন ধর্মতলা স্ট্রীট্‌ দিয়ে। বলতে পারো কাল যারা মিটিং করতে গিয়েছিল তারা কি সবাই ফিরেছে?

পবিত্রকুমার কি জবাব দিয়েছিলেন মনে নেই।

মুজফ্‌ফর আমেদের সেই উৎকণ্ঠিত রূপ না দেখেও আমি তাঁর চিত্রকল্প ভুলতে পারিনি। একা একাই হয়ত বলছেন তিনি, কলাবাগান বস্তিতে গত কাল আটকা পড়েছে বীরেন রায়, নিশ্চয় তাকে খুন করেছে ওরা।

এই অতলান্ত বারিধির তীরে গিয়ে যখনই উচ্ছ্বাসে আবেগে আমি কিছু দৈনন্দিন কথা বলেছি, দু একটি সমাহিত শব্দ পেয়েছি,

তার পরিণতি যে কত ব্যাপক এবং চূড়ান্ত, তার পরিমাণ করা আজো আমার সাধ্যাতীত।

প্রশংসাকে হজম করতে সরোজ দত্তরা বোধহয় তপস্যা করেছেন, কিন্তু এঁর কাছে এলে স্তুতি নিন্দা প্রশংসা কোনো কথাই মনে ওঠে না। এ এক আশ্চর্য তুষার মৌলী শুভ্রতা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পুরো নামটি কি সাত নম্বর?

এ. কে. ব্যানার্জি বলেই ডাকবেন, নইলে কেউ চিনবে না।

বাঙালীর ছেলে একটু দুঃখ পেলাম।—তবে একটা নম্বর বসিয়ে নেন না কেন, কাগজ কলম মুখের লেবার কমে যাবে।

এ বিষয়ও তিনি নিরুত্তর। বললেন, আপনি কি 'পরিচয়'-তে লেখেন?

খুব কম। সরোজ দত্তের আমলে একটা বুঝি গল্প লিখেছিলাম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন সম্পাদক তখন অবশ্য তিনি লেখা চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণেই হয়ে ওঠেনি লেখা দেয়া।

সুভাষের নাম করতেই ভদ্রলোক থামলেন।—রিয়েলি সুভাষ ইজ এ পোয়েট। আমি তাঁর কিছু লেখা পড়েছি।

তবে সমকাল সম্বন্ধে আপনার মনোভাব পাল্টান।

সামান্য কটি কবিতায় কথা-সাহিত্যের দায়িত্ব মেটে না। সমাজে কথা-সাহিত্যের প্রভাব গুরুতর। সুদূর প্রসারীও বটে।

আমি একে একে অনেকগুলো আধুনিক উপন্যাসের নাম করলাম। তিনিও পাল্টা জবাব দিলেন। যুক্তিগুলো খণ্ডন করতে পারলাম না সব। যেমন আমার শরীরটা ভাল নয়, তেমনি পেশাও নয় তর্ক করা। বিচিত্র বিশ্লেষণের কাছে হেরে এসে নিজের শয্যায় আশ্রয় নিলাম। বুঝলাম বই পড়ে যাঁর মনে শ্রদ্ধা জন্মেনি, তাঁর মনে যুক্তি দিয়ে শ্রদ্ধা জন্মান কঠিন।

আরো টুকরা টুকরা কথা হল। 'পথের পাঁচালী'কে গুরুত্ব

দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বললেন বড্ড ঝাঁঝ আসে জাঁক্রিস্তফের। 'আরণ্যক' উপন্যাস না হলেও, অনেক পুনরাবৃত্তি থাকলেও, ল্যাণ্ডমার্ক। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আর যাই হক গ্রেট বুক নয়। কারণ ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্বের সীমানা নাকি পার হতে পারেনি। সমাজকে কি দিলে? কতগুলো বিকলাঙ্গ মানসপুত্র শুধু? না, না মানুষের সভ্যতার কৃষ্টির এই Last say নয়। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও দরদের জন্য শরৎ সাহিত্য টিঁকে থাকবে। তারাশঙ্করের 'কবি' নাকি তাঁর ভাল লেগেছে। কিন্তু সে তো ঠিক একালের রচনা নয়। 'রঙরুট' 'সূর্যগ্রাস' 'উত্তরবঙ্গ' 'বাঁদী' 'ফিয়ার্স লেন' ইত্যাদি সম্বন্ধে এঁর মতামত কি জানার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হাউস সার্জন এসে পড়লেন। আর কথা হল না। এবার সব খতিয়ে বুঝলাম ওঁর অপঠিত জিনিস খুব কমই। ওঁর হিসাব শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, মানবিকও বটে। ওঁকে একেবারে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। ওঁর মত সমঝদার পাঠকই বা কজন পাওয়া যায়?

দিন দুই দেখা সাক্ষাৎ নেই। বড় কষ্ট পাচ্ছি শরীরটাকে নিয়ে। ৪।৪।৫৮ সকাল ৬টা-৯টা।

একটা ওষুধ কিনতে হবে। হাউস সার্জন লিখে দিয়েছেন—তিন দিনের ওষুধ। দাম কুড়ি টাকা। কিন্তু খেতে হবে ন দিন, মানে আশি টাকার ধাক্কা। হাতে একটি ফাইল কেনারও টাকা নেই। ভাবছি নানা কথা। ঘুরছি আর ভাবছি—এই আশি টাকার অভাবেই কি হাঁপিয়ে মরতে হবে? উপায় যখন নেই, চুপ করেই থাকতে হবে। দেখা যাক এমনিতেই কমে কিনা! পেনিসিলিনেরও তো রয়েছে কিছু ক্রিয়া। কিন্তু টান ওঠে সময় হলেই। রাত দুপুরের পরই দেখা যায় প্রীতির ঘনঘটা! ডাক্তার আবার নতুন কথা শোনাবেন। হাঁপানির ওপর রয়েছে আমার নাকি ডিউডিনাল আলসার। তাই এত উইণ্ড। তাই এত বুকে পেটে যন্ত্রণা।

আমি ভাবি সোনায় সোহাগা।

টাকার কথা ভাবছি বলে, সমকালের কথা ভুলিনি! দৈহিক যাতনার সঙ্গে আর একটি মানসিক যন্ত্রণার স্ফুলিঙ্গ যোগ হল। সমকালের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, আমার নীরব থাকা উচিত কি?

সাত সম্বর!

আসুন, বসুন। অমন দেখাচ্ছে কেন আপনার মুখ? কোনো উপসর্গ বেড়েছে নাকি?

দেহের কথা জানালাম, মনের কথা বলতে পারলাম না। প্রসঙ্গক্রমে অর্থাভাবের কথাটাও উঠল। শেষ পর্যন্ত নানা জায়গায় কাঁটা ঘুরে সাহিত্য এসেই দাঁড়াল।

এখন 'পরিচয়' কে চালান? সেখানে লেখেন না কেন?

কিছুদিন আগে ননী ভৌমিক চালাতেন। এখন গোপাল হালদার বোধ হয় সম্পাদক।

গোপাল হালদারের কথা উঠতেই তিনি সম্ভ্রমে অধীর হয়ে উঠলেন। বুঝলাম শ্রীহালদারের পাণ্ডিত্য ওঁর ভিতর অনুরণন তুলেছে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনাও করলেন গোপাল হালদারের লেখা নিয়ে। কিন্তু আধুনিক বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর শিল্পীদের কথা কোথায়? এরপর তো আবার হাউস সার্জেন এসে পড়বেন, নয়ত আসবে পেনিসিলিনের প্রাণান্তকারী নিডেল!

হ্যাঁ একটা কথা, আমার এক প্রীতিভাজন তরুণ বন্ধু তখন একটা বড় পোস্টে, সরকারে চাকুরে। হঠাৎ দেখা কিছুদিন আগে। পড়ুয়ে ছেলে, অনেক আলোচনা উত্তেজনা হল সাহিত্য নিয়ে। কাত্ করলে ইদানিংকালের কজন রথী মহারথীকে। কি যে বাজে লিখছেন!

সে তরুণ বন্ধুও আলোচনায় আনলে না অতি বর্তমানকে। ব্যাকুল হয়ে কতই না অপেক্ষা করলাম সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, বরেন বসুর জন্য! এঁদের সূত্র ধরলে তবে তো আমার আশা!

আবার সাত নম্বর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন 'পথের পাঁচালী'তে। এবার বিভূতিভূষণ নয়, আলোচ্য সত্যজিৎ রায়। পুরোপুরি বিকেল চারটা। একটা সমালোচনা সভা বসে গেল হাসপাতালে। এলো পাঁচ নম্বর, দু নম্বর এবং সুবোধকুমার চক্রবর্তী, এক ব্যাঙ্কের কেরানী সারা দিন রাত বই মুখে দিয়েই আছেন। এঁর কাছে তিক্ত কষায় নেই। বলেন, সব জিনিসেরই স্বাদ আছে। তবে চিবিয়ে খাওয়া চাই। ভদ্রলোকের চাউনি একটু বাঁকা, আর মুখে টাস্ টাস্ বুলি।

আমি বেশি কথা বলতে পারছিনে, কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করেই এঁরা আসর জমিয়ে তুললেন। আরো এলেন কজন তরুণ, যাঁরা আছেন পেয়িং বেডে।

এঁদের মুখেও সমকালের কবি কিংবা কথাকারের নাম শুনলাম না। সমস্ত আলোচনাই আবার কেড়ে নিলেন 'পথের পাঁচালী'র বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের ধ্যান, কৃচ্ছ্রসাধনা ধন্য হয়ে উঠল এঁদের মুখে। আমি ভিতরে ভিতরে একটু পুড়লেও গৌরবে অভিভূত হয়ে রইলাম। এই হাসপাতালে বসে দেখলাম অপু-দুর্গার লোভের সুমহান করুণ দৃশ্য—সামান্য ঘণ্টার নিক্বণে বিপুল ব্যঞ্জনা ধ্বনি। দেখলাম ইন্দির ঠাকুরানীর অসামান্য অভিনয়। তার মৃত্যু তো মৃত্যু নয়, এই খণ্ডিত সমস্যা কণ্টকিত বাঙলার বিশ্ববিজয়িনী শিল্পীরূপ। এ প্রতিভা পৃথিবীতে নাকি অদ্বিতীয়। দেখলাম ছেড়ে আসা গৃহের দৃশ্য। ঝড়ে দুর্দিনে আমরা পূর্ববাঙলার অধিবাসীরাও তো গৃহহীন, যাযাবর! আমি নগন্য এক শিল্পী, কি আর করব? সত্যজিৎ রায়কে আরো গভীর করে বুকে এঁকে রাখলাম। দেখলাম আর এক আশ্চর্য দৃশ্য। পুত্রের কীর্তিতে কীর্তিমান পিতা গলদশ্রু! একথা মিথ্যা নয়—দেখেছিলাম মৃত সুকুমার রায়কে জীবন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তুমি বিশ্বাস না করো, ঐ, ঐ চেয়ে

দেখো তিনি ছটার ঘণ্টা বাজা মাত্র দর্শকদের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

আমার স্বপ্ন ভাঙল।

পরদিন আবার সাত নম্বরের সঙ্গে আলাপ রাত আটটার পর। এলেন সুবোধকুমার চক্রবর্তী, সেই টাস্ টাস্ বক্তা। তিনি কতগুলো কাগজের নাম করলেন। এসব জায়গায় লেখেন না কেন?

ঠিক যোগাযোগ হয় না।

হলে তো প্রচার বেশি হত! বোধ হয় পেঁাছে না।

তা হতে পারে।

সুবোধ ব্যঙ্গ করলেন, আজকাল সবাই লেখক! এক মুখ ধেঁায়া ছেড়ে দিলেন সিগ্রেটের। আপনার কি কি বই আছে? দিন তো একখানা। আপনার নাম তো শুনিনি কখনো। তিনি 'পদ্মদীঘির বেদেনী' খানা টেনে নিয়ে গেলেন প্রায় কানে ধরে শেয়ালের মত।

আমি সাত নম্বরকে বললাম, সব কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব। তবে আদৌ কোন মাসিক সাপ্তাহিকে লেখা না বেরুলেও কিছু আসে যায় না। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' চুঁচুড়ার একখানা নিতান্ত অখ্যাত সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল, তা না বেরুবারই সামিল। পাঠক বইখানাকে অসাধারণ আগ্রহে গ্রহণ করেছে। আমার 'চরকাশেম'ও একেবারে পুস্তকাকারে। বাজারে সেইখানাই বেশি পরিচিত আমার লেখার মধ্যে। যাক আমার লেখা একখানা বই পড়বেন?

'চরকাশেম'?

না। 'চরকাশেম' আউট অফ প্রিণ্ট—এক কপিও হাতে নেই। আছে 'কনকপুরের কবি'। এখানাও মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের কাহিনী। আর আছে 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'। ছ নম্বর পড়ছেন।

কথাগুলো যেন সাত নম্বরের খুব পছন্দ হল না।

কদিন বাদে সাত নম্বরই কাছে এলেন। 'কনকপুরের কবি' প'ড়ে এবং বন্ধু বান্ধবদের পড়িয়ে আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। —ক্ষমা করবেন, আপনি যে এত বড় দায়িত্বশীল শিল্পী তা আমার জানা ছিল না। একালের মার্কসিজমকে চিরকালের ফ্রেমে ধরেছেন।

৪।৪।৫৮ বিকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা।

তা ছাড়া 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' খানাও দুনম্বরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়েছি। ওখানা হচ্ছে সমকালের ঐতিহাসিক দলিল —more realistic. নিজে পার্টিশানের শিকার হয়ে কি করে যে অমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বই লিখলেন! আর একটা কথা, ঐ যে সুবোধকুমার চক্রবর্তী তিনি তো আপনার 'পদ্মদীঘির বেদেনী' পড়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত। তাঁর এ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে, নাক মুখ দিয়ে পেট পর্যন্ত দিয়েছে রবারের নল চালিয়ে, ওগুলো খুলে নিলেই তিনি আসবেন আপনার কাছে। আমার অবশ্যি খুব ভাল লাগেনি 'পদ্মদীঘির বেদেনী'। কিন্তু উনি বলছিলেন যে আপনার বাবা নাকি সার্থক নামটি রেখেছিলেন অমরেন্দ্র।

সুখে দুঃখে নিন্দা স্তুতিতে নাকি সমভাব থাকতে হয়। কিন্তু আমি তা তখন পারলাম না। আমার যাবতীয় প্রশংসা আজ হজম করা উচিত ছিল সরোজ দত্তদের মত, তা হল না। ভিতরে ভিতরে বেশ বিচলিত হলাম। হঠাৎ যেন রামপরায়ণের কণ্ঠ শুনতে পেলাম নেপথ্যে—ঈথারে বুঝি, 'কনকপুরের কবি' তোর স্বীকৃতি অবশ্য হবে।

আমি স্তুতিতে বিচলিত হয়েছি, মানুষের মাপকাঠিতে অনেকখানি নেবে গেছি, কিন্তু তবু আজ ক্ষমার্হ, সমকালকে তো বাঁচালাম মিথ্যা মামলার দায় থেকে।

॥ বারো ॥

ভিজিটিং আওয়ার। স্ত্রী বসে, আমি রয়েছি বেডে শুয়ে। শরীরটা তেমন ভাল নয়। মনটাও খারাপ। কুড়ি টাকা দামের ওষুধটা কেনা হয়েছে। কিন্তু একটা ট্যাবলেট খাইয়েই বন্ধ। ওটা নাকি সইবে না আমার। আপসোস হচ্ছে ভিক্ষার টাকা এমনি দণ্ড হল এক্সপেরিমেন্ট-এ!

স্ত্রী বললেন, এখন সবই তো আমাদের লোকসান। ওটাকে আলাদা করে দেখছ কেন? ভাল হয়ে ওঠো দেখবে এই সবই আবার লাভ। এবং তুমি যে ভাল হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

বলতে পারিনে। এখন তোমার শাঁখা সিঁদুরের জোর।

৫।৪।৫৮ সকাল ৬টা-৯টা।

আরো একটা জোর আছে। নিজে বলো আবার নিজেই ভুলে যাও। বহুলোকের ইচ্ছায় যদি একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, তবে সেই বহু মানুষের শুভেচ্ছায় একজন ভাল হবে না কেন?

কথাটা শুনে মনটা যেন জ্বলে উঠল। সমস্ত দুর্বলতা গেল অন্ধকারের মত সরে। ভাবতে লাগলাম, কত দূর ও নিকট থেকে যে শুভ কুশলের বার্তা এসেছে! এত শুভেচ্ছা বৃথা নয়। একটু চুপ করে থাকি। মনে পড়ে 'শতাব্দী' 'কূরপালা' "'কাজলের' কথা। তারপরই রমেশচন্দ্র সেনের মুখ। একটি চোখে দৈবের কশাঘাত। তাই বুঝি অন্তরের চোখে অনির্বাণ দরদের চিঠি। সাহিত্য সেবক সমিতির তিনি নাকি কেউ নন—অথচ এই দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরে মূলাধারে রয়েছেন। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত কারুর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না আমার জন্য কাগজে কাগজে

ভিক্ষার থলি পাতা। কেনই যেন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার কথা। 'প্রভু বুদ্ধের লাগি'…।

যুগ পালটে গেছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে নিঃশব্দে। আমাকে তোমরা ঈশ্বরের অংশ বলতে পারো, বুদ্ধের পদরেণুর মহিমা আমাতে এসে কিছুতেই পৌঁছায়নি। কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার সংস্কার ভোলেনি আজো।

কথাটা একটু বাদে আরো যাচাই হয়ে যায়।

স্ত্রীকে বললাম, জবানবন্দি লিখছি কেন জানো?

তা তো সুরুতেই বলে দিয়েছি—আমি ভেলা তুমি যাত্রী…আমি আর্শি তুমি আলো।

সবটা বলা হয়নি। বাকীটা শোনো।

আর বলা হল না। জন দশেক ছেলে মেয়ে প্রৌঢ় যুবা এলেন 'সাহিত্য সংস্থার' পক্ষ থেকে। হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ ও মালা। স্ত্রী চেয়ার ছেড়ে সরে গেলেন একপাশে। ফুলের গন্ধে যেন হাসপাতালের গন্ধ পালটে গেল। বুঝলাম এ সাহিত্য সেবক সমিতিরই প্রেরণা।

আমি বুক ভবে নিশ্বাস টেনে উঠে বসলাম। কতদিন যে এ ফুল দেখেনি! শুধু বেলেডোনা, এ্যাজম.র সিরাপ, আর ট্রিপেল্-কার্বের গন্ধ।

একটি মেয়ে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিল।

বৃদ্ধ বললেন, সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা আপনার আরোগ্য কামনা করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি। হে কথা-শিল্পী আপনি এ সামান্য সংগ্রহ গ্রহণ করে ধন্য করুন।

আমি অভিভূত হয়ে হাত পাতলাম।

কে একজন যেন মন্তব্য করলেন, ওঁর বই আমি পড়েছি। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মুখে শুনিয়েছেন শান্তির ললিত বাণী। উনি অমর হয়ে থাকবেন সাহিত্যে।

ছুটা বেজে গেছে। সবাই বুঝি চলে গেছে একে একে।

চেয়ে দেখি স্ত্রী এককোণে দাঁড়িয়ে তখনো চোখ মুছছেন। আমি আমার গৌরবের মালা তাঁর হাতে তুলে দিতে গিয়ে দেখি বড় জামাই যেন কখন এসেছে। বড় জামাইয়ের হাতে মালাটা দিয়ে বলি, হেনাকে দিও।

স্ত্রী ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। আজ হঠাৎ মনে হল, এই কি আমার কাব্যলক্ষ্মী? আজো তো মালা পরান হল না!
৫।৪।৫৮ বিকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা।

যতদিন যায়, তত পরিচয়ের নিবিড়তা বাড়ে। রোজই আমরা মিটিং বসাই রাত আটটার পর লম্বা বারান্দায়। যতক্ষণ আমি না আসি, ততক্ষণ মাঝখানের চেয়ারটা থাকে খালি। খাওয়া দাওয়া ওষুধের প্যারেড শেষ হয়ে গেছে, আলো নেভা না পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা যা খোসগল্প। পরস্পরের কুশল প্রশ্ন। হাসি ঠাট্টা কিছু ইয়ার্কি ফাজলামি।

আমি হিসাব রাখি।

ডিউডিনাল এবং গ্যাসস্ট্রিক আলসারের রোগীই সংখ্যায় বেশি। ছু চারটি এ্যানিমিয়ার কেস। এক আধটি লিভারের রোগী। হাঁপানির রোগীও আছেন আমার মত তিনটি।

আপনাকে দেখতে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে কে কে এসেছেন?

সস্ত্রীক মনোজ বসু। সেদিন যখন অক্সিজেন দিচ্ছিল, তখন ছু জনে এলেন। স্বামী স্ত্রীর চোখে যেন 'ভুলি নাই' বাণী। আমি সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মনোজদা তখন এই হাসপাতালের এক ক্যাবিনে ছিলেন ক'দিন চিকিৎসার জন্য।

তাই নাকি? আমরা টের পেলাম না। ওঁর কত বই পড়েছি।

'সোবিয়েতের দেশে দেশে' 'নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ' একবার পড়তে সুরু করলে শেষ না করে ওঠার উপায় নেই।

পিছন থেকে একটি ক্ষুব্ধ মন্তব্য শোনা যায়। আপনার জানান উচিত ছিল ষোলনম্বর।

আমি বলি, আমার অপরাধ নেবেন না—তখনকার আমার অবস্থা বলে বোঝাতে পারব না।

কৈফিয়ৎ দিলাম বটে, কিন্তু যেন ক্ষোভ মিটাতে পারলাম না। তবু বললাম, মনোজদার খ্যাতি তো সরব, একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

এবার একজন বোকার মত প্রশ্ন করে, সরব মানে কি?

আমি একটু বিরক্ত হয়ে জটিলতার আশ্রয় নিই। বলি, তা হলে 'জল জঙ্গল' ঘুরে আসতে হবে নায়ে চড়ে, অথবা পায় হেঁটে, অনেক পাঁক মাটি গায় লাগবে—খেতে হবে বহুৎ কাঁটার খোঁচা! তারপর 'শত্রু পক্ষের মেয়ে'-কে বশ করে, সাজাতে হবে কিংশুক কুঙ্কুম-য়ে। পড়তে হবে 'চীন দেখে এলাম'—বুঝলে?

ছোটবেলা চোখের জন্য তেমন পড়াশুনা করতে পারিনি, বড় হয়ে লিভার। শুধু মনোজ বসুর নয়, কত লেখকের কত বইয়ের নামই তো শুনেছি, কিন্তু আমার পক্ষে কি এ সব পড়া সম্ভব হবে কোনো দিন? কতদিন বাঁচব জানিনে, কেবল ধুঁকতেই বুঝি আমরা এসেছিলাম।...একটা নিঃশ্বাস পড়ে আমার গায় এসে। মনোজদারা কখনো জানবেন না। আমি আহত হলাম, শিক্ষা পেলাম। তাই রেখে যাচ্ছি এক রুগ্ন হতভাগ্য যুবকের স্মৃতি। এর আকুতি থেকে অনেক বড় স্বীকৃতি বোধহয় তাঁরা খুব বেশি পাননি।

ছেলেটিকে বলি, অত অধীর হয়ো না ভাই, সবই পারবে—টাইম ইজ দি বেস্ট হিলার।

আর কে এসেছিলেন?

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—'ইরাবতী' দিয়ে ওঁর প্রথম পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে।

আর?

৬।৪।৫৮ সকাল ৬টা-৯টা।

তরুণ কবি দুর্গাদাস সরকার, যাঁর অজস্র পরিচিতি। হেন কাগজ নেই, যাতে না দুর্গা লিখেছে! গল্পকার হরেন ঘোষও এসেছিল দুর্গার সঙ্গে। আর প্রিয়ভাষী অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়। একবার আলাপ করলে ওর স্বভাবের মাধুর্য ভোলা অসম্ভব। খুব স্থিতধী। ভবিষ্যৎ চকচকে।

৭।৪।৫৮ সকাল ৮টা-৯টা।

এত যে প্রশংসা করলেন? তিনি লেখেন নাকি?

ওর কাছে প্রিয়ভাষা শেখার আমারও অবকাশ রয়েছে। এখনো লেখা শুরু করেনি। তবে লিখলে সে অক্ষম রচনা কখনো লিখবে না!

আর কে এসেছিলেন?

আর না এসে, এসেছিলেন সজনীকান্ত দাস। নিজে গুরুতর অসুস্থ। ছেলে রঞ্জনের মাধ্যমে এসেছিলেন আশীর্বাদ নিয়ে।

অনেকে কথাটা বুঝল, অনেকে আবার বুঝল না। কথা গেল রোগের দিকে ঘুরে। কেউ কপর্দকশূন্য, কেউ ভাল চাকুরি করেন। এখানে সম্যক যেন একটা সমাজের ছবি পেলাম আমি। চুপ করে আমি যেন নাড়ী ধরে বসে রইলাম। দেখলাম আমার চেয়ে নৈরাশ্যের বিটই যেন বেশি। আমার চাইতে বয়সে অনেকেই ছোট। সবে কেউ সংসার সুরু করেছেন, কাউর বা একান্তই কাঁচা বয়েস। কেউ বা অল্পতেই বেশ জড়িয়ে পড়েছেন। তবে কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করলে এই জলস্রোতের মত প্রবহমান জনতাই রোগী? গভীর রাত্রে আবার সব মুখগুলো মনে পড়ে। দু একটা বেদনার আর্তি শুনতে পাই। ভাবি এ সভ্যতা আমাদের

দিলে কি? আরও দু একজনকে আমি আশা করেছিলাম রোগ-শয্যায় পথ চেয়ে। যাঁদের আশা করেছিলাম তাঁরা সামাজিক ক্ষমতায় পদমর্যাদায় প্রায় চূড়া স্পর্শ করে আছেন। আমার এ দুর্বলতার কথা কাউকে জানাবার নয়, তাই জানাইনি হাসপাতালের রুগ্ন বন্ধুদের—এমনকি স্ত্রীকে পর্যন্ত! আমার জীবনের ঠিকানা বদল হতে চলেছে, যত তুচ্ছতম ঘটনাই হক, একথা কি এই দেশের কোনো কথাই নয়? শুকনা চোখে জল আসেনি, কিন্তু বুক হয়েছিল যন্ত্রণায় উদ্বেলিত। চেয়েছিলাম একটু নির্ভয়, একটু সহানুভূতি, কিন্তু তা ভাগ্যে জোটেনি।

তবু পথ চেয়ে বসেছিলাম। ধ্যান করেছি মনে মনে হয়ত। ত্রুটি রয়ে গেছে আমার ধ্যানে। তাই হয়ত তাঁরা সাড়া দেননি।

এখনো আমি তেমন সুস্থ হইনি। এখনো আমার আদৌ শঙ্কা কাটেনি ঠিকানা বদলের। যদি চোখ বুজি তখন না হয় দেখা পাবো। এবার অশ্রু এলো, সেই জলের দাগে এ মিনতি রেখে যাই।

লিখেই প্রশ্ন এলো কেন এ অহেতুক অনুযোগ কতিপয়ের বিরুদ্ধে? না হয় সংবাদ-পত্রেই সংবাদ বেরিয়েছে, কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়েছে নানা সাহিত্য-মণ্ডলে আমার অসুস্থতা নিয়ে, কিন্তু সে কথা এমন কি বড় কথা যে সকলের দৃষ্টি এবং শ্রুতি আকর্ষণ করবে? আমি তো সরাসরি চিঠি লিখেও তাঁদের কাউকে আসতে অনুরোধ জানাইনি। অসম্ভব নয় কেউ হয়ত অসুস্থ, কেউ বা নানা দায়িত্বে ব্যস্ত।

একদিন এমনি একটা পরিস্থিতির বোধহয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তীক্ষ্ণধী অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই যে হৃদয়াবেগের আকুতি, এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। এতটা উঁচুনিচু থাকা তো কারুরই কাম্য নয়।

কথাটা মনে আসতেই নিবে গেলাম একেবারে। সমস্ত অনু-

যোগের জাল নিলাম বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে গুটিয়ে। তবু অনেক ভেবে জবানবন্দি কাটা গেল না। কারণ এ জবানবন্দি তো একই অসাম্য পরিস্থিতিতে লেখা। তবে ভবিষ্যতের হাতে শুদ্ধ করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে গেলাম—যখন শিল্পীর কাছে, শিল্পীর তুচ্ছ পথ্য পানীয় ওষুধ, এতটুকু পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য কান্না নেই, নেই ক্ষুধার লড়াই।

কিন্তু অমরেন্দ্রের কি মান মর্যাদা ক্ষমতায় চূড়া স্পর্শ করা দুরাশা নয় এ সমাজে? দু একটা ব্যতিক্রমের ক্ষীণ নজির যদিও বা থাকে, সেই তথ্যই কি আসল তথ্য? শুধু প্রতিভা কিছুতেই শ্রদ্ধার্হ নয়, যদি না পায় ইতিহাস এবং পরিবেশের মিড় গমক মূর্ছনা। বিপুল বাদ্য সম্ভার ব্যতীত শুধু বিয়ে বিয়ে নয় কি—এই যেমন হয়েছে ও হচ্ছে ওপাড়ার পদী-ক্ষেন্তির। এখন যত নম্বরই তুমি আমি পাই না কেন পরীক্ষায়, তোপ দাগানো স্বপ্ন কথা, একটা পটকা ফোটাবারও বন্ধু নেই। এ আলোচনার সূত্র হয়ত পরে আরো আসবে অন্য প্রসঙ্গে। সাহিত্য চিন্তার জন্য খেই রেখে যাচ্ছি নতুন আলোক সম্পাতের। আমার আর কোনো অনুযোগ নেই।

চিত্ত শুদ্ধি করেছি, আবার হাসপাতালের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। একটি স্টাফ দিদিকে দেখেছি কথায় কথায় ছোট নার্স ভগ্নীদের ওপর ফায়ার। পরক্ষণেই মুখে মিছরি হাসি। এ কেবল ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরে গঞ্জনা দেয়া নয়, নতুনদের কাজ শিখাবার একটা পদ্ধতি।

আর একজনকে দেখেছি বড্ড প্র্যাকটিক্যাল। কাজের কথা ছাড়া যেন অন্য কথা জানতেন না। আপনি সারাদিন বেডপ্যান ব্যবহার করবেন। দেখুন পাঁচ নম্বর কাল সকালে কিছু খাবেন না। কতবার যে ইনি স্টুল ইউরিনের তদারকে জমাদারকে নিয়ে যেতেন! রোগা কালো মেয়ে। সমস্ত স্থুল মাংস পেশী শুকিয়ে যেন সেবা-ধর্মের ক্ষীরটুকু হয়ে রয়েছেন।

সেদিন রজনীগন্ধার গুচ্ছটা এঁকেই দিয়েছিলাম। তখন ইনিই ছিলেন ডিউটিতে। নামটি মিস রয়, না রাই তা আজ স্মরণ নেই।

প্রায় একটা মাস কেটেছে হাসপাতালে। রোগ ধরা পড়ল, চেষ্টা যত্নও হল অনেক। কিন্তু ক্ষতির বিরাম নেই। এবার উপদেশ নির্দেশ নিয়ে ছুটির পালা। 'ট্রপিক্যালের' আর নাকি কিছু করণীয় নেই। বাড়ি গিয়ে ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা এবার।

ছুটির দিনে সমস্ত মুখগুলোই এসে দাঁড়ায় কাছে। থমথমে নির্বাক। কেউ ঠিকানা নিল, কেউ দিল। বললে যোগাযোগ রাখতে। আমি জানি তা কখনো সম্ভব নয়। এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও নিয়ে যে কতবার চলার পথে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। আমি সবই জানি। তবু মনে মনে বলি, আজ এদের রোগ বালাই নিয়ে যেন বিদায় হতে পারি!

৮।৪।৫৮—সকাল ৭-৮টা

আজ আর স্ত্রী আসেননি। ঘড়ির কাঁটা চারটার ওপর ঘুরতেই শচীন ঠাকুরতা এসে হাজির। এই একমাস সে যেন নতুন একটা চাকরিতে ঢুকেছে। ডিউটিতে একমিনিট লেট নেই। ভারি স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বলে, চলুন।

আমি বলি, দাঁড়াও একটু। আর একবার সবাইকে দেখে নিই।

॥ তের ॥

সেদিন স্ত্রীর কাছে বলা হয়নি, জবানবন্দি লেখার আর একটা কারণ। স্থরু করেও শেষ করতে পারিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে খুব নিয়ম মত চলছি, মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি বটে, তবু ডানা মেলার শক্তি হয়নি। শুয়ে বসেই দিন কাটাই। আর পাতা উলটে দেখি জবানবন্দির পাণ্ডুলিপি। এই দীর্ঘ একমাস লেখা বন্ধ গেছে। আবার হাত ও মনকে নিয়ে কসরৎ করতে হবে সাংঘাতিক। মন

অল্পতেই বাগে আসবে হয়ত, কিন্তু বশ্যতা মানতে চাইবে না. ডান হাতের কব্জি, সে আমার ভাগ্যের মতই নিষ্ঠুর। তবে আমিও সহজ দাহ্য নয় যে একটুতেই গলে যাবো। ওজন কমছে? কমুক। ওষুধ পত্রে তেমন কাজ হচ্ছে না? না হক। আর কিছু না জানলেও এ সত্যটা জেনেছি, জীবনটাই রুল অফ থ্রি নয়। মানুষ সহজেই মরে, আবার টাইম বোমার আওতা থেকেও রেহাই পায়। অন্ধকারের যেমন আশংকা আছে, তেমনি দেখা যেতে পারে, ঝ'ড়ো সমুদ্রে নিশানি আলো। জীবন কখনো বাঁধা ধরা ছকে পড়ে না। তবে সংগ্রামে বিশ্বাসী থাকা চাই। সাময়িক দুর্বলতা ঢেউ ওঠা-নামার শুধু খাদ।

৮।৪।৫৮—বৈকাল ৩-৬টা

এখানে আর একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে। তথ্য থেকেই তো আমাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে। তার ওপর ভিত্তি করেই তো আমাদের চলতে হবে পথ। যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন, যতদূর সম্ভব আমি বাছা বাছা জিনিস খেয়েছি—যার ফুড ভ্যালু অত্যন্ত। যখন পুরো অবস্থা ছিল তখনকার কথা বাদ দিলেও আমার একার জন্য সম্ভব মত সংগ্রহ হয়েছে মাছ ডিম মাংস দুধ। পূর্ব বাঙলার প্রকৃতি ছিল সম্পদবহুলা। আমার ছেলে মেয়েরও খাদ্য প্রাণের তেমন অভাব হয়নি। শুধু বঞ্চিত হয়েছেন স্ত্রী। দিয়ে থুয়ে বড় সংসারের গৃহিণীর ভাগে কখনো জুটেছে শুধু শাক অন্ন, নইলে ভাতের সঙ্গে লঙ্কা নুন। কখনো ভাতই কম, একটা কিছু সিদ্ধ-পোড়া দিয়ে সে বেলাটা কেটেছে। এমনি একদিন নয়, একমাসও নয়—বছরের পর বছর। তবু তিনি স্বাস্থ্যের সর্বশ্রী। আবার বলছি জীবন কখনো বাঁধা-ধরা পথে চলে না, এই তেত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে, উনি লাভ, আমি ক্ষতি। উনি পুঁজি, আমি ব্যয়। তবু ব্যালেন্স-সিটে কিছু মুনাফা রয়ে গেছে, সে হিসাব পাঠকের জন্য তোলা থাক।

স্ত্রী ওষুধ মিশিয়ে দুধের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, খেয়ে নাও। ওকি, এর মধ্যে লেখা সুরু করেছ! ভালো। কিন্তু দু'দিন বিশ্রাম করে সুরু করলেই কি খুব ভাল হতো না?

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ তো একটানা বিশ্রাম করেছি, আর কি চাও? ভবিষ্যতের আশায় আর আমি বর্তমানকে নষ্ট করতে পারিনে। ভিতর থেকে তাগিদ এসেছে, এই বায়ান্ন বছর আমি এ সমাজের যা খেয়েছি তার হিসেব-নিকেশ দিতে হবে টাকা আনা গণ্ডা পাইর, অন্ন দাস হয়ে আলস্য করা চলে না, আমার আর ছুটি নেই।

স্ত্রী বলেন, তবে লেখো, কিন্তু বেশী পরিশ্রম করো না।

কি আর পরিশ্রম! বারান্দায় শুয়ে শুয়েই কল্পনার পাখা মেলে দিই, কল্পনা বলা ভুল হল—স্মৃতির ডানা দু'খানা। মেঘে মেঘে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, এই সন্ধ্যাব আকাশ ছাড়িয়ে মধ্যদিনের অনেক দিন। তারপর যৌবনের সকাল। নিটোল গঠিত স্বাস্থ্য, সত্য প্রেম পবিত্রতার দিন। বয়স তখন অনুমান ষোল সতের। পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূবের আকাশে ফিরে এসেছি। তেরশ' একত্রিশ কি বত্রিশ। পুরো রোমান্টিক যুগ। কবি এবং কাব্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চলন-বলন সাজ-সজ্জারও অক্ষম অনুকরণ চলছে। এই যুগেই জন্মেছিল পরশুরামের কলমে লালিমা পাল (পুং)।

৯।৪'৫৮ সকাল ৯-১১ টা

রবীন্দ্রনাথ আমার ভাব-গুরু। এই সময় তাঁর 'শিশু' কবিতার বইখানা আমার হাতে আসে। মনে হয়, এমন কবিতা বুঝি আমিও লিখতে পারি। একলব্যের মত দ্রোণাচার্যকে ধ্যান করতে লাগলাম। ভিতরে ভিতরে প্রেরণা বহ্নিমান হয়ে উঠল। বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে। দেখলাম মহৎ কথা সহজ কথায় লেখা বড় সুকঠিন, তখন আবার ছন্দ মিলতির যুগ। রাতারাতি প্রতিভা হওয়া অসম্ভব। কবিতা লিখতে হলে তার ব্যাকরণ জানা চাই।

কিন্তু কার কাছে শিখি?

রবীন্দ্রনাথ মধ্যমণি, তাঁর চারপাশে অনেক গ্রহ উপগ্রহ। অচিন্ত্য বুদ্ধ প্রেমেন ঘুরছে পাশাপাশি, নজরুল জিঞ্জির বাজাচ্ছে খানিকটা দূরে, কখনো বিপ্লবী, কখনো বুলবুল। মোহিতলাল আছেন সদম্ভে। ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ইতিপূর্বে ব্যস্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর আছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নবাগত দুঃখবাদী বটেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষুরে শান পালিশ। অনেক কথা, অনেক কবিতা লিখে জীবনানন্দ যা করতে না পেরেছেন, শ্রীসেনগুপ্ত ইতঃমধ্যেই তা করেছেন। যতীন বাগচি, করুণানিধান, কুমুদ মল্লিক তখন উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবের পূর্ণ মহিমায় রয়েছেন কালিদাস রায়।

নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার।

এঁদের ডিঙিয়ে কি করে শান্তিনিকেতনে যাবো? আর যাবো কি নিয়ে? একটাও তো কবিতা লিখিনি।

আবার ধ্যানে বসলাম। লেখাপড়া ছাড়লাম একেবারে। কলেজে শুধু যাই আসি, আর আড্ডা। মনে মনে নিজের তরফে একটা যুক্তি খাড়া করেছি, বিরাট প্রতিভার পক্ষে এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন, ডিসকোয়ালিফিকেশন।

সাউথ সুবার্বন কলেজে একটি বন্ধু জুটেছিল চমৎকার। মাস্টার ব্যানার্জি। আমরা ডাকি ক্যাপটেন হ্যারি। সর্ব বিদ্যাবিশারদ, এই যেমন—কলেজ কামাই, কিন্তু পুরো পার্সেনটেজ, পরীক্ষায় টুকলিফাই, প্রশ্ন আউট। তার চিন্তা ভাবনা মৌলিক। আমাদের মধ্যে সে যেন প্রগতির অগ্রদূত। বাপের পয়সা ছিল প্রচুর। সিগ্রেট খাওয়াত, খেত দামী দামী।

তখনকার হাজরা পার্কটা এখন একটু ছোট হয়েছে। নাম বদলে কলেজটা এসেছে ও-ফুটপাথ থেকে এপারে। পাশ দিয়ে যখনই যাই, তখনি ভাবি—আজ যারা কলরব করছে তাদের মত

একদিন আমরাও তো তরুণ ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে কাকে ডেকে উঠেছে জানিনে, কতদিন চমকে উঠেছি আমি। কিন্তু প্রাক্তনকে আজ পর্যন্ত কেউ ডাকেনি।

হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কি তুই বেশী মূল্য দিস?

সে জবাব দিয়েছিল, রাইটো ইউ আর। এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ইজ এ ডিস-কোয়ালিফিকেশন। লেখাপড়া শিখে গোর্কি রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।

এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি অসুবিধাটা।

১০।৪।৫৮ সকাল—৬-৯টা।

আর একটি বন্ধু জুটেছিল তখন—নাম নৃপেন্দ্র ব্যানার্জি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। খাস শহুরে ছেলে। জব্বর আড্ডা-বাজ। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার। সে এম. এ. না বি. এস-সি. পাশ করে এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। হ্যারি যুদ্ধের চাকরি করেছে, কিছুদিন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সিনেমার ডিরেক্টর প্রযোজক হওয়ার স্বপ্নে স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বেচেছে। ইদানীং নাকি চালান দিতে চেষ্টা করছে গরু মোষের হাড়। সে এখন কোথায় যেন দেহাতে বন জঙ্গল নয়ত রৌদ্রদগ্ধ মাঠে পড়ে।

আমি উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে উইংগে ইন্‌সোমনিয়ায় হাঁপাচ্ছি। ডাক্তার বন্ধু প্রফুল্লকুমার চৌধুরী যা আমার মনস্তত্ত্ব ঘেঁটে ঠাট্টা করে বলেন, এ আর কিছু নয় গোর্কি হওয়ার এ্যাংগজাইটি!

সময় সময় ভাবি এম. এ., বি. এ. পাস করে একটি সুস্থ শান্ত জীবন কাটালে মন্দ হত কি? দৈনন্দিন অর্থাভাব নেই। নামকরা পাঠ্য বই লিখিয়ে, নয়ত অফিসার।

রামপরায়ণ বলে, সবই হত—কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে 'চর নয়ত দুধের সর' এ কথাটা কে লিখত কবি? 'চরকাশেম' হাতে

না পড়লে লীলা রায়ই বা কোন্ প্রসঙ্গে তোর সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন, 'His return is an event'?

আমি ভাবি, তবে কি হ্যারির কথাই ঠিক?

জীবন ছকবাঁধা পথে চলে না।

হয়ত আবিষ্কার হতে পারে স্ট্রেপটোমাইসিন, ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌সনের মত ফলপ্রদ ওষুধ। মানুষের শুভ বুদ্ধি বসে নেই। তখন দিব্যি আমি নিরোগী। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের খাদে ডুবে যাই, আবার চূড়ায় ভেসে উঠি। এমনি করেই আমি একখানার পর একখানা উপন্যাস লিখে এসেছি। আমার ভিতর তেমন কোনো সেল্‌ফ-কনট্রাডিকশন নেই। অনুবীক্ষণে একান্ত কিছু কালো দেখালেও তা নগন্য। সংঘাতের ভিতরই এগিয়ে চলার ছন্দ। অথচ বর্তমানের গুরুত্ব কখনো কমিয়ে দেখিনি। তাই বুঝি বারবার ভেসে উঠেছি। উদ্‌বুদ্ধ করেছি, জাগ্রত করেছি তোমায়। এবার জীবন-পঞ্জীর মূল সত্য দিয়ে, পথিক আমি পথচিহ্ন রেখে যাবো। যদি ভালবাসো, এই পথে এগিয়ে এসো। তখন আমি বেঁচে রইলাম, কি নেই, সে প্রশ্ন অবান্তর। কাল এবং যুগের ব্যবধান এড়িয়ে এ পথচিহ্ন ধূলার বুকে রইবে। যদি চিরসত্য হয় প্রীতি-ভরে এই পথে এগিয়ে এসো।

১০।৪।৫৮ বৈকাল—৩-৫টা।

শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল না, রবীন্দ্রনাথকে দেখা হল না, সুযোগ হল না কবিতা লেখার ব্যাকরণ শেখার। আবার সাধনায় বসলাম ভাব-গুরুর ছবি মনে এঁকে। এবার কিছু কবিতা লেখা হল। তার উদাহরণ না দেওয়াই ভাল। কিন্তু মন টৈটম্বুর। বন্ধু মহলে পড়ে হাততালি পেলাম। হ্যারি বোধহয় একটা গাধার টুপিতে কবি লিখে শিরোপা দিলে আমায়। সেই থেকেই কবি আখ্যা। কখনো কখনো কপি। আজকার মত স্বপক্ষ বিপক্ষ দাঁড়াল তখন। ফলে কলেজমহলে প্রতিষ্ঠা। ছাত্রমহল থেকে

গোপন অনুরোধ। বন্ধু-বান্ধবদের বায়না এড়ান দায়। কত যে প্রেমপত্রের মুশাবিদা করে দিয়েছি আমি! না বললে আর রক্ষা নেই। কান ধরে টেনে নিয়ে এসেছে হাজরা পার্কের কোনায়। এবার জ্বলন্ত সিগ্রেটের ছ্যাঁকা। অনেক দুঃখে সাহিত্যিক হয়েছি আমি।

একজন রাইভেল জুটে গেল কলেজে,—সহপাঠী। সেও কবিতা লেখে। প্রাণতোষ দাশগুপ্ত, ডাক নাম নীতু। নিশ্চয়ই সে ভাল কবিতা লেখে। কারণ তার ঐতিহ্য রয়েছে একটা মহৎ —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সে নাকি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে।

ধীরে ধীরে টের পেলাম শুধু কবিতা নয়, গল্পেও সে নাকি হাত পাকিয়েছে। এবার আর জ্বলুনি চাপতে পারলাম না। বন্ধুমহলে এই নবাগত শিল্পীসত্তার খ্যাতি শুনলে মনে মনে কানে আঙ্গুল দিতাম।

আজ টুকিটাকি স্মরণ নেই কি করে যেন নিবিড় হলাম অল্পতেই।

১১।৪।৫৮ সকাল—৬-৯টা।

ছেলেটি শান্তশিষ্ট সুন্দর। আলাপ হওয়া মাত্র হোহো হাসি। ভিতরে অনেক পারিবারিক যন্ত্রণা ছিল, তা জানতে পারলাম কিছু ঘনিষ্ঠতা বাড়লে। বুঝলাম হাসি দিয়েই সে ব্যথা ঢেকে চলে। কিন্তু পরীক্ষার ফি দাখিলের সময় অর্থাভাব ঢাকা যায় না। মাঝে মাঝে যৎসামান্য সাহায্য করেছি। পরবর্তী কালে সে আমার জীবন পরীক্ষায় সুদে আসলে শোধ করে দিয়েছে, যখন নোঙরহীন নৌকার মত ভেসে এসেছি কলকাতায় সপরিবারে পার্টিশনের ধাক্কায়। কোথায় আমার তখন কুস্তিলড়া পেস্তাবাদাম খাওয়া চেহারা! ছত্রিশ ইঞ্চি বুক! তবু আমায় সে চিনেছে—কিরে কবি? আমার পরনে ছেঁড়া শার্ট ও ধুতি, ওর পরনে ইস্তিরি দোরস্ত গরম কোট ও প্যাণ্ট—একেবারে যেন যাত্রার দলের সাজ বদল। তবু

নীতুর ভুল হয়নি। অনেক দিন বাদে দেখলাম আবার সেই হাসি। একটু আলাপে বুঝলাম, তার পারিবারিক যন্ত্রণা এখনো জটিল। স্ত্রী পুত্রের দিক দিয়ে নয়, সমস্যা হয়ে রয়েছে অক্ষম আত্মীয়-স্বজন। ১২।৪।৫৮ সকাল—৯-১১টা।

নীতুর সঙ্গে একদিন কলেজের পর অচিন্ত্যকুমারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। অচিন্ত্য বাড়ি নেই। টেবিলে 'পাক্কা' মার্কা মূল্যবান রাইটিং প্যাডে মুক্তাক্ষর—'বেদে'র পাণ্ডুলিপি। ভাল করে দেখলাম মুক্তার মত লেখা নয়—অপরিসীম বৈশিষ্ট্য এবং পরিশ্রমে যেন প্রতিটি হরফ সাজান। সাদা কাগজে ঝক ঝকে কতগুলো অক্ষর। মুক্তা নয়, কিন্তু মুক্তি পেয়েছে এক ভবিষ্যতে। আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা দেখেছি, এখন তা বাঙলা সাহিত্য দেখছে পরম বিস্ময়ে। 'বেদে' এবং 'কাকজ্যোৎস্না' তলিয়ে গেছে অতলান্ত সাধনায়। অচিন্ত্যকুমারের অধিবাস 'কল্লোল যুগে' কিন্তু পূর্ণ জাগৃতি 'শ্রীশ্রীপরমপুরুষে'। প্রথম খণ্ডটি তুমি হাতে ছোঁয়া মাত্র অবাক হয়ে ভাববে, কি তিল তিল তপস্যায় এর বাক্য বিন্যাস, অলংকরণ কাব্যময় অর্থের বিভূতি। অচিন্ত্যকুমারের যশোদীপ্তি সেদিন দেখেছিলাম অক্ষরে লুকান, আজ দিকমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। ভাষায় ভাবনায় ব্রহ্ম মহিমা। এত বড় নৈষ্ঠিক শিল্পী কল্লোল যুগে দ্বিতীয় কেউ বুঝি নেই।

তবু আমি বলে রাখছি আমার ভিতর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তেমন কোনো মোহ নেই।

একদিন এই অচিন্ত্যই আমাকে ছন্দের তালমাত্রা শিখিয়ে দিলেন। শুধু কবিতার নয়, গদ্যের। এই অচিন্ত্যই আমাকে বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে গোর্কির মা, টলস্টয়ের রেশারেকশন, ডস্টভস্কির ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট পড়া গৌরবের ছিল। কথায় কথায় টুর্গেনিভ মোঁপাশা বানার্ডশ

রঁমারলা প্রভৃতি রেফার না করতে পারলে সে সাহিত্যিক বলে গণ্য হত না।

আমার প্রথম লেখা প্রথম গল্প 'কলের নৌকা' কল্লোলের প্রথম দিকে ছাপা হল, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত না পেঁ৷ছেও আমি যেন একটা সিঁড়ি পেলাম অচিন্ত্যের সহযোগিতায়।

দূর থেকে বাবা টাকা পাঠাতেন। কলকাতায় ভগ্নীপতি অভিভাবক। কিছুদিনের জন্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমি পড়ি আই. এস.-সি., উনি বোধহয় এম. এ-র সঙ্গে ল।

মাঝে মাঝে ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে কিছু কি পড়াশুনা হচ্ছে ?

আমি বলি নিশ্চয়। তারপর তাঁর চোখের সুমুখ দিয়ে স্যুট করে সরে যাই। চোরের মত বাড়িতে এসে ঢুকি। কোনো রকমে চারটি মুখে গুঁজে উঠে পড়ি। রাত জেগে হ্যারিকেনে আবডাল দিয়ে গল্প কবিতা লিখি। এমনি পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করেই আমার সাহিত্যের গোড়া পত্তন। মন যা চায়, অভিভাবক তা চান না—বাবা শুনলে তো ফায়ার।

চোদ্দ

১৩।৪।৫৮ সকাল ৭-৯টা

হায় রবীন্দ্রনাথ! তোমাকে তো লিখে জানান হয়নি কি মর্মান্তিক জ্বালা নিয়ে যে দিন কাটাই! তুমি সুযোগ সুবিধা ঐতিহ্য আভিজাত্যের সুমেরু শিখরে, আমি তোমার ভাব শিষ্য হয়েও ধোঁয়াটে লণ্ঠন আবডাল দিয়ে বদ্ধ ঘরে বসে। তোমার প্রতিভা যখন মুক্তি চায়, বাতায়ন খুলে বলাকাপাখায় উড়ে চলে উধাও। সীমা ছাড়িয়ে অসীমে। আমার ঘরে জানালা নেই, থাকলেও একটি, তা খোলার সাহস হয় না পাছে অভিভাবক টের পান। তাই

আমার প্রতিভা কেবল চার দেওয়ালে মাথা কুটে মরে। তুমি যখন দেশে দেশে পূজ্য বরেণ্য, আমি তখন অস্বীকৃতির অন্ধকারে চোরের মত গৃহ কোণে আসি যাই। কি যে দুঃখ পাই তা কি জানো গুরুদেব?

আমার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ নেই, বর্ষা এলে আমার নর্দমা ছাপিয়ে আঙিনায় জল উঠে, আমার কল্পনায় ময়ুর ময়ূরী নাচে না। তুমি যখন লেখো—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী, আমি দেখি হাসপাতাল, অনেক রোগীর ভিড়, বেকার শিবু আজো কাজ পায়নি, তাই তার মা বোন উপোসী। তুমি যখন উচ্ছ্বাসে আবেগে সম্বোধন করো, হে সম্রাট কবি! আমি ভাবি, কি বঞ্চনার স্মৃতি সৌধ গড়েছে সাজাহান!

১৪।৪।৫৮ সকাল ২-৫ টা

ছেলেবেলা এমনি অনেক কথা ভেবেছি। তখন মনে হয়েছে আবোল-তাবোল। এখন দেখছি একটা খেই খুঁজে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের পাদমূলে বসেই রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের জন্ম। আমরা কল্পনা থেকে অনেকটা বাস্তবে নেমে এসেছি। অচিন্ত্য-বুদ্ধ-প্রেমেন-শৈলজানন্দ গতানুগতিককে অস্বীকার করলেন। এলেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর কলম আরো বাস্তবানুগ। পরবর্তীকালে কল্লোলের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আর একজন বিরাট শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' লিখে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' একটা ডিপার্চার বটে, কিন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে সমপর্যায় ফেলা যায় না। শুধু পূর্ব বাঙলার আঞ্চলিক সাহিত্যের গোড়া পত্তন হল। মানিক ইতিহাসে স্থান করে নিলেন।

মানিকের সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্করের কথা মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন রাঢ়ের অন্যতম জীবনপ্রবক্তা। আমি মোহিতলাল মজুমদারের মুখে আলোচনা শুনেছি, তারাশঙ্করের অনেকগুলো

উপন্যাসের মধ্যে 'কবি' হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, চুলচেরা বিচারে ত্রুটি কিছু থাকলেও এই গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন। কাল যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে···এ হল চিরন্তন বেদনা-মধুর সুর। এর মার নেই। এ উপন্যাসই তাঁকে ভাবিকালে বাঁচিয়ে রাখবে। যখন আজকার সম্রাট বিগত, বাঙলার সাহিত্য পুলিনে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'কবির' বিজয় মিনার। যেমন অশোক নেই রয়েছে 'অশোকস্তম্ভ'।

একটি ঘটনা মনে পড়েছে আজ। তখনো আমার কোন উপন্যাস বের হয়নি বই আকারে। 'পদ্মদীঘির বেদনী'র কেবল মাত্র একটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে মাসিক 'অগ্রণী'-তে। ১৯৪৮। অগ্রজ শিল্পী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বাগতম জানিয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্যে। আপনার 'পদ্মদীঘির বেদেনী' পড়ে আশ্চর্য হলাম!

আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি—মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছি 'কবি' পড়ে। তাই এই স্মরণের যৎসামান্য অঞ্জলি দিলাম নেপথ্যে দাঁড়িয়ে।

কল্লোল যুগ গদ্য এবং পদ্যে বামপন্থী ভঙ্গি আনল। রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে, এতকালের শুচিতার পর্দা ছিঁড়ে, কথা-সাহিত্য যতটা পথ এগিয়ে এলো, কবিতা বুঝি তা পারলে না। তবু নতুন যুগের সূচনা হল। পাঠক অভিনন্দন জানাল এই রেনেসাঁসকে। কিন্তু তৃপ্তি পেলে না বেশী দিন।

রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার করলেন দক্ষিণ দুয়ারে দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলেন এঁরা বালখিল্য। অমনি ঝড় উঠল প্রতিবাদের। বামপন্থীদের সমর্থন করলেন শরৎচন্দ্র, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত। অনেক আইনের তর্ক উঠল। এলো শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্ন। কল্লোল যুগ প্রতিষ্ঠা পেল সাহিত্যে।

রবীন্দ্রজ্যোতি ইতঃমধ্যেই খানিকটা ম্লান করেছিলেন শরৎচন্দ্র। এবার যেন কলঙ্ক দেখা গেল সূর্যমণ্ডলে।

পাঠক তবু খুশী নয়। যুগের সিঁড়ি বেয়ে সেও এগিয়ে এসেছে। তারও পরিচয় হয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে। সে যেন আরো কি চায়। অনেক দিনের কথা, তবু আমার স্পষ্ট মনে আছে বুদ্ধিধর্মী পাঠকের ব্যাকুলতা।

১৫।৪।৫৮—রাত্রি ২-৩টা

শ্লীল অশ্লীলতার জন্য পাঠক পরোয়া করে না। সে রিয়েলিজম-য়ের নামে ন্যাচারিলেজম আর গিলতে রাজী নয়। তার আর বুঝি ভালও লাগছে না, আর্ট ফর আর্টস-য়ের ধোঁকা। নীচুতলায় নেমে এলেও মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মনন নিয়ে কল্লোল যুগে তখন তেমন কোনো সার্থক সার্বিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারলে না। মহৎ সাহিত্যের জন্য মহৎ অভিজ্ঞতার উপকরণ চাই। সে উপকরণ হঠাৎ কখনো সংগ্রহ হয় না। না কোনো ডাইরি রেখে, না দুদিন মেলামেশা করে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে শোক দুঃখ বেদনায় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে আজ আসতে হয়েছে সাহিত্যে। জনসাধারণই তার বক্তব্য আমার কলমের ডগায় পেশ করছে। যদি কিছু মহৎ হয়ে থাকে তার সম্পূর্ণ মূল্য জন-সাধারণেরই প্রাপ্য।

জনসাধারণ বলতে আমি বিশেষ করে বুঝি এক শ্রেণীর মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত শোষিত। যারা দেয় বেশী, পায় কম। যাদের শ্রম নইলে কোনো সভ্যতা টেঁকে না। আমি দেখেছি তারা জীবনের সার্বিক ধর্মে বিশ্বাসী। তারা বাঁচতে চায়, আবার অনায়াসে মরতে পারে তোমার জন্য। তারা হিংসায় বর্বর, আবার দানে মহৎ। কাউর হয়ত অক্ষর-জ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই, কিন্তু চিন্তায় চেতনায় সুগভীর। এরাই হচ্ছে নীচুতলার মানুষ। প্রদীপের অন্ধকার। দুদণ্ড চশমা পরে এদের পাঠ করা যায় না। দূরবীন কষেও এদের বিরাটত্ব দেখা যায় না। আমি আবার বলছি, আমি যতটা প্রতিভা, তার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা, তাই পেয়েছি

একখানা সনদ। সেইজন্যই বুঝি আমার নাম যশ খ্যাতির জন্য অপেক্ষা করার হুকুম নেই। লেখার পর লিখেছি এদের কথা।

আমি পাঁকের পথে এদের জীবন বৈচিত্র্য ফোটাতে চাইনি, পূর্ণ আশাবাদের পথে আমার গতি। আমি জানি এই প্রগতি। জনসাধারণ হচ্ছে চিরন্তন মার্গ সঙ্গীত। বাকি যা কিছু গজল ঠুংরি।

তেরশ চৌত্রিশ সনে আমি আমার প্রথম গল্প 'কলের নৌকা' এইভাবে সুরু করি—

মা মারা গেল আগে, তারপর তার বাপ।

যাবার সময় রেখে গেল দু'শ টাকার দেনা, আর তা শোধ দেওয়ার জন্য একখানা কুড়োল।

তাই সে তার বাপের মতই দিন-মজুর।···

১৬।৪।৫৮—রাত্রি ১-৪টা

সুরু যে ভাবে করেছিলাম, দুঃখের বিষয় সে ভাবে শেষ করতে পারিনি জীবন সম্বন্ধে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাবে। এসে গেল মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিক ভঙ্গি। নেতিবাচক কারুণ্যে সমাপ্ত হল গল্প। আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমা॰ এইটুকু পার্থক্য যে মুসলমান সমাজ থেকে নায়ক নায়িকার চরিত্র নেয়া। ইতিবাচক সাহিত্য সেকালে ছিল দুর্লভ। পেসিমিজম্ যেন দক্ষ শিল্পী মানসে দানা বেঁধে বসেছিল।

একালের পূজা সংখ্যাগুলো খুললে যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মিত্রকে ছোট বড় প্রায় কাগজেই নজরে পড়ে, তখন প্রতিমাসে তেমনি নজরে পড়তেন জগদীশ গুপ্ত। প্রবাসী, কল্লোল, বঙ্গবাণী, কালিকলম হেন কাগজ নেই যাতে না রয়েছে তাঁর গল্প। তখন জগদীশ গুপ্তের খ্যাতির রথ সশব্দে চলছে। আজ তা প্রায় নিঃশব্দ। রথীও নেই, শুধু কীর্তিটুকু আমাদের মনে পড়ে রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিও ছিল পেসিমিস্টিক:।

ঠিক সন তারিখ মিলিয়ে বলতে পারছি নে, কল্লোল এবং যুদ্ধ পর্বের মাঝামাঝি আর একজন কৃতী শিল্পী মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গল্প বেছে নেয়া যাক—'প্রাগৈতিহাসিক'। এ গল্প পড়লে মনে হয়, যৌন প্রবণতা ছাড়া যেন মানুষের দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এ গল্পেরই রাজ সংস্করণ।

ইচ্ছা করলে এমনি নজির আরো টানা যায়। কিন্তু তা বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সাগর সঙ্গমে' স্নান দান করে যে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করলেন, তার ফল শুধু তিনি একা নন আজো আমরা ভোগ করছি—ভবিষ্যৎও করবে। এসব শিল্পকীর্তি ব্যতিক্রম। এগুলোকে অস্বীকার না করে, তবু বলা চলে সেকালের গতি ছিল নেতিমুখি। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আর একটি কথা মনে পড়ছে, কল্লোল যুগে নতুন করে ফর্ম এবং টেকনিক আকাশ ছুঁয়ে গেল প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধ-অচিন্ত্যের হাতে। 'তেলেনা পোতা আবিষ্কার' 'তিথিডোর' 'দুইবার রাজা' তার স্বাক্ষর।

তখন যুগধর্মের প্রভাব আমিও এড়াতে পারলাম না। প্রগতি, কল্লোল, প্রবাসীতে যে কটা গল্প লিখলাম সবই দুঃখবাদে শেষ। তবে পঁচিশ বছর আগে যে 'কলের নৌকা' প্রিয়ার অন্তিম বিরহে মুহ্যমান নায়ক 'রহিম' জল স্রোতে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, তুমি ফিরে এসো, নাও পাঠালাম—সে নৌকা ডোবেনি। তখন কি জানতাম এই নৌকায় চড়েই একদিন 'চরকাশে'ম'এ পাড়ি জমাব? অচিন্ত্য-কুমার প্রীতি ও স্নেহে অন্ধ হয়ে তাঁর 'কল্লোল যুগে' বলেছেন এ আমার যোগ সাধন। আমি বলি জনসাধারণের অতৃপ্তি। সেই অতৃপ্তি মিটাতেই আমার দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর বুঝি সাহিত্যে নবজন্ম। এবার আমি হাতে হাত মিলিয়ে জীবনকে অর্জন করে এসেছি। রামপরায়ণ বলে, তোর স্বীকৃতি ধীরে হলেও স্থায়ী।

আমি বলি স্বীকৃতিই বড় কথা নয়। সংশয় না থাকে। উপবাস দারিদ্র্যকে আমি ডরাই নে, যেন বিবেকের দংশনে না পলে পলে

জলি। ঝুটা মুক্তাকে যেন আমার আসল মুক্তা বলে ঠকাতে হয় না কখনো। তা যদি একান্ত করতেই হয় তার আগে যেন মরি।

বসে রয়েছি রামপরায়ণের বৈঠকখানায়। এত বড় একটা লম্বা চওড়া মানুষ যেন একটা পাখির মত হয়ে গেছি। বারবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে বেলেডোনার ক্রিয়ায়।

রামপরায়ণ বলে, তোর আদৌ মৃত্যু নেই।

এক্ষেত্রে প্রতিবাদ নেই, রমেশদা এসেই ডিটো দেন।

এমনি ডিটো দিয়ে চলেছেন সস্ত্রীক ডাঃ প্রফুল্লকুমার চৌধুরী। আমি ভাবতে বাধ্য হই এই অদৃশ্য স্তম্ভগুলোর জন্য আজো সমাজ বেঁচে আছে! আমার যা হবার হক এঁরা যেন চিরায়ু হন।

কল্লোল যুগ যে নব জাগৃতি এনেছিল, তা আরো খর বেগে মুখর হল যুদ্ধোত্তর যুগে। জীবন-জিজ্ঞাসু শিল্পীরা এসে মিশে গেলেন এ ধারার সঙ্গে। আর একটা বাঁক ঘুরল সাহিত্য। কবিতা প্রবন্ধ কথা-সাহিত্যে জন্মাল মহীরুহ। আমি প্রবীণ হয়েও এ বৃক্ষের নবীন ফল। বাম পন্থাই আমার পথ। কারণ জনতা এই পথেই এগিয়ে চলে। 'দক্ষিণের বিল'-য়ে দেখেছি তারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামশীল। 'চরকাশেম'য়ে তাদের উপোসী কণ্ঠে প্রতিবাদ। 'বে আইনি জনতা'য় তারা তথাকথিত আইন ভঙ্গকারী। 'জোটের মহলে' পূর্ণ বিপ্লবী। 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-তে তারা মৃত্যুপণে শয়তানির মুখোশ খুলে দিয়েছে। আর 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'-র ফাজিল নায়ক নিতাই তো অনেক গোপন তথ্য চোখের কান্নিক মেরে দিয়েছে ফাঁস করে। আমার বামপন্থাই ধ্রুব পথ। জীবনে অর্জিত সত্যকে আমি কখনো বিকৃত করিনি।

১৭।৪।৫৮—সকাল ৬-১০টা।

বাবা করতেন চাকরি। তখনকার দারোগা মানে ষোল কোষের জজ। উঠতে বসতে হুকুম তামিল করত সে অঞ্চলের বড় ছোট সবাই। বাঘা পুরুষ। তাঁর হাঁকে বাঘে গরুতে জল খেত

একঘাটে। বাবা কিন্তু কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন না, আয়েশ করতাম আমরা। ইচ্ছা হলেই গ্রীন বোটে চড়েছি। রৌদ্রে ছায়ায় বাঁকের পর বাঁক কখনো উজানে কখনো ভাটিতে গড়িয়ে গেছি। জ্যোৎস্না মাখা আকাশের সেকি দৃশ্য! ফুল পল্লবের ছায়া ছায়া সে কি রূপ! সময় সময় গন্ধ—তীব্র নয়ত মোলায়েম।

আবার কখনো হাতীতে হাওয়দা লাগিয়েছি। সঙ্গে পর্যাপ্ত অনুচর বন্দুক। হাতী বুনো মোষ শিকার না করলেও হরিণ শিকার করেছি। নারুলী সিল্লি জংলি হাঁস তো বাঁক বেঁধে আনতে হয়েছে। ইংরেজিতে বলে শীতের গেম্। বাঙলায় বলা চলে শীত-কালীন খেলা। নিরীহ প্রাণীর জীবন নিয়ে অনেক খেলেছি। আমরা শেষ পর্যন্ত যে লেখাপড়া শিখেছি, যে বৈজ্ঞানিক চশমা পরে দুনিয়াটাকে দেখছি, সেখানে, সে-বন্ধুবান্ধব মহলে এটা সত্যই খেলা। কিন্তু মা বলতেন, হতভাগা তুই ব্যথায় ভুগে মরবি। মার ভাল করে নামটা সই করার যোগ্যতা ছিল না, কিন্তু তাঁর অভিশাপ নয়, হুঁশিয়ারি আজ পুরোপুরি ফলেছে। কোনো সঠিক যুক্তি নেই মার কথার সপক্ষে, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি রাত্রি দিন। নিরীহ বিলাঞ্চলের পাখিগুলোর যেন আর্তনাদ শুনতে পাই। যুক্তি স্রোতে টেঁকে না, অথচ বিবেকের দংশন এড়ান যায় না। এই ব্যথায় ভুগেই কি একদিন জীবে দয়ার আদর্শ নিয়েছিল এ মহৎ দেশের কৃষ্টি? আণবিক যুগে বাস করছি, অনেক ভেবে স্তব্ধ হয়ে থাকি। তবু ভাবি, ভাবতে ভাবতে একটা কূলের নাগাল পাই। আমি তুমি এই বিশেষ ক্ষেত্রে অসহায়। যখন তারুণ্য, যখন গেম্, তখন গুলি চালাবই। আবার যখন উইণ্ড এবং অনিদ্রায় দুর্বল তখন অনুশোচনায় অধীর হচ্ছি। ভাষা দিয়ে কি সব ভাব বাঁধতে পারলাম? ঠিক বুঝতে পারছিনে।

হয়ত টলমল করে চলছি রাত্রে—গভীর নিশুতি রাত। তাতে

কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ঠিক সংশয় কাটছে না। ডাঃ বন্ধু প্রফুল্লকুমার নিকটে নেই, বালিগঞ্জ। থাকলে হয়ত সাইকোএ্যানালেসিস্ করে কিছু একটা বুঝিয়ে দিতেন।

অসহ্য জ্বালায় রমেশদাকে ঠেলে তুলি। —দরজা খুলুন, দরজা খুলুন রমেশদা!

আলো জ্বলল!

ঘুমে হাসিতে জড়ান মুখমণ্ডল। যেন এক আচার্য উঠলেন শিষ্যের ব্যাকুলতায়। বললেন, অর্জুন তুমি কার জন্য বিহ্বল হত-বুদ্ধি হয়েছ? চেয়ে দেখ এ সবই তো মৃত।

ঘরে এসে স্ত্রীকে ডাকলাম, ভনিতা না করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, বাবার শিয়রে ছিল, মৃত্যুকালে আমার শিয়রেও একখানা গীতা রেখো। কথাগুলো বলে যেন একটু হালকা হলাম।

মার্কস বলেছেন অর্থনৈতিক দাসত্ব ভাঙতে, গীতা দিলেন মনের দাসত্ব ভেঙে। কল্লোলযুগ সাহিত্যে স্বীকৃতি পেল বটে, আমারও সাহিত্য-যাত্রা ঐ যুগেই সুরু, কিন্তু কোনো শিল্পীর কাছ থেকে এ দ্বিবিধ দাসত্বমুক্তির পথ নির্দেশ পেলাম না তখন।

স্তূপীকৃত লেখার ভিতর সার বস্তু রইল খুব কম।

১৮।৪।৫৮—রাত্রি ২টা হইতে সকাল ৬টা।

রামপরায়ণ বলে, অন্তত পাঁচখানা পথের পাঁচালি কিংবা কবি-র মত উপন্যাস পেলেও দুঃখ ছিল না। কিছু গদ্য এবং পদ্য কবিতা, গুটি কয়েক ছোট গল্প দিয়ে একটা যুগকে ধরে রাখা যায় না। তুই বলছিস মহীরুহ, তা ফল কোথায় তেমন? উপন্যাস হল মেরুদণ্ড, তা কোথায়? হ্যাঁ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন ধূর্জটি-প্রসাদ, সুধীন দত্ত—যার অর্থ স্বয়ং বোধহয় ভগবানও উদ্ধার করতে পারবেন না। স্মরণের শিলালিপি পাঠ করলে কিন্তু অন্য কথাও মনে পড়ে। 'প্রবাসী'-তে রামানন্দের কি যুক্তি-নির্ভর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়? আমরা একটি একটি করে দিন গুনেছি মাসের।

কবে আবার প্রবাসী হাতে আসবে। সেই প্রবন্ধের ধার এবং ভাব দেখা যায় 'যুগবাণীতে' দেবজ্যোতি বর্মনের কলমে। মধ্যে মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়ও সে আগুন ঝলকায়। আর মনে পড়ে সেকালের 'বঙ্গশ্রী'-র কথা। ঠিক স্মরণ নেই সজনীদা কি মোহিতলাল লিখতেন, তবে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করত পাঠক। বিশেষ করে তরুণ ছাত্রদল তখন কিউ দিত না সিনেমা পত্রিকার লোভে। সেকালে ছিলও না এ সব কাগজ। তখনকার রুচি ছিল গভীরে, এখন এসেছে ওপরে। ব্যাপ্তিতে সমাপ্তি ঘটিয়েছে অতলান্ত পরিমাপের। তাই মনে হয় মোহিতলাল আর জন্মাবেন না। দ্বিতীয় শ্রীকুমারকেও দেখছিনে। তেমনি সজনীকান্তের জগতে বুঝি সজনীকান্ত। এমনি আরো নাম উল্লেখ করা যায়। চোখে জল আসে।

চোখ মুছে আবার নতুন জগত দেখছি। নতুন বর্তিকা হাতে এসেছেন গোপাল হালদার, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব। আর আসছেন যাঁরা, এখনো তাঁরা ছায়াপথের মত অস্পষ্ট। নামকরণ করতে পারছি নে। কিন্তু তাঁরা আসছেন! আসবেন অবিরত। মৃত্যুর মাপকাঠি নিয়ে জীবনকে দেখতে যে কত ভাল লাগে। হয়ত আমিই এই রোগ শয্যায় শুয়ে পুষ্পমালা দেবো। আর একটু পরমায়ু দাও ডাঃ এম. এন. রায় চৌধুরী। এখন তো হাসপাতালে তোমার অধানেই রয়েছি। আমি অর্ঘ্য দেবো অভিনন্দনের। ঐ যে ঐ স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, অরবিন্দ পোদ্দার। রথীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তো আমার কয়েক বছরের আলাপ। জীবেন্দ্র সিংহ রায়কে না হয় হালফিলে চিনেছি। ভোলানাথ ঘোষের সঙ্গে তো জমিয়েছি অনেক মজলিস। নারায়ণ চৌধুরীর কাছে যে কত সুখদুঃখের কথা বলেছি। তিনি যেন একাই একটা জবাব। আমার আশাবাদী মন পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে রয়েছে!

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে আর অতবড় একক প্রতিভা কেউ এলেন না।

কাল্লোল যুগ মালা বদল করল পরবর্তী যুগের সঙ্গে। যুদ্ধোত্তর যুগে পা দিলেন সাহিত্য লক্ষ্মী। একক সামন্ত প্রতিভার যুগে ধরল ফাটল। দেখা গেল বিশ্লেষণ করে বহু বিখ্যাত লেখায় রসের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে মনস্তত্ত্ব, পারিপার্শ্বিক, এবং পারম্পর্যের গোঁজামিল। যখন ধান নেই, তখন হয়ত ধান পাকল। যখন এতটুকু তেল জোটাও অসম্ভব, তখন হয়ত দেদার ঘিতে লুচি ভেজে পরিবেশন করছেন নায়িকা। সামন্ত যুগের মহান শিল্পীরা গল্পের গরুকে আকাশ দিয়েও হাঁটিয়েছেন। তবু তাঁদের সামগ্রিক সাধনা ও নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা ভরেই নিয়েছে বাঙালী পাঠক। দুর্বল গল্পকে বারবার মুখস্থ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ত্রুটিকে বলেছে অপূর্ব, প্রমাদ বিহীন, মনগড়া অসম্ভবকে বলেছে এমন দেখিনি কখনো সম্ভাবনাময় সৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙিয়ে, বাধ্য-বাধকতার দড়ি খুলে এই সব ছাত্রই ফাঁস করে দিয়েছে যত গোমড়।

মাঝে মাঝে সাহিত্যে অবাস্তবকতার এত যে ভেজাল এরও সুরু এখানে নয়। গুরু স্থানীয়রা বীজ রেখে গেছেন। পাঠক অতৃপ্ত। তাই যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে এলো নব নব জিজ্ঞাসা। চাই কল্যাণ, চাই সমাজ-চেতনা, চাই অর্থ নৈতিক মুক্তি। বাণী বক্তব্যে অভি-জ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া চাই রচনা।

এ যুগের শিল্পীদের ভিতর অনেকেই এখনো তরুণ, আমি এবং আর দু এক জন আছেন যাঁরা প্রবীণ, এই সঙ্গে জুড়ে দিলাম গীতার বাণী। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসানের সঙ্গে যেন মনের সূর্য রাহু মুক্ত হয়। 'পদ্ম দীঘির বেদেনী'-তে আমি সে প্রয়াসের চিহ্ন রেখে গেছি, সমস্ত অন্ধ সংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে বেদেনী ময়না কেঁদে বলছে—হে ভৈরব, হে কৃচ্ছ্রসাধক বৈরাগী, একটি সন্তান দাও

আমায়। তোমার মনকে বুদ্ধিকে মুক্ত করো, মুক্ত করো তপস্বী।

আমি প্রাচীন হয়েছি—ঠিক বয়সে নয়, রোগে, অপরিমিত শ্রমে। তবু বহু প্রয়াসের চিহ্ন রেখে গেলাম। বহু বাণী বক্তব্যের দাগ। নবীনদের সাদর সম্ভাষণ জানাই। তোমরা আমার প্রয়াসকে সফল করো। মালমসল্লা রেখে গেলাম, তোমরা স্মরণীয় কিছু করো। আমি হতে পারলাম না, তোমরা ইতিহাস হ'য়ো। সুকান্ত তো মৃত্যুপণে সে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।

প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসান রুটি।

॥ পনের ॥

১৯.৪.৫৪ বৈকাল ৯-১০টা

হয়ত আগে বলেছি রামপরায়ণ রায়, আমার বাল্য বন্ধু। কিন্তু এখানকার রামপরায়ণকে বুঝতে হলে তার পরিমণ্ডলটি জানা চাই। জমিদারি লোপ পেয়েছে, ইদানীং রাজা বাদশাও নেই, সামন্তযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্যই ইতি হয়েছে। কিন্তু বেঁচে রয়েছে একটি নিছক সাহিত্য প্রীতির এবং গুণীজনের মজলিস রামপরায়ণকে কেন্দ্র করে। রবিবার সকাল বেলা মদন পাল লেনে যাও। খরচখরচা রামের, তোমরা শুধু লুচি সন্দেশ উড়িয়ে আড্ডা জমাবে। আমার মনে হয় অনেক গুণীজন বোধহয় আসতেন জোলাপ নিয়ে, আচার্য রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক রায় চৌধুরী তো নির্ঘাত। একজন সবকথায় সকলের প্রতিবাদী আর একজন অবিসংবাদী নাট্যকার। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্য

ম সিয়ে, হরেন, প্রণয়বিখ্যাত অখ্যাত আরো অনেকে এখানে এসেছেন। আসছেন, আসবেন যতদিন না রাম বানপ্রস্থ নিচ্ছে। কারণ প্রতিমাসে তো খরচখরচা কম নয়। দু একজন মতলববাজ ফিকিরবাজ গুণীজনও আছেন, যাঁরা ধার কার্জ নেন। দায় ঠেকলে রামপরায়ণ জামিন। সে পরামর্শ অবশ্য গোপনেই হয়। বহু পথ ও মতের সমন্বয় সাধন করে চলেছে রাম। বাদী বিবাদী সকলেরই সে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন। এখন এক কলম না লিখলেও আমরা তার বাণী শুনতে যাই।

এতকথা বলেও ঠিক যেন রামকে বোঝাতে পারলাম না। এবার পার্টিশনের পর অনেক দিন বাদে রামের সঙ্গে আবার দেখা, তখন একটা গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পটায় সঠিক ধরা পড়েছে রাম। আর যদি ধরা না পড়ে থাকে, বুঝতে হবে রামের চরিত্র চিত্রণ ঈশ্বরেরও দুঃসাধ্য। দুষ্ট নষ্ট হয়ত প্রশ্ন তুলবে তবে কি রাম গভীর জলের মাছ?

আমার কিশোর বয়সের বন্ধু। গভীর অগভীরের প্রশ্ন তুলে আর জল ঘোলা করব না, শুধু বলব গল্পটা পড়া শেষ হলে মনে হবে, রাম আর যা-ই হক একটা যায়গায় বড্ড অসহায়, এখানেই প্রতিবাদী রমেশদার সঙ্গে তার গভীর মিল। সেও বিগতদার বহুদিন। মূল গল্পটি বেশ বড়। তাই চলমান কাহিনীর সঙ্গে আর জুড়ে মূলের রস ক্ষুণ্ণ করতে মন সরল না। যিনি বিগত তাঁর পবিত্র শিল্পস্মৃতি যথাস্থানেই থাক। আসল কথা রাম একটা জায়গায় বড় অসহায়। তাই গল্পটা পড়া শেষ হলে এই কথাই কি মনে হয় না, রাম সে তার সঙ্গতির ইন্ধন দিয়ে কটু কষায় তিক্ত পাঁচন না জ্বাল দিয়ে, সাহিত্যের সুরাসার জ্বাল দিচ্ছে। রমেশদার সে সামর্থ্য নেই, তাই বুঝি তিনি এখানের স্থায়ী সভ্য। তিনি বলেন, শেষ জীবনে আপনার সঙ্গে কাশীবাসী হবো। কিন্তু লুচি চাই।

২০।৪।৫৮—বৈকাল ৩টা-৫টা

আমি দেখি রামের এ মজলিস শুধু ধুনি জ্বালিয়ে রাখা। কখনো কেউ যদি এ পথ ধরে যাও, দুটো ইন্ধন দিয়ে যেও—কথা এবং সঙ্গের। রবিবারটি নির্দিষ্ট, কিন্তু সোম বুধ শুক্রেও আপত্তি নেই। তুমি আপ্যায়ন পাবে যেদিন আসবে, মহৎ কথার সে ইন্ধন চায়, সাহিত্য পাগল। কিন্তু আসল কথা, 'সঙ্গীহীন এ জীবন হয়েছে শ্রীহীন। সব আছে তবু যেন কিছু নেই।

রমেশদাও বিগতদার, দিনের পর দিন সন্ধ্যার পর আমাদের বড় উঠানটার ফুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকেন নিঃশব্দে অজানতে। ঘরে কথা নেই, কাকলি নেই, জনমানব নেই। হঠাৎ কখনো লেখা থেকে মুখ তুলে আমি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে দেখি পুরু চশমার কাঁচ বিচ্ছুরিত আলোতে চমকাচ্ছে। সন্দেহ হয় চোখের জলে বুঝি ঝাপসা হয়ে গেছে। তখন বামের কথা স্মরণ হয়।

হয়ত আমি সবে লিখে উঠেছি, আমার তেমন ইন্ধন জ্বালাবার ক্ষমতা নেই। স্ত্রী বলেন, কাছে ডাকো, বসতে দাও। কতবার উনি উঁকি মেরে দেখেছেন তুমি লেখা বন্ধ করেছ কিনা!

রমেশদা এসে বসেন। রাঁধতে রাঁধতে পঙ্কজিনী ইন্ধন জুগিয়ে যান। সংসার থেকে সাহিত্য। ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে…গন্ধ সে চাহে ধূপেরই সঙ্গ…

আমি রমেশদার কথা শুধু ভাবিনে, রামের কথাও ভাবি—ভাবি নিজের ভাগ্যেরও কথা। নিয়তি কি নিষ্ঠুর!

এক সময় হেসে উঠি। তখন হয়ত রমেশদা চলে গেছেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, ওকি ? হাসলে যে ?

আমি বলি, একটা হাসির প্লট মনে পড়েছে।

এমনি করে আমি বরাবর নিয়তিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি

॥ ষোল ॥

২১।৪।৫৮—সকাল ৯-১১টা

বাল্মীকির রামায়ণে এক রাম সত্য কিন্তু আমার জীবনে দুই রাম। উদয়াচলে দ্বিতীয় রামের আলোর ঝলক দেখতে পাচ্ছি। প্রথম রামের চা-বাগান কোলইয়ারী আছে, দ্বিতীয় রাম হচ্ছে, রামমোহন ঘোষ—সাওয়ালেসের সামান্য একজন কেরানী। আমার জীবনে দুই রাম সত্য।

আমি গত পরশু রাতে আর চোখ বুজিনি। কলম নিয়ে বসেছিলাম। লেখা আর এগোয়নি। রিক্সা করে ঘুরে বেড়িয়েছি রাস্তার পর রাস্তা। মনে হচ্ছে পেনিসিলিনের এ্যাকসন ফুরিয়েছে। কিন্তু আমার তো সংগ্রাম ফুরায়নি। বায়ু চাই, নিষ্কলঙ্ক বায়ু।

শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সাদার্ন এ্যাভিন্যুর দক্ষিণ ফুটপাতে এসে বসলাম। একটু বিশ্রাম দিলাম রিক্সাওয়ালা বন্ধুকে। আজ রাতটা তো আমায় বাঁচিয়ে রাখছে। কোন্ পশ্চিম দেশে বাড়ি জানিনে, নাম গোত্র ঠিকানাও এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিনি। শুধু অনুভব করেছি লোকটা টাল মাটাল টক্কর বাঁচিয়ে রিক্সা টেনেছে। শুধু পয়সার বদলে শুকনা কাজ দিয়ে দায় সারেনি। পরে জানতে পেরেছিলাম ওর মারও নাকি দমার (হাঁপানির) বেমারি ছিল।

আবার মনে পড়ে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রফাইলখানা। সদানন্দ রোডে একটি সদানন্দ মানুষ। এর বাড়িতে যত রাজ্যের সাহিত্যিকের শুধু সম্বর্ধনা। কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তী এলে তো আর কথাই নেই। কেরানী বিক্রমাদিত্যের সভা মুখর হয়ে উঠত নীরেনের আবৃত্তিতে। 'একক'-এর অভিযাত্রী শুদ্ধসত্ত্ব বসুকেও বুঝি এখানে কি এর আশেপাশেই প্রথম দেখেছি। কবিতার মত ছন্দময়

ভাবময় কুশল জিজ্ঞাসা। প্রসঙ্গান্তর তবু হঠাৎ মনে পড়ে কবি বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। নিজস্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি। যেন শিবজটাজালে কলকলনাদিনী গঙ্গা। যেন কবি বিষ্ণুর চোখে শিবের চোখের নেশার রক্তিমা। আমরা ভক্তি ভয়ে অভিভূত হয়ে এই রক্তমাংসের শিবের দিকে চেয়ে থাকতাম। এও উজ্জয়িনী সাহিত্য-সভার বর্ণনা। স্থান ১৯৪৯-এর ক্যালকাটা হোটেল।

তারপর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়েছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। শিবের জটা থেকে বক্তব্যের সংবেদনে—ইস্তাহার, ইস্পাতের তীক্ষ্ণ অগ্র, 'তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য।' আছেন মঙ্গলাচরণ, মণীন্দ্র রায়—রয়েছে গোলাম কুদ্দুসের 'ইলা মিত্র'। আমি রুগ্ন, দেখে শিউরে উঠলাম থুতুর সঙ্গে সুকান্ত যেন আবৃত্তি করছে চাপ চাপ রক্ত।

আরো খানিকটা এগিয়ে বসি ধূলার আসনে। দিনেশ দাস বুঝি বললেন, আশ্চর্য হবেন না অমরেন্দ্রবাবু, এই জন্যই আমাদের হাতে 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।'

আজ বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় বহু যশপ্রার্থীর ভিড়, কিছু আদর্শবাদীর। অনেকে ইহকালে, সামান্য কজন চিরকালে বিশ্বাসী। জাতির জীবনে রেখাপাত করে কে বেঁচে থাকবেন, সে বিচার মহাকালের হাতে। কিন্তু আমি পদধ্বনি শুনছি অনেকের।

ফুটপাথে ঘাস নেই। জুতায় জুতায় চষা—ধুলো উড়ছে হাওয়ায়। গা এলিয়ে দিলাম ঐ ধূলাতে। একবার কেমন যেন ঠেকল। নিকটেই ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যশস্বিনী লেখিকা বাণী রায়। নিশ্চয় এখন ঘুমিয়ে আছেন দক্ষিণ খোলা প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। এ ভাবে আমায় দেখলে কি আর কথা বলবেন? বিড়ি খাচ্ছি এক দেহাতির সঙ্গে। আমার সমাজ সংসার মর্যাদার মুকুটের আর পরোয়া নেই। ধূলার শরীর ধূলাতেই এলিয়ে দিই।

একটু তন্দ্রা এসেছিল কি আসেনি। সেদিনের সূর্য পরমায়ু নিয়ে এসেছে অপরিমেয়। রিক্সাওয়ালা বন্ধুকে বলি, ওঠো চলো বাড়ি।

মনে পড়ে রমাপদ চৌধুরী ও সন্তোষ কুমার ঘোষের কথা। দেখতে দেখতে এরা দিগ্‌বিজয়ের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন। কপালে রক্তটিকা। 'প্রথম প্রহর'-য়ে বুঝি রমাপদ 'লালবাঈ'-র দেশে নিশান ওড়ালেন। দ্বিতীয় প্রহরে 'পিয়াপসন্দ', 'দ্বীপের নাম টিয়া রঙ'। তারপর 'কথা কলি'-র দেশ। কত নৃত্য, কত বিজয় উল্লাসের তাথৈ মাদল। সন্তোষ ঘোষও 'কিনু গোয়ালার গলি' থেকে বেরিয়ে বিচিত্র 'মুখের রেখা' সন্ধান করে করে সাহিত্যের 'পরমায়ু' বাড়ালেন। কত দিন এই শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে যে দেখা নেই। মাঝে মাঝে বিমল মিত্র ও বিমল করের সঙ্গে এঁদের আলোচনা শুনি তরুণদের মুখে। প্রসঙ্গত আসেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। সব পড়া নেই, মেজাজের সঙ্গে হয়ত মিল খায় না অনেক কিছু, তবু ভাবি বাঙলা সাহিত্য বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ক্রান্তি যাত্রায় হাতে হাত মিলিয়েছেন বরেন বসু, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষের সঙ্গে বুঝি সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক প্রভৃতি। বহু রাগ-রাগিনীর আলাপ বহু মিশ্র অবিমিশ্র সুর বাণী বন্দনায়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র পথে বুঝি 'উদ্ধারণপুরের ঘাট।' আমি আভাস পেয়েছিলাম 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-য়ে।

আবার কেরানী বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় এসে পড়ি। রিক্সার দোলায় সে সভা আজ আর নেই। সেই দপদপে জৌলুস! আমিই তো কতদিন এখানে আসিনি। এমনি বুঝি অনেক পাত্র-মিত্র সভাসদ। তবু কালের কৃষ্টিফলকে রয়ে গেছে এক ফোঁটা মুক্তার মত জল। বিশ্বনাথ আসলে রামপরায়ণের ভাব-শিষ্য। অকালে গৃহ লক্ষ্মীটিকে হারিয়ে পুরোপুরি দেউলিয়া। বিক্রমাদিত্য নেই, নেই সে-আলোকোজ্জ্বল রাজসভা। তাই হঠাৎ তুমি কালিঘাট

পার্কের এক কোণে দেখবে অন্ধকারে রামের পাশে লক্ষ্মণ নিশ্চুপ।

রিক্সা চলে।

প্রত্যহের পীড়ায় অনেক কিছুই পড়া বাকি। তবু ছোপ ছোপ মনের ময়ূর-এর রঙ না লেগে যায়নি। এমনি করেই 'প্রতিভা'-র জয়যাত্রা। ঘুরতে ঘুরতে 'অন্য নগর'-য়ে সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিস্ময়কর এক পরিবেশে পরিচয়। 'অন্য নগর' উপন্যাস তো বটেই, গদ্য কাব্য তাই পংক্তিগুলো স্মরণ নেই ঠিক। লণ্ডন টাউনের মহামূল্যবান ওভারকোটে শ্বাসরুদ্ধ এক সিলেটি মুসলমান খালাসীকে তিনি দেখিয়েছিলেন। তার বক্তব্য, বাবু আমাগো কি মুক্তি নাই? তাই এঁর কলমেই সম্ভব হয়েছে ফুটিয়ে তোলা রাজার দেশের রাজসিক জাঁকজমকের ভিতর বসেও অচ্ছুৎ ঝিটিকে।

আবার শোনা যাচ্ছে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের গান'। তাঁর অভিযানও শুধু ভারত নয়, দ্বীপময় ভারত—উপন্যাস নাটক কখনো বা গানের একতারায়। বুঝি এলাচি দারুচিনিরও গন্ধ আসে তাঁর রচনায়। এসেছেন আর এক শক্তিমান 'জাগরী'-র ছাড়পত্র হাতে। তাঁর বহুধা পরীক্ষা নিরীক্ষাকে আমরা বরাবর জানিয়েছি সশ্রদ্ধ নমস্কার।

উপস্থিত রয়েছেন দিগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার। জীবনের সঙ্গে এঁর লেখার একটা বৈপ্লবিক সঙ্গতি দেখতে পাই। আদর্শের জন্য এঁর ভাঙতে হচ্ছে অনেক রক্তাক্ত চড়াই উৎরাই। মাঝে মাঝে নাটকের সাজঘরে ঝলকে ওঠেন অধ্যবসায়ী সমালোচক সুধী প্রধান। যখনি এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনি মনে হয়েছে এঁরা বিশ্বাসের জন্য তিল তিল করে জীবনটাকে ছড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন। দেখেছি প্রগতিবাদী মেয়েপুরুষ শিল্পীদের সাধনা—শম্ভু মিত্রের অভিনয়। একদা মুগ্ধ হয়েছি সলিল চৌধুরীর সুরে—সাইগল, আব্বাস, হেমন্তের কণ্ঠে। বিমল রায়ও পর্দার আলোকে বারবার

চমক জাগিয়েছেন বঙ্গে থেকে সারা বিশ্বে। প্রশংসার পংক্তি ভোজে আমিও প্রতিনিধি হয়েছি একদা।

ভোলা যায় না শচীন সেনগুপ্তের কলমে বাঙলার শেষ নবাবের মর্মান্তিক উক্তি, 'উপায় নেই গোলাম হোসেন!' উপায় নেই! আজ তো সমাজে সংসারে অনেক মীরজাফর, তাই অনেক সিরাজ-দ্দৌলার উপায় নেই। এই অনেকের কথা এমন করে কি করে লিখলে দার্শনিক? আমি তো মাঝেই মাঝেই এই কথাগুলো নাভিমূল থেকে উদগীরণ করে দিয়ে সুস্থ হই।

একটু সুস্থ শান্ত হয়ে শীতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। একটু হাঁ করে পান করতে চেষ্টা করি অক্সিজেন। একটু তন্দ্রা আসতে চায়। কিন্তু স্বপ্নিল মন ভেসে চলে ডানা মেলে।

দেখেছি ববেন গঙ্গোপাধ্যায় 'তোপ' দাগিয়েছে 'দেশ'-এর পাতায়। 'পরিচয়'-এর পাতায় আবার দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মতি নন্দী। এ তোপগুলো সার্থক হক—আমি প্রত্যাশা করি এ্যাটমিক এ্যানার্জি। শান্ত ধীর স্থির হরেন ঘোষকেও কাহিনীর চড়াই ভাঙতে দেখলাম। কার্শিয়ংয়ের ডমিচাইল্ড কাঞ্চন জংঘা ছোঁবে নাকি? 'নীল নীল চোখ'-এ বুদ্ধির জানালা খুলেও আবার কি দেখছে মানব গঙ্গোপাধ্যায়? প্রণয় গোস্বামীর সঙ্গীতের ঝঙ্কারে বুঝি ডুবে গেল আমার 'একটি সংগীতের জন্ম কাহিনী'।

দেখিনি কিন্তু শুনেছি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস সরোবরে ফুটেছে নাকি 'পথিক কবি বিভূতি ভূষণ'। এ জন্ম নব জন্ম। বরেণ্য পুরুষের পক্ষে নিশ্চয় কাম্য। কিন্তু নারায়ণ নামটি কি বাঙলা সাহিত্যের তালিকায় নিদ্রাহীন নয়? একজন (নারায়ণ গঙ্গো) 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' সভ্যতার স্বরূপ উদঘাটন করে 'মন্ত্র মুখর' স্বরে পাঠ করছেন 'শিলালিপি'। আর একজন স্বপ্ন দেখছেন পদ্ম ফোটাবার। এ হচ্ছে কবির কবিতা। আমি রিক্সায় বসে ছন্দে আকুল।

দেখলাম 'চলাচল'-এর পথে 'পঞ্চতপা'র মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্মিত মুখে নতুন দিনের আলো। বড় ভাল লাগবে যদি ঘণ্টাখানেক এঁর সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারো। অনেক খ্যাতির শিরোপা পেয়ে এঁর শির এখনো আনত।

অনেকের কথা ভাবা গেল না, চেনা গেল না অনেকের মুখ। কিন্তু কলরব শুনলাম 'দ্বিতীয় সন্ধির'। দুর্গাদাস সরকারের সঙ্গে অনেক তরুণ অভিযাত্রী। নবারুণে টলমল।

অনেক তারার ভিড়ে আমিও তো ছিলাম একটি তারা। যদি খসে পড়ি, একান্তই হারিয়ে যাই, দুঃখ কি! দিগন্ত হতে দিগন্তের ঘোমটা খসুক। আসুন ইন্দ্রগুপ্ত আরাধনার হাত ধরে। নর কথা, নারী সুর। 'রসকলা'-র ঘরোয়া বৈঠকে কিন্তু এক একদিন আমার মনে হয়েছে পরিমল মুখোপাধ্যায় যেন এই দুয়ে মিলে শুধু সংগীত। দৈনিকের কঠিন পাহাড়ে নিভৃতে একান্তে ফোয়ারা ফোটাতে দেখেছি। শুধু ছাদের দিকে অজস্র হয়ে উঠেছে। দিগন্ত হতে দিগন্তের ঘোমটা খসুক। আসুক দলে দলে শিল্পী নারী ও পুরুষ।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাণী রায়ের সুললিত কবি কণ্ঠে যেন শুনতে পাই—ওরে ভয় নাই, ভয় নাই, হবে জয়, হবে জয়……। আর যেন আশীর্বাদ করছেন ব্রাহ্মণ শ্রীকুমার, যে আশীর্বাদ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি, রয়ে গেল 'শনিবারের চিঠি'র ঝরা পাতায়।

আজ আমি আমার ভাগ্যকে ক্ষমা করি, তার চেয়েও বড় ভাবি, সুপ্রভাত।

হাসি মুখে বাড়ি গিয়ে উঠি। গেটের সুমুখে স্ত্রী পুত্র কন্যার ভিড়। আমি হেসে মনে মনে বলি, সুপ্রভাত। একাদশীর কাছে রিক্সাওয়ালার জন্য চা বিস্কুটের ফরমাশ করি।

২২।৪।৫৮—সকাল ৭-১১টা

আমাদের এই বাড়িতেই থাকেন জ্ঞানরঞ্জন ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় মিত্র, স্বদেশরঞ্জন দে, তাঁরাও এগিয়ে আসেন। তিন জনের মুখে উৎকণ্ঠা। জ্ঞান মিলিটারী এ্যাকাউন্টস-য়ে চাকরি করেন, আর শান্তিপ্রিয় মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু। জ্ঞান শুধু কেরানী নন, ভাল টাইপিস্ট। কত ডজন ডজন যে দরখাস্ত আবেদন-নিবেদন আমার, টাইপ করে এনে দিয়েছেন। আর শান্তিপ্রিয় আমার বারান্দার সুমুখে ফুল ফুটিয়েছেন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-বসন্তে।

আপনার জন্য আমরা কি কিছু করতে পারিনে? উঃ—এত কষ্ট!

যা পারার তা তো করছেন। টাইপ করে, ফুল ফুটিয়ে—র‍্যাশন কয়লা আদান-প্রদানে। এবাড়ির পরিবেশ, এত বড় উঠানটা কি আমাকে more go-তে সাহায্য করছে না? মীরা এবং গৌরীর সহায়তাই তো রেবা গত শীতে অত বড় সোয়েটারটা আমার জন্য বুনে তুল্‌লে। এমনি মনিদির রঙ্গরসে আনন্দ পেয়েছি। বুলু, পুষ্পি দিয়েছে কত যে গল্পের খোরাক। আপনাদের তো করণীয় কিছু বাকি নেই। দীপক প্লাবন তো, আমার লেখা শুনে করেছে আমাকে শ্রদ্ধেয়।

তবু ক্ষুব্ধ মনে দাঁড়িয়ে থাকেন ওঁরা।

আমি ওঁদের জন্য উল্‌টে ব্যথা বোধ করি।

দুপুর নাগাত শুনতে পেলাম, টাকা নেই। স্ত্রী এবং ছেলে বাসুদেব কি যেন আলোচনা করেছে চুপে চুপে।

আমি বলি, অত সংকোচ কেন? যত দিন বেঁচে আছি, আমার দায়িত্ব আমাকেই বইতে দাও। যা বলার তা এখানে এসে বলো। এখন একটু সুস্থ আছি।

একেবারে যে টাকা নেই তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায়

ভাবার মত। এখনো ভাতার টাকা পেতে প্রায় তিন সপ্তাহ। জনসাধারণের সাহায্য? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আর কত আশা করা যায়! মনে পড়ে তু'টি কিশোর ছাত্রের কথ। হয়ত জলখাবারের পয়সা তিলে তিলে বাঁচিয়ে তু'টি টাকা পাঠিয়েছে প্রণামীর ফুলের মত। একটি কেরানী বন্ধুও তাই—যার নাকি ছ'টি পোষ্য। সে আবার নাকি বই পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কুপনের গায় গুটি কতক কথা, কিন্তু মন থেকে কি মুছে ফেলা যায়! শ্যাওলার মত ভাবলে—কিছু নয়, কিন্তু গুলিয়ে ভাবলে অনেক।

স্ত্রীকে বললাম, প্রকাশক সুধীরচন্দ্র ব্যানার্জির কাছে যাও। ব'লো যে হিসাব নিকাশ কিছু বুঝিনে, মৃত্যু শয্যায়ই বন্ধুর পরীক্ষা। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি প্রকাশকদের সারিতে যতটুকুই স্থান দখল করে থাকুন না কেন, মানুষের মনের সারিতে অনেক বড়। দেখবে আপাতত তিনি তোমাদের নিশ্চিন্ত করে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে রমেশদাকে ডাকো।

আমার কথা সফল হয়েছে। রাত্রির শেষ যামে রিক্সায় চড়ে পরমায়ুটাকে বাঁচিয়ে চলছি। যখনই খাবি খাচ্ছি, তখনই দেখছি লাইট-পোস্টে লাইট-পোস্টে সুধীরবাবুর করুণাঘন মুখ। এই আর্থিক কাঠামোতে পাওনাটা বড় নয়, দেওয়াটাই বড়। সেই দৃষ্টিতে সুধীরবাবু আজো আমার কাছে সত্যই করুণাঘন!

তেমনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির শ্রীগুরু লাইব্রেরীর ভুবনমোহন মজুমদার। কথায় কাজে আকাশ পাতাল ব্যবধান নেই। খানিকটা নিস্পৃহ, বাকিটা তদ্গত। এঁর বাণিজ্য শুধু এ ভুবনের দিকে চেয়েই নয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোল যুগ একটা স্বাক্ষর রেখে গেছে। তেমনি আমার জীবনে গভীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন নন্দলাল রায়—ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কোন্ ফার্মে চাকরি করতেন স্মরণ নেই। আমি তখন সবে আই. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছি। তু'একটা লেখাও বেরিয়েছে কাগজে। নবীন যৌবন। পরিপূর্ণ ব্যায়াম-

করা স্বাস্থ্য। ধরা যেন পদতলে সরার সামিল। বাবার মনিঅর্ডারে মৌজে আছি কালিঘাট। একটা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যাবো আমি।

ক্লাস ফাইভ থেকেই আমি কালিঘাট ইস্কুলের ছাত্র। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তখন ক্লার্ক। ভগ্নীপতির তত্ত্বাবধানে রয়েছি সাহানগর রোডে। রোগা ছিপ ছিপে গঠন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ও হুজুগ। পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামের আখড়া। অগ্নিযুগ ও অনুশীলন পার্টির প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট। সন্ত্রাসবাদও রেখাপাত করেছে বাঙালীর মনে। বারবার হামলা হচ্ছে ইংরেজ প্রভু এবং খয়ের-খাওয়া নেটিভদের ওপর। মাঝে মাঝেই সারা বাঙলার সঙ্গে বাকি ভারত চমকে উঠছে ভেতো বাঙালীর দুঃসাহসিক বোমা বন্দুক পিস্তলের শব্দে। কেউ বা কিশোর, কেউ বা সবে ষোল বছরে পা দিয়েছে। ওজনে বেড়ে যাচ্ছে ফাঁসির হুকুম শুনে।

বাঙালী দেড়শ বছরের পরাধীন ভারতের শিকল-ভাঙার পণ নিয়েছে। শারীরিক নির্যাতন তুচ্ছ, ফাঁসিকাঠ খেলনা, সমস্ত তারুণ্য যেন রক্ত-পাগল। কবি নজরুল তখন জাতির জীবনে অনুরণন তুলেছে শিকল বাজিয়ে জেলে বসে। শরৎচন্দ্র তখন এ্যাক্টিভ রোম্যানটিসিজমের চরম মার্গে পেঁাছে গেছেন। বঙ্গবাণী মাসিক পত্রে ধারাবাহিক বার হচ্ছে 'পথের দাবী'। মাঠে ঘাটে কৃষক জনপদে তখন উদাত্ত কণ্ঠে আগুন ছড়াচ্ছে মুকুন্দ দাস। আমাদের আদর্শ ক্ষুদিরাম, কানাইলাল। ক'বছর আগে বোধ হয় মানবেন্দ্র রায় উধাও হয়েছেন—বলতে গেলে এক বালক। অগ্নিমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা। শিক্ষানবিসি এই ভীরু বাঙালীর সূতিকাগারে। তখন কে জানত এই আগুনে রাশিয়া, চায়না, সুদূর মেক্সিকো পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হবে! এই বাঙলা দেশেই জন্মেছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাশীল বহুভাষা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক বরেণ্য পুরুষ-সিংহ।

সে যুগে বাঙালী শপথ নিয়েছিল, মৃত্যু কি মুক্তি।

২৩।৪।৫৮ সকাল ৬-১০টা

রাত চারটায় ঘুম থেকে উঠি। কানাদার আখড়ায় ব্যায়াম কবতে যাই। কুস্তি লড়ি, ডন-বৈঠক দেই আর কানাদাব গল্প শুনি গরম গরম। দেশের যে অবস্থা আমাদের হারকুল্যিস কি গামা গোবর হতে হবে এক একজনকে। লাঠি ঘোরান, তলোয়ার চালান সবই শিখতে হবে। লেখাপড়া সেকেণ্ডারী। শক্তি নইলে জীবন ধারণ বৃথা। মন লাগিয়ে চর্চা করলে পিলে রুগীও ভীম ভবানী হতে পারে।

কানাদা কানা ছিলেন না। তবু এ নামটা যে কেন পেয়েছিলেন বলতে পারিনে। তাঁর আসল পেশা ছিল মোটর ড্রাইভারী। কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই আখড়া সংগঠন। ছিলাম দুর্বল, পেলাম শক্তির আস্বাদ। এ যেন হয়ে দাঁড়াল বহুকাল রোগে ভোগা রোগীর কাছে কুপথ্য। নিয়মিত মাই'ন দেই, কিন্তু ইস্কুলে যাবার নাম নেই। বছবের শেষে কোনো রকমে হাত পা ধরে প্রমোশন। বারবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যে, এবার থেকে ভাল ছেলে হযে চলব। কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। আজ দঙ্গল-লড়া দেখতে যাওয়া, কাল প্রদর্শনী, পরশু পাঁচ কোষ দূর থেকে মড়া ঘাড়ে করে এনে পোড়ান—এমনি করে দশম শ্রেণীর সিঁড়িতে পা দিয়ে চমক ভাঙল। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখি অকূল সমুদ্র। এ সমুদ্রে আর দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে লাভ কি?

২৪।৪।৫৮ রাত্রি—২-৫টা

শরীর ফিরেছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়েছে বলিষ্ঠ। ষোল সতের বছরের ছেলের দিব্যি এক গ্রীসিয়ান ফিগার। কিছু মড়া পুড়িয়ে, এর-ওর বাড়ি টাইফয়েড কলেরায় নাইট ডিউটি দিয়ে পাড়ায় সমাজ কল্যাণী খেতাবী পেয়েছি। কোন বোমা বন্দুক নিয়ে কোথায়ও যাওয়ার আহ্বান এলো না! শরীর করত নিস্‌পিস্।

মাঝে মাঝে ভাবতাম বৃথা হল এই হাজার হাজার ডন বৈঠক। তবে দু' একদিন মার খেয়েছি ইংরেজ সার্জেণ্টের মিটিং করতে গিয়ে—সে হল তৎকালীন কংগ্রেসের মিটিং, বড্ড নিরামিষ। এই পর্যন্তই আমার সেকালের দেশসেবা। ঠিক যেন শরীর মনকে খাপ খাওয়াবার সুযোগ পেলাম না! কানাদাও কোনো নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলাব ইঙ্গিত দিতে পাবলেন না। ফলে না-হলাম ভাল ছেলে, না-পারলাম মুহূর্তে প্রাণ বলি দিতে। আমরা যুগের হুজুগে ঘোলায় পাক খেতে লাগলাম।

২৫।৪।৫৮—সকাল ৬-৯টা

সঞ্চিত শক্তি উপচে পড়তে পারল না। এবার পাত্রের নীচের দিকে পড়ল চাপ। একটা রন্ধ্র বেয়ে নামতে লাগলাম। সত্য প্রেম পবিত্রার যুগেও অন্ধকার ছিল। কিছু মহাপুরুষ জুটে গেল এ পথের দিগ্-দিশারী হয়ে। কেউ সিদ্ধিতে সিদ্ধ পুরুষ, কেউ মদে গাঁজায় বোম শঙ্কব। যত দাও তত খাবে, অহংকার নেই, কোলাহল নেই—শুধু দু' একটি সারগর্ভ উপদেশ। আমরা নবীন শিষ্যরা অবাক হয়ে শুনতাম এ সব বাণী। কত বছরের কৃচ্ছ্র সাধনায় যে এঁরা এতদূর পেঁৗছেছেন! অভিভাবক ভগ্নীপতির চোখে আঙ্গুল দিয়ে, মাব কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে এই মহাপুরুষ-দের পরম সান্নিধ্য লাভ করার জন্য জোগাড় করতাম প্রণামী। ক্লাশ এইট, নাইনের কথা বলছি—কিছু জুয়া-যোগীর সান্নিধ্যও পেলাম। এঁরা আরো মহৎ। মুহূর্তে একখণ্ড রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে দশ খণ্ড যোগ করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আবার নিয়েও যেতে পারেন কাপড়-চোপড় ঝেড়ে উলঙ্গ করে। নিতে-দিতে এঁদের যেন তাপ উত্তাপ নেই।

কিছু কামাই করার দুর্বার আকর্ষণ হল। বোধহয় সঠিক তা নয়—আগ্রহ হল বুদ্ধি এবং ভাগ্যের রহস্য যাচাই করতে। খেলা আছে নানা রকম। একদিন একখানা দশটাকার নোটই উড়ে গেল

কুপন খেলতে গিয়ে। তারপর কয়েক মাসের ইস্কুলের বেতন। এসব আবার জোড়াতালি দিতে দংশনে দহনে জ্বলে পুড়ে মরলাম। অভিজ্ঞতা হল একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে সহস্র মিথ্যা বলতে হয়। জ্বলো পোড়ো তবু রেহাই নেই। জুয়ার আড্ডায় ঘুরে ঘুরে একটা নিষ্ঠুর সত্য আবিষ্কার হল। বুঝলাম এ পথ আমার নয়।

তবে পথ কোন্‌টা ?

তীব্র জিজ্ঞাসায় আকুল হয়েছি। পথের কোনো হদিস পাচ্ছিনে। চিঠি এল বাবার বহুমূত্র বেড়েছে। তার ওপর হয়েছে কার্বাঙ্কেল। মারাত্মক পরিস্থিতি। আর দেরী না করে মালদহ হয়ে হবিবপুর থানায় পেঁাছালাম। মা একা রোগী দেখবেন, না সংসার সামলাবেন ? বাবার শুশ্রূষার ভারটা আমিই নিলাম। যেটুকু নার্সিং শিখেছিলাম এবার কাজে লাগল।

একটা দিক চিহ্নহীন মাঠ। মাঝে মাঝে দু' একটা আম বাগিচা, শক্ত বাঁশের ঝাড়, কাঁটা ঝোপ। বলতে গেলে জনমানবের চিহ্ন নেই দু' এক মাইলের মধ্যে। মাঠের মাঝখানে শুধু এই থানাটা। রৌদ্রে খাঁ খাঁ করে, রাত্রে যেন আফিং খেয়ে ঝিমায়। গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়াও দেখা যায় না সকাল সন্ধ্যায়। থানার সীমানার ভিতর একটা মাত্র ইঁদারা। সে ছাড়া এক ফোঁটা জল পাবে না তুমি মাথা খুঁড়ে মরলেও। ছ' সাত মাইল দূরে একটি মাত্র এল. এম. এফ্. ডাক্তার আছেন। তেমন কোনো জরুরী কেস হলে তাঁর কাছে সংবাদ পেঁাছাতে পেঁাছাতে রুগী কাবার। মরলে আর এক জ্বালা। শ্মশান নেই সাত মাইলের ভিতর।

বড় দারোগার পর জমাদার সিপাহী। তাদের কাউর কোয়াটার কি পরিবার নেই। এত বড় থানাটায় মা-ই হচ্ছেন একমাত্র মহিলা। আছে আমার গুটি কয়েক ভাই বোন। আমি না আসা পর্যন্ত মাকে যে দিতে হয়েছে কি পরিমাণ ধৈর্যের পরীক্ষা,

তা আর মিছামিছি জিজ্ঞাসা করিনি। শুধু মুখের দিকে চেয়ে অনুমান করে নিয়েছি।

তখন পর্যন্ত বহুমূত্রের এত সব প্রতিরোধক ওষুধ বার হয়নি। কার্বাঙ্কেল হওয়া মানে যমে মানুষে লড়াই। বাবার হাতের গোটা দুই যেমন তেমন, পিঠেরটাই সাংঘাতিক। গামলা-গামলা রক্ত পুঁজ। দিন-রাত ডাক চীৎকার।

সকাল বেলা ঘোড়া হাঁকিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। বার দুই তিনি এসে দেখে গেছেন, এখন শুধু উপদেশ নিয়ে আসা, সে উপদেশও কি সহজে দিতে চান! মৃত্যুকে মানদণ্ডের একপাশে রেখে যে কত টালবাহানা। দেখলাম ইনি হচ্ছেন বড় জুয়াড়ী। মানবতাবোধের সব ঘুঁটিগুলো বারবার টেক্কা হয়ে এঁর দিকেই উল্‌টায়। রোগীব স্বপক্ষে একটা দানও পড়ে না। পায় ধরে কাঁদলেও না। তাই এল. এম. এফ. হয়েও এত প্রতিষ্ঠা। মনটা তিক্ত হয়ে যেত যখন থানায় ফিরছি, রিক্ত মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করে কাঁপছে রোদ্দুর। প্রকৃতি যেন শুকিয়ে বারুদ হয়ে রয়েছে—মায় অশ্ব খুরের মাটি। একটা স্ফুলিঙ্গ পেলেই বোধহয় দাউ দাউ আগুন। এখানে কি করে মন বেঁধে থাকবে? শিখলাম একেই বলে নিরস কর্তব্য। ইংরেজিতে বলে আনপ্লেজেন্ট ডিউটি। কিন্তু মার কাছে শিখলাম ভিন্ন। তিনি মনের মাধুর্য মিশিয়েই সবকিছু করতেন। তাঁর হিসাব ক্ষণ মুহূর্তের নয়—চিরমুহূর্তের।

২৬।৪।৫৮—বিকাল ৪টা-৬টা

অপ্রমেয় প্রাণশক্তির বলে বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ফিরে এলাম কলকাতা।

কিন্তু আবার অন্ধকারে পা বাড়ালাম। অভিজ্ঞতা হল নতুন। একদিন একেবারে সবান্ধবে বেশ্যাবাড়ী উপস্থিত। মদের গ্লাসে চুমুক দিতেই গলা বুক জ্বলতে লাগল অসহ্য জ্বালায়।

বুঝলাম এ পথও আমার নয়'।

॥ সতের ॥

আবার তীব্র জীবন জিজ্ঞাসায় আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলাম, দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল মর্মন্তুদ যাতনায়, মাসের পর মাস। নিয়মিত রাজনৈতিক ঢেউ আসতে লাগল। সন্ত্রাসবাদ থেকে গান্ধীবাদ, হিংসা থেকে অহিংস-সংগ্রাম। আমি নিশ্চিন্ত মনে কোনো বাদে ডুবে যেতে পারলাম না, শুধু বিপুল বেদনায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতাম মিছিলের পর মিছিল করে বাঙালী এগিয়ে যাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথের ডাক শুনেছি, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা। যতীন দাস প্রাণ দিলেন, যথাসর্বস্ব দান করে বৈরাগী হলেন বিলাসী সি. আর. দাশ। একের পর এক এলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শাসমল, সুভাষ বসু। মহৎ বাঙালীর মিছিল চলল সারা ভারতের পুরধা হয়ে। আশুতোষ শিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে পথ আরো স্পষ্ট করলেন।

আমি শুধু পথ পাচ্ছিনে। 'শিশু' কাব্য-গ্রন্থ আমায় দিলে দীক্ষার ললাটিকা।

রবীন্দ্রনাথ পথ দেখালেন। কোনো রকমে চোক কান বুজে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুটা পাস করলাম। তারপর কলেজ।

২৭।৪।৫৮ সকাল ৯-১১টা

কল্লোলে 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে দেয়ার আগে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে পরিচয়। একটি কবিতা লিখেছিলাম—'শ্মশানে বসন্ত'। এইটি আমার কবিতার দিক থেকে প্রথম উত্তীর্ণ রচনা। কবিশেখর সামান্য কিছু শুদ্ধ করে ছাপার জন্য 'বঙ্গবাণীতে' পাঠিয়ে দিলেন। কত ভয় ভয় এসেছিলাম। তার বদলে সাহস এবং উৎসাহ পেলাম প্রচুর। আর দেখলাম বৈষ্ণবীয় রসানুভূতি ও মুগ্ধতা। একান্ত নবাগতর

পক্ষে এযে কত বড় সম্বর্ধনা! অচিন্ত্যকুমারের কাছে পেয়েছিলাম বন্ধুর প্রীতি, কবিশেখরের কাছে পিতৃ স্নেহ। আজো তা অম্লান।

আমাকে কখনো নাম ভাঁড়িয়ে লেখা ছাপতে হয়নি, ইদানীং অবশ্য শ্রী এবং নাথ ত্যাগ করে শ্রীহীন ও অনাথ হয়েছি। আমি একা নই, পূর্ববাঙলার বোধ হয় সবাই। পাইকারী হারে সাইকোঅ্যানালেসিজ করতে আহ্বান জানাচ্ছি ডাঃ প্রফুল্লকুমার চৌধুরীকে। রোগটা মানসিক না রাজসিক? উত্তর যা হক, তবু এই-টুকুই সান্ত্বনা যে আমাকে আজো লেখা প্রকাশের জন্য হতে হয়নি লবঙ্গ-লতিকা অথবা তিলোত্তমা ঘোষ। প্রেরণা ও পৌরুষের দীপ্তিতে বারবার আমার নায়ক-নায়িকা উদ্ভাসিত হয়েছে উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে। বঙ্কিম-মাইকেলের তেজস্বিতা, রবীন্দ্র-কাব্যের শাণিত মধ্যাহ্ন দীপ্তি আমাকে প্রভাবিত করেছে, মাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা মানুষের এ একরূপ। আধুনিক সভ্যতা আমাদের এ সম্পদ কেড়ে নিয়ে প্রায় নিঃস্ব করেছে।

আমরা তো কখনো ভেবে দেখিনে—স্বাস্থ্য কেড়ে নিয়ে দিয়েছে অজস্র হাসপাতাল, স্যানিটোরিয়াম, লক্ষ লক্ষ ভিটামিন-পিল, মূর্খতা ঘুচিয়ে দিচ্ছে বেকারী। হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে করেছে খাঁচায় পোষা সভ্য নাগরিক। ব্যক্তিগত বল বীর্য ব্যায়ামাগার অথবা স্পোর্টসের বিষয়, তোমার মান মর্যাদার আসল অভিভাবক কিন্তু ভাড়াটে পুলিশ।

পূর্ণ আবেগে লিখে চলেছি—হঠাৎ স্ত্রী এসে বাধা দিলেন,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কি?

বলো!

তোমার চিকিৎসা খাতে এই তো মোট টাকা রয়েছে। রেবা অশোকের বই কিনতে হবে, মাইনেও দিতে হবে ইস্কুলের। ওষুধ, ডাক্তার, রিক্সা ভাড়া ক'দিন চলবে! আবার চেইঞ্জেও যেতে চাচ্ছ!

এ কথাটা কি এখন না বললে হত না?

হত বই কি, কিন্তু এক একখানা দশটাকার নোট ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে। আজ আমি তহবিল হিসাব করে বোকা। বইয়ের যে পাওনা-দেনা তাও তো ফুরিয়ে এলো। তুমি বলছ জবানবন্দি নাকি জীবদ্দশায় ছাপা না-ও হতে পারে। এসে যেতে পারে নানা বৈষয়িক অন্তরায়।

আমার ওষুধে-ডাক্তারে তো এখন পর্যন্ত তেমন খরচা হচ্ছে না যতটা হওয়া উচিত ছিল।

সে তোমার বন্ধু ভাগ্য। কিন্তু রাজসিক রিক্সা ভাড়া, রাজসিক আহার?

কেন বান্ধবীর তুমি কথা বলছ না? শৈলজা চৌধুরাণীর মহত্বে কি তুমি হিংসা করো?

ছিঃ ছিঃ কি যে বলো!—স্ত্রী চুপ করলেন, আমি দেখলাম ওঁর বুকে যেন রয়েছে কৃতজ্ঞতার মোহরাঙ্কিত অনেকগুলো দলিল। যতবার আমি ওষুধে, নগদে, কাপড়ে, খাবারে পেয়েছি, উনি আমার হয়ে দলিলের পর দলিল দিয়ে গেছেন। আজ পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি শুধু ডাক্তার-বন্ধু সস্ত্রীক গৃহীতা নন। আছেন সতীর্থ অবিনাশচন্দ্র সাহা, ভবানীপুর পাঠাগারের পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় দে, পরেশ সরকার, হেমেন বিশ্বাস।

আশ্চর্য হয়ে দেখি বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুর নাম। তাঁরা তো নগদে কিছু আমায় দেন-নি, তবে পঙ্কজিনী দলিল দিলেন কিসের?

পাঠককে ৩১।১২।৫৭ তারিখের প্রস্তাবনা স্মরণ করতে বলি। অমনি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি রাতের পর রাত। ধরলে নিউমোনিয়ায়। হাই ফিভার। নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে গেলাম। আমার প্রথম ভরসা, তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, অমরবাবু লিখে যান, বাঙলা সাহিত্যে আপনার নাম থেকে যাবে।

২৮।৪।৫৮ রাত্রি ১-৪টা

আমি সে শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছি গত পরশু পর্যন্ত। কোনো দুঃখকে দুঃখ বলে মনে করিনি! কোনো কষ্টকে কষ্ট। হাঁপিয়ে হাঁপিয়েও কলম চালিয়েছি। তাঁর কথাকে বাণী করেছি জীবন সংগ্রামে। দ্বিতীয় ভরসা, তাঁর লেখা 'কাব্য জিজ্ঞাসা' বইখানা, এখানা ভারতীয় সভ্যতারই ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক দলিল। কিন্তু অমন সংক্ষিপ্তভাবে ক্ষুরধার যুক্তি এবং রসানুভূতিতে কেউ তো আজ পর্যন্ত আমাদের চোখের সুমুখে তুলে ধরেননি। আইনের মনীষা ব্যতীত সাহিত্যের পর্বে পর্বে রসের অনুসন্ধান অসম্ভব ছিল, সেই রসের আস্বাদই হয়ত তিনি আমার সাহিত্যের কোনো ফলবান অংশে পেয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রাক্তন মেয়র শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। এখানা নিছক চিঠি হলে আমি উল্লেখ করতাম না বা শ্রীঘোষের কাছ থেকে এনে এত যত্ন করে রাখতাম না। আমার জীবনের একটা সম্পদ, নাবিক জীবনে যেমন ধ্রুবতারা। পাঠক তোমার হাতে যে তুলে দেবো এ আমার কল্পনায়ও ছিল না। আজ হিসাব দাখিলের পালা, কি করে গোপন করি চিরকুটখানা ?

> My acquaintance with him in connection with his literary activities. In fact I noticed one of his novels in public press, as it struck me as a genuine piece of literary work. It will be a loss to the country if he is compelle to stop writing owing to poverty.

স্ত্রীর মুখে সংক্ষেপে অসুখের কথা শুনেই অতুলবাবু একখানি শতকে নোট ও খুচরা দশটি টাকা দিয়ে বললেন, যান আর দেরী করবেন না, চিকিৎসা সুরু করে প্রয়োজন হলে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবেন। ছেলের নিউমেনিয়া, মেয়ের বিয়ে, আরো

অনেকবার এখানে এসে হাত পেতেছি। হাসতে হাসতেই শতকে নোট বার করে দিয়েছেন শ্রীগুপ্ত। টাকা অনেকেরই থাকে কিন্তু এমন করে দিতে ক'জন পারেন! দিতে দিতে অনেকের দেয়া আর্টের কোটায় পৌঁছে যেতে দেখেছি, কিন্তু এখানে দেখলাম এক অনাসক্ত দরদ। সন্ন্যাসীর ত্যাগ দিয়ে এর বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, ভারতীয় গৃহীকে দিয়েই শুধু সম্ভব।

স্ত্রীর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যার প্রদোষালোক। অন্ধকারে ডুবে গেছে সামন্তযুগ। আমি দেখলাম—এখনো জ্বলছে এক অন্তরাগ শিখা!

তখনি রিক্সা ডেকে দিল বাড়ির চাকর একজন। ভাবলাম এ যোগাযোগ যখন, তখন এযাত্রা বড্ড চবগানি খেলেন যমরাজ। তবু কেন জানি মনে হল বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা করে সব বলে যাই। একশ তিন ডিগ্রি জ্বর। প্রতি মুহূর্তে হাপরের মত হাঁপাচ্ছি, তবু উচ্ছ্বাস রুখতে পারলাম না। কি করে যে কবিতা-ভবনের সিঁড়ি ভাঙলাম জানিনে।

এই বুদ্ধদেব বসুর লেখার সঙ্গে সর্বদা যে আমি একমত তা নই। বরং আমাদের সাহিত্যের আদর্শ অনেক জায়গাই একেবারে বিপরীতধর্মী। কিন্তু আমার মনে হয়, বুদ্ধদেব তাঁর নামটি সার্থক করেছেন। ইদানীংকালে বাঙালা দেশে কোন শিল্পী যে তাঁর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন, তা আমার জানা নেই। তিনি তাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রত্যয় মহত্ত্ব নিয়ে, স্বকীয় তপোবনে একাই ধ্যানমগ্ন। এ যে ধৈর্য এবং সংযমের কত বড় যোগসাধন তা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

নানা প্রয়োজনে আরো ক'বার বুদ্ধদেবের কবিতাভবনে এসেছি। লোকে বলে বুদ্ধদেব মহা দাম্ভিক। আমি পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে অদ্ভুত সৌজন্য। তাই অতুলচন্দ্র গুপ্তের বেলা যেমন লিখতে সাহস পেয়েছি, মাইকেলের দুঃখে যেমন সাড়া দিলেন

বিদ্যাসাগর, তেমনি লিখেছি, মৌনী বুদ্ধদেবেরও আমি ধ্যান ভেঙেছি ; গর্বের বিষয়, বাঙলা সাহিত্যের একজন দিকপাল হয়েও আজ পর্যন্ত সজনীদা এ ধ্যান ভাঙাতে পারেননি।

আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঐ ভাবে দেখে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু যেন অবাক হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। সব শুনে সবিনয়ে বললেন, বলুন এখন আমরা কি করতে পারি ?

ইঙ্গিতটা বুঝে আমি জবাব দিলাম, এখন তো আশার অতিরিক্ত হাতে এসেছে, আপনাদের বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। এই যে দিতে চাইলেন, এই যে মহানুভবতা, কিছু না নিয়েও, এটা হল নেয়ার সামিল। নয় কি ?

আমি হাত পেতে নিলাম না বটে, কিন্তু পঙ্কজিনী মনে মনে দলিল দিলেন এই শিল্পী দম্পতীর উদ্দেশ্যে।

২৯।৪।৫৮—বিকাল ৪-৬টা।

বুদ্ধদেব বসুর আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর দার্শনিক চিন্তার সাবলীলতা। ঐ ছোটখাটো মানুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তাও বড় কম নয়। এই সেদিনও বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমানা লড়াইয়ে অনেক প্রথিতযশা বাঙলার ভৌগলিক স্বার্থ যখন বিকিয়ে দিতে মিরজাফর সাজলেন, তখন সত্যই বামপন্থী ঋজুতা দেখালেন বুদ্ধদেব। 'Voice of Bengal' পুস্তিকায় এমন একটি প্রবন্ধ লিখলেন যা চিন্তাশীল সমাজে আলোড়ন তুললে সুদূর প্রসারী। কল্লোল যুগ এ ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় সার্থকতা অর্জন করেনি কারুর মাধ্যমে। আমি নজরুলের কথা বলছিনে—বলছি একান্তই কল্লোলে যুগের বিশিষ্ট ত্রয়ী শিল্পী কেন্দ্রিক চক্রের কথা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিনেশ দাস, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে রুগ্ন অবস্থায় আমিও লাঠি ভর করে মার্জারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। ভুলে গেলাম না আমি 'চরকাশেম'য়ের শেষ কথা—প্রতিকার না হলেও

প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের। দু' তিনটা মিটিং করলাম সাহিত্য সভায় উপস্থিত হয়ে। আজো বাঙলা ভাষা বনাম রাষ্ট্রভাষার লড়াই চলছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো দিল্লীর মসনদ পর্যন্ত আওয়াজ তুলেছেন। অনেক স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে, তবু আমাদের পংক্তিতে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে বুদ্ধদেব।

অতুলচন্দ্র মনীষী, বুদ্ধদেব তপস্বী। তবু বোঝা গেল মায়ের সম্মান বিপন্ন হলে এঁরাও জনতার সঙ্গে হাতে হাত মিলাতে পারেন। সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ অনস্বীকার্য। পাঠক তুমি কার্য কারণ বিশ্লেষণ করে দেখ। যত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ বলো তুমি, 'জোটের মহলে' আমি এর নজির রেখে গেছি।

৩০ ৪।৫৮—সকাল ৮-৯টা।

একটা কথা মনে এলো। আঞ্চলিক পরিবেশে এবং আঞ্চলিক কথোপকথনে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে, তাকে কেন যে আঞ্চলিক চিহ্ন দিয়ে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়? এ জিনিসটা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না;—তবে শহুরে সাহিত্যও কেন অমনি গণ্ডীতে আবদ্ধ হবে না? আমার বেশির ভাগ লেখা পূর্ববাঙলাকে কেন্দ্র করে, তেমনি রাঢ় দেশ নিয়ে লিখেছেন তারাশঙ্কর। আমরা যদি দায়ী হই, তবে গোর্কি, মোপাসাঁ, হেমিংওয়ে বাদ যাবেন কেন? এক হিসেবে তাঁরাও তো আঞ্চলিক সাহিত্য-স্রষ্টা আমাদের চোখে। আঞ্চলিক সাহিত্য তখনই ভৌগলিক সীমানা ছাড়ায়, যখন তাতে বিধৃত হয় সর্বকালের সব মানুষের মনের রহস্য। আমি যে আবহাওয়ার মানুষ নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করে থাকি, অধিকাংশ রচনাই সিম্বলিক করতে আপ্রাণ যত্ন নিয়েছি। শুধু যত্ন নিলেই হয়ত হত না। রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, সেক্সপিয়র থেকে শিক্ষা নিয়েছি, টলস্টয়কে রেখেছি আদর্শ। এ গেল মহৎ মানুষের কথা। গোপাল রমজানও অনেক দিয়েছে আমায়, দিয়েছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হ্যারি ডিক।

বাঙলা দেশের অঞ্চলে বসে আমি বিশ্ব-মানবের কোলাহল শুনেছি।

৩০।৪।৫৮ বিকাল ৩-৬টা।

রমেশদা ভাগ্য দোষে সত্তের বছর অন্ধ হয়েছিলেন। সেকালের বি. এ. হয়েও তেমন কোনো প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি আর্থিক জীবনে। যৌবনের একটা বড় অংশ অপচয় হয়ে গেছে। চোখের যখন ছানি কাটালেন তখন টুলেট।

আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, এ সময়টা কি করে কাটাতেন?

চিন্তা করে।

দুশ্চিন্তা নয়, জ্ঞান সমুদ্র মন্থন। বহির্বিশ্ব নয়, অন্তর বিশ্বে দৃষ্টিপাত। এ চোখে কখনো ছানি পড়ে না মানুষের। তবে কাজে লাগানো চাই। রমেশদার কিছু লেখা পত্র-পত্রিকায় ছড়ান থাকলেও, এখন পর্যন্ত একখানাও বই নেই, তবু তিনি আমাদের আচার্য। অনেক মূল্যায়নে তাঁর সঙ্গে রামশরায়ণ এবং তার রবিবাসরের অশোক রায়চৌধুরী, নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এক মত না হলেও, তাঁর আঞ্চলিকের যুক্তি অকাট্য। আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু নিয়ে এবং নিজে কিছু দিয়ে অঞ্চলকে ভৌগলিক সংজ্ঞা মুক্ত করেছি। আচার্যের সাহচর্যে আমি সীমা পেরিয়ে অসীমে এসেছি।

কিন্তু স্ত্রী আবার ওয়ারনিং দিলেন—অভাব।

আমি কাগজ কলম রাখলাম। কল্লোল-যুগ থেকে এবার বিদায় নেয়ার পালা। কটাই বা গল্প কবিতা ছাপা হল! চড়াই ভাঙতে ভাঙতে যেন খাদের গহিনে পড়ে গেলাম। কত আশা আকাঙ্ক্ষার যে সেদিনগুলো ছিল!

ম্যাট্রিকের ফলাফল বেরুবার আগেই পঙ্কজিনী চেপেছেন ঘাড়ে। বাবাই চাপিয়ে দিয়েছেন মা স্বাস্থ্যহীন বলে। পরীক্ষার

ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেননি, পাছে যদি লজ্জার কিছু ঘটে। বাবা তো ছেলেকে ভাল করেই চিনতেন!

সুরু করতে না করতে সব শেষ হয়ে এলো। শুভদৃষ্টির মুখে যেন নিবে গেল প্রসন্ন দীপশিখা। দৈবের ঝাপটা এলো অকস্মাৎ। বাবার গেল চাকরি। আমার ভাঙল গড়া স্বাস্থ্য। দু'টো তিনটা বছরের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড। কেউ বললে প্লুরেসি, কেউ বললে টি. বি.-র সূত্রপাত। পরমায়ুর সন্ধানে চললাম হাওয়া বদলে। এতকালের বন্ধু-বান্ধব, হে মহানগরী কলকতা বিদায়!

কিন্তু তার আগে তো নন্দলাল রায়ের কথা বলে যেতে হয় আমাকে।

ঘুরতে ঘুরতে দেওঘর এসে হাজির, নন্দলাল রায়ের লেখা পরিচয়-পত্র এনে তাঁর বাবার হাতে দিলাম। ভিতর বাড়িতে দেখলাম অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ। নন্দর বন্ধু, দাদার বন্ধু ইত্যাদি ফিসফাস্ কথা। এঁরা বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু মনে হল আরবের পর্দা প্রথায় বিশ্বাসী। আমাকে বৈঠকখানায় সসম্মানে স্থান দিলেন। শুধু খাওয়া দাওয়ার সময় ভিতর বাড়ীর বাইরের কোঠাখানা ছুঁয়ে আসি। নন্দবাবুর মা পিসীমার দু' একটা জিজ্ঞাসা, কেমন বোধ করছ আজ? কোনো অসুবিধা তো হচ্ছে না? তুমি কিন্তু ছেলের মত আমাদের কাছে।

এঁরা হওয়া উচিত ছিলেন শাক্ত, দেখলাম পরম বৈষ্ণব। কারণ পাতে মাছ মাংস নেই, কেবল মিষ্টি মিষ্টি ঘণ্ট চচ্চড়ি ডাল্না। এসেছি স্বাস্থ্যোদ্ধারে, এ খেলে শরীর না ফিরে কি আর উপায় আছে! জবাবে বলি, ভালই আছি, অসুবিধা বলতে কিছু নেই।

শরৎচন্দ্রের যুগ। কবিতা গল্প লেখা কুড়ি একুশের আদুরে দুলাল। ভিতরে ঘুনে ধরলে বাইরে মাকাল। বৈঠকখানায় এসে একা বসে বসে বোধ করি চোখ মুছতাম। পঙ্কজিনী কাছে ছিলেন না। থাকলে চৌদ্দ বছরের মেয়ের হাতে নির্ঘাৎ ঠোনা

খেতাম। সাহিত্যানুরাগ এখানে নিশ্চয়ই মার খেতো। এত কালও লজ্জা-সঙ্কোচে বলিনি। জবানবন্দি দিতে গিয়ে আর গোপন করা গেল না।

সপ্তাহ আর গত হল না, এর মধ্যেই বৈঠকখানা থেকে রান্না-ঘরে ঢুকে জবর-দখল করে বসলাম। ডাল্‌না ঘণ্টর বদলে মাছের কালিয়া, মাংসের চপ্‌। মেয়েরা ছেলেরা দলে ভিড়ে গেল। আলাদা হেঁসেলে যবনের খানা। বাবুর্চি নন্দবাবুর বোন রাণী, কখনো বুঝি টুকু কিংবা খুকি। কিন্তু ব্যথা বেদনায় যখনই কাতর হয়েছি, যত রাত্তিরই হক, মা পিসিমা সজাগ। এঁরা উঁচু বর্ণের বঙ্গজ কায়স্থ। কিন্তু সৌরভে শুচিতায় একান্ত বৈষ্ণব। মা পিসিমার আমি হলাম স্নেহের গোপাল। একালে বাস করে সেকালের প্রীতি বিনয় উদারতা কল্পনা করাই শুধু সম্ভব। তবে অনেক দিন পরে 'পদ্মদীঘির বেদেনী' ময়নার মর্ম থেকেই বুঝি বেরিয়ে এসেছে এই ডাকটি। পূর্ণ যুবতী বিধবা ময়না সন্তান স্নেহে চিরবঞ্চিতা। তাই হয়ত প্রায় আমার সমবয়সী 'নয়নকে' বুকে জড়িয়ে ধরে সেই মন্ত্রজাগা দুর্যোগের রাত্রে বোধ হয় বলেছে, 'তুই তো হামার গোপাল আছিস !'

তারপর ছেলে এবং মেয়েদের নিয়ে অনেক পাহাড় টিলা পর্যটন, কত জায়গায় রয়েছে পিক্‌নিকের দাগ! রাণীর হাতের নকল করা কিছু গল্পের পাণ্ডুলিপি এই সেদিন পর্যন্তও বুঝি ছিল। একদিন হয়ত সব ভুলে যাবো, কিন্তু মা যশোদার ভাব পরিমণ্ডলটি হয়ত কিছুতেই বিস্মৃত হব না। তবু মানুষ অমরেন্দ্রকে বিশ্বাস নেই, সে শোক দুঃখ বিপর্যয়ের অধীন, কিন্তু লেখক অমরেন্দ্র স্বাধীন। সে যা কিছু সঞ্চয় করেছে মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে, যে কটি পূর্ণগর্ভা ঝিনুক, ছিটিয়ে দিয়ে গেল সাহিত্যে। গিয়েছিলাম পনর দিনের জন্য দেওঘর, রইলাম পুরো তিনটি মাস।

॥ আটার ॥

১।৫।৫৮—সকাল ৭-১০টা

অভাবের সংসারে কোনো প্রীতি পাণ্ডিত্য বিদ্যার কথা হয় না। এখন বাঁচা শুধু নিজের জন্য নয়, পরিবারের স্বার্থেও নয়, জবানবন্দি যে শেষ হয়নি। এবার আমার সাহিত্য জীবনের সুরু থেকেই এ কথাটা মনে ছিল। জবানবন্দি যত এগিয়ে যাচ্ছে, তত যেন অনুভব করছি গুরুদায়িত্ব। এ আমার অহংকার নয়, সমস্ত সত্তার অনুভূতি। অনেকের কথা বলেছি, কিন্তু এখনো তো অনেকের চিত্র বাকি।

সে চিত্র আঁকার আগে অভাবটাকে তো দূরে ঠেলে দিতে হবে।

প্রথমেই স্মরণ হয় আর্যসুলভ কান্তি অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। একাধারে কবি গল্পকার। যত লিখলেন, তত কিন্তু ছাপালেন না। আশ্চর্য এক সংযম! এঁরাই সত্যি মনের তাগিদে লেখেন। লিখেই আনন্দ। ছাপাটা গৌণ। এই মৌন-মুখর কবিকে মনে পড়ে। বার-বার সাহায্য করেছেন আমায়। এবার কি প্রথমেই তাঁর কাছে যাবো? একটা দ্বিধায় পড়ি!

তবে কোথায় যাবো? কার কাছে পাতব আবার ভিক্ষার ঝুলি? ইতঃপূর্বে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সাহিত্য-সেবক-সমিতির ডাকে তো জনসাধারণ সাধ্যমত সাড়া দিয়েছে। তারা আর জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কলঙ্ক নাকি বাড়াতে রাজী নয়। তবু প্রয়োজনের অনুপাতে কত আর পেয়েছি! অনেকের কাছে এখনো তো এ সংবাদ তেমন করে পৌঁছায়নি। শক্তি এবং ইচ্ছার কাছে তো ভাল করে আবেদন পৌঁছে দিতে হবে। চাই সংবাদ-পত্রের সংযোগ।

স্বাধীনতার সিঁড়িতে গিয়ে পা দিলাম। কাঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে

ওপরে উঠছি। নিমেষে যেন গেল শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে। জুতো এবং কাঠের সংঘর্ষে একটা যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম—আমাদের, আমাদের, আমাদের··· !

এই সিঁড়ি বেয়েই একদিন সুকান্ত উঠেছে, মানিক উঠেছে সেদিন, আমি বুঝি তৃতীয়! মানিক, সুকান্তকে স্বাধীনতা বাঁচাতে পারেনি। তবে আমি কোন্ আশায় এসেছি ? একবার ভাবলাম নেমে যাই, আবার দেখলাম স্টালিনের মুখে মৃদু হাসি।

অভ্যর্থনা করলেন সরোজ দত্ত, অরুণ রায়, সুকুমার মিত্র।

—সংবাদ কি ?—কেমন আছেন অমরবাবু ?

বন্ধুভাবে সব বললাম ।

সরোজ দত্ত চিন্তা করে বললেন, এ ভাবে পাবলিক চ্যারিটির ওপর ভরসা করে বেশি দিন বাঁচা যাবে না। আমরা একটা স্থায়ী কিছু করার কথা ভাবছি।

ব্যবস্থাটা কি তা আর জিজ্ঞাসা না করেই ফিরে এলাম, সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে অরুণ রায় বললেন, দরকারে হলেই ডাকবেন কিন্তু। বড় ভরসা পেলাম ভবিষ্যতের। সিঁড়িতে আবার যেন ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনি উঠল—আমাদের, আমাদের, আমাদের··· ! রিক্ত নিঃস্ব মানুষ এ সিঁড়িতে পা দিলেই কি এই ঐক্যতান শুনতে পায় ?

ভাবলাম বর্তমানেরটা যে ভাবে হক চালিয়ে নেবো। উপায় না থাকলেও একটা উপায় হয়ে যাবে।

রবিবার। স্ত্রীকে বললাম, ভবানীপুর পাঠাগারে চললাম।

তোমার দেখি যৌবন খুলেছে !

তোমার প্রতি ঈশ্বরের দয়া নেই—থাকলে তুমিও তো যুবতী হতে পারতে !

মাপ করো—দু'জনের যৌবন ফিরলে, সামাল দিত কে ?

মৃত্যুঞ্জয়-হেমেন-পরেশ কর্মী ছেলে। এই সেদিন ভবানীপুর পাঠাগারের তরফ থেকে একশ একটাকা দিয়ে গেছে আমায়।

কিন্তু মরুভূমির তৃষ্ণা মিটছে না। বেশ তো ছিলাম! একশ পঁচিশ টাকা ভারত সরকার দিচ্ছিলেন—কিছু আয় হত লিখে। দুঃখে-সুখে তো এক রকম কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। না হয় কিছু ধার কর্জে! কেন আবার এই রোগের দুর্বিষহ চাপ? কেনই বা নেমে এলাম ভিক্ষুকের ভূমিকায়? অর্থাভাব একটা মোটা কথা, কিন্তু তার বাইরেও কিছু চিন্তা রয়ে যায় নাকি?

ত্রয়ী কর্মী-ছেলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় একটা সাংঘাতিক মার খেয়েছে। এই শুভেচ্ছার উদ্যমে ক'বছর আগে বাঁ হাতখানা সে দক্ষিণা দিয়েছে সমাজ বিরোধী কোন্ ষণ্ডার যেন বন্দুকে না বোমায়। তবু শুভ পথ সে ছাড়তে পারেনি। এখন সে হয়েছে ইস্পাত তুল্য ধারাল। অল্প শুনেই বললে, যদি মধুপুর যান চেইঞ্জে বাড়ি দেবো আমরা।

কড়ি?

তাও সম্ভব মত সংগ্রহ করে দেবো। —ওরা তিনজন ছাড়া ওদের ইউনিটের আরো অনেকে ছিল। তাদের নাম জানিনে আমি। কিন্তু সবাই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে আমাব শ্রদ্ধা অর্জন করল।

সেদিন সত্যই রিক্সা ডাকলাম না। যুবকের মত হেঁটে এসে ট্রাম ধরলাম আমি। আজ যেন লাঠিটা বাহুল্য।

২।৫।৫৮—সকাল ৭-৯টা

পরদিন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাবো ভাবলাম। টালিগঞ্জ থেকে বাগবাজার। স্ত্রীকে বললাম, তুমিও সঙ্গে যাবে কিন্তু। একা একা অতদূর ট্রামে বাসে যাওয়ার সাহস নেই।

আগে নোটিশ দেইনি, তবু তিনি আমাদের ও রমেশদার রান্নার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রেবাকে বুঝিয়ে দিলেন। আমার জন্য ব্যাগে করে নিলেন—আলু, ডিম সিদ্ধ, মাখন, দুধ এবং একটা ইমারজেন্সি হস্‌পিটল। ট্রামেই চড়লাম। অতখানি পথের

ট্যাক্সি ভাড়া চালান অসম্ভব। ভেবেছিলাম অশোকটাকে বাদ দেবো। বাড়তি একটা খরচ। কিন্তু দেখি সে সেজে-গুজে আগে ভাগেই ট্রাম লাইনের কাছে উপস্থিত। মা এবং ছেলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তু'জনার মুখে চাপা হাসি। বুঝলাম স্নেহের এ ষড়যন্ত্র। বাপ হয়ে কি করে আর বাধা দিই! কথার রাজা রাম-পরায়ণ, মাঝে মাঝেই ঠাট্টা ক'রে বলে, তুই তো হচ্ছিস রাজ-ভিখারী!

একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না কথাটা। যখন শুনি তখনই ঠাট্টা বলে হাসি। কিন্তু ভিতরটা দগ্ধে যায়। বেশ তো ছিলাম—সুখে-তুঃখে, একশ পঁচিশ—তার সঙ্গে লিখে কিছু আয়। কিন্তু কোন্ অভিশাপে আজ রাজ-ভিখারী? মোটা কথা সবই বুঝি, তবু একটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন থেকে যায়।

গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে এসেই মনে পড়ে 'বিংশ শতাব্দী'র সম্পাদক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। কতদিন যোগাযোগ নেই এই অমায়িক মানুষটির সঙ্গে! কতদিন চা সন্দেশ খেতে খেতে অফুরন্ত আলোচনা নেই সাহিত্যের হাটের। এই সম্পাদক এক নতুন ধরনের মানুষ। হাতে কাজে সহাস্য মুখে কেবল প্রশ্ন—অমুকের লেখাটা কেমন লাগল?···সমকালের অমুকদের সম্বন্ধে আমি অমুক সর্বদা মতামত দেয়া শোভন নয়। তবু প্রশ্ন। অনেক সময় এড়িয়ে গিয়েও তু' একবার খানায় পড়তাম। এটা পাঁক-জলের খানা হলে আর হয়ত আসতাম না। এ হচ্ছে সাহিত্যের খানা—নাকানি-চোবানি খেয়ে এবং খাইয়ে আনন্দ। তাই যখন সুস্থ ছিলাম, মাসে অন্তত একটিবার আসতেই হত এখানে। কতদিন 'বিংশ শতাব্দী'খানাও হাতে পড়েনি!—একবার নামব নাকি?

গ্রে স্ট্রীট ছাড়িয়েই ভাবছি পবিত্রদার কথা। যদি পবিত্রদার সঙ্গে দেখা হত!

খেইহীন এ আকাঙ্ক্ষার কোনোই অর্থ হয় না। তবু জপ করছি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম।

সেই পবিত্রদা-ই শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে। আমি হাত দু'খানা চেপে ধরলাম। আবার ভাল করে দেখলাম মুখখানা— ভুল করিনি তো!

ও কিরে অমর?

কিছু না।

ওখান থেকেই স্ত্রী এবং ছেলেকে বিদায় দিলাম।—তোমরা অমরেশের বাসায় যাও, আমি ফিরলাম বলে।

অমরেশ আমার শালীর, শৈবলিনী ঘোষ দস্তিদারের ছেলে। একজন স্থিতধী ডাক্তার। প্রফুল্ল চৌধুরী ট্যুরে গেলে অমরেশকে দিতে হয় প্রক্সি। লাভ নেই, শুধু খরচ তার।

একটু ঘোমটা টেনে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন. কি খাবে আজ দুপুরে?

ডাক্তারের অতিথ—যা খেতে দেয়। তোমার আমার চিন্তার কি?

তিনতলার সিঁড়ি। পবিত্রদার কাঁধে ভর করে উঠলাম। এক একটা ধাপ ভাঙছি আর ভাবছি, এ পৃথিবীতে রমেশদা কেবল একটি নন, অনেক। শুধু শ্যামবাজারের মোড়ে সাক্ষাৎ হওয়া চাই। স্বাধীনতার সিঁড়িতে হলেও আপত্তি নেই। দেশের খোপখানায় বসে তো সাগরময় ঘোষও বহু অজ্ঞাত কুলশীলকে কাঁধ পেতে দিনের পর দিন বাঙলা সাহিত্যে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এমনি আমার সাহিত্য জীবনে খ্যাতিমান প্রাণতোষ ঘটক স্মরণীয়। একের বিশ্বরূপ দেখতে দেখতে সত্যি আমি তিন-তলায় পৌঁছে গেলাম।

বিবেকানন্দ একজন কৃতী পুরুষ। কোনো ঠাট-গমক নেই। বেড রুমেই বুঝি ডেকে বসালেন। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন সব। আমি বললাম, আপনার কাগজের সহায়তা ছাড়া এ যাত্রা রক্ষে নেই।

এজন্য নিজে না এসে একখানা চিঠি লিখলেও তো হত? কি করে এলেন শরীরের এ অবস্থায়?

লজ্জায় একটা মিথ্যা কথা বলে ফেললাম, ট্যাক্সি করে। চেয়ে দেখলাম—পবিত্রদা এ ঘরে নেই, হয়ত মেয়ের কাছে গেছেন,—বাঁচলাম। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

এখানেও বুদ্ধদেবের মত একটি ছয়-ছত্তি মানুষ—সমকালের কলমে পরিচয় দেয়া অনাবশ্যক। তবু বলব তিনি সাধক বিবেকানন্দের মতই বারবার চাবুক হেনে জাগাতে চাইছেন বাঙালী তথা ভারতবাসীর সুপ্ত বিবেককে। যুগান্তরে তাঁর সম্পাদকীয় কশা তীব্র তীক্ষ্ণ অনন্যসাধারণ। কণ্ঠস্বরে কবির আমেজ। আজ সকালটা যেন আমার জন্যই বসে রয়েছেন।

সহানুভূতি পেয়ে আমি অনেক কথা বলে গেলাম। তার মধ্যে একটি কথা—যত ছোটই হক, এ আমাদের ঐতিহাসিক মিলন, শুধু চিঠিতে সম্ভব হত না।

স্মিত মুখে বিবেকানন্দ চুপ করে রইলেন।

যা-ই বুঝি সানন্দে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। পবিত্রদা ট্রামে তুলে দিয়ে গেলেন। অনেকদিন বাদে যেন খালাস পেয়েছি। জেল থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে নামলাম। 'উল্টো রথ' আফিসে গিয়ে গিরীন্দ্র এবং প্রসাদ সিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নিত্য চষে বেড়াতাম, কতদিন যে এ সব পাড়া মাড়াইনি!

পান এবং চা নিয়ে আপ্যায়ণ করলে প্রসাদ, গিরীন। আমি বললাম, এত যখন বলছ, দাও তবে এক কাপ চা আর পান দু'খিলি। আজ ওষুধ ডাক্তার, হাসপাতালের ১৪৪ ধারা ব্রেক করি। আমার এ আইন অমান্যের দিনটিতে তোমরা হয়ে রইলে সাক্ষী এবং সহায়ক।

একটা হাসির স্রোত বয়ে গেল।

আমি একটা গল্প ছাপার প্রস্তাব করলাম। প্রসাদ, গিরীন তখনি রাজী হয়ে গেল।—কালই পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু। এমন গল্প আমার প্রসাদ, গিরীন অনেক ছেপেছে। প্রয়োজন বুঝে অগ্রিমও দিয়েছে অনেক। যখন 'উল্‌টো রথ' সোজা চলত তখন ওদের এবং আমার গেছে আর একরকম দুঃখের রজনী! আজ প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ সিংহাসনে বসে সে সব কথা ভোলেনি প্রসাদ, গিরীন। প্রীতিভাজন বন্ধু ভাগ্যে সগৌরবে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ভেবে দেখলাম, ওদের কাগজে ছাপার মত একটি গল্পও তো লেখা নেই আমার। তবে কেন এ প্রস্তাব? নিজেকে নিজে কি টেস্ট করছি? আজ কেন এ কৌতুক হল বুঝে উঠতে পারিনে কিছুতেই।

৩।৫।৫৮—সকাল ৮টা-১০টা

ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের প্রেস্‌ক্রিপশনগুলো পকেটে ছিল, ইচ্ছা ওগুলো অমরেশকে দেখিয়ে একটা পরামর্শ নেবো। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম একটা থমথমে ভাব। প্রেস্‌ক্রিপশনগুলো বার করলাম বটে, কিন্তু আলোচনা আর দানা বাঁধল না। নইলে এ সময় এ্যানাটমি, সার্জারি থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত একে একে এসে যায়। অমরেশ শুধু ডাক্তার নয়, রসিক পাঠক একজন। সাহিত্য সম্বন্ধে এর মন্তব্যগুলো বেশ অম্ল-মধুর। বিলম্বিত লয়ে আমার একখানা প্রেস্‌ক্রিপশন পড়লেও তো একটি বলিষ্ঠ আধুনিক কবিতা হয়। শুনবেন মেসো মশাই, পড়ব?

একদিন আমার অসুখ সম্বন্ধে তাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে ধরেছিলাম। সে আর জবাব খুঁজে না পেয়ে বলেছিল—Wait and see ছাড়া আর কি বলব বলুন? শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

আজ দেখলাম, ডাক্তারের এক মাত্র গোলাপ-পাঁপড়ির মত ছেলের একশ চার জ্বর। টাইফয়েড। বাইরেও বিহারী লু চলছে

হুলকায় হুলকায়। বারবার ডাক্তার আইস-ব্যাগ বদলাচ্ছে। টেবিল ফ্যানটা দিচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

কে চিকিৎসা করছেন?

আমার এক বন্ধু।

বুঝলাম, ডাক্তারের এ বিশেষ ক্ষেত্রে সাহস নেই।

ক্লোরামাইসিন দিয়েছেন?

ওর চলবে না। সহ্য হয় না অলকের।

তাই বুঝি ডাক্তার হয়ে নার্সের ভূমিকায় নেমে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে অমরেশ? আমার আর কিছু বলার রইল না। জীবনের যেখানেই জয় পরাজয়ের প্রশ্ন, সেখানেই ঐ এক কথা। এই অভিজ্ঞতা কুড়িয়েই সাহিত্য দর্শন এমন কি দৈনন্দিন পথ চলা।

আজ আর আহারে-বিহারে সারা দিন কোনো নিয়ম-কানুন মানলাম না। 'উল্‌টো রথে' বসে যে আইন অমান্য স্থুরু করেছি, তার নেশায় ধরেছে আমায়। আগে আগে যেমন করেছি, তেমন আজ অনেক ঘুরে, বহুৎ কাজ সেরে বাড়ি ফিরব আমি। বেলে-ঘাটা থেকে স্ত্রী ও ছেলেকে বিদায় দিয়ে দিলাম।

ট্রাম বাস ধরে একেবারে গোপালদাস মজুমদারের কাউন্টারে হাজির।

চিনতে পারছেন গোপালদা?

না ভাই, একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি। দু'টো চোখেই ছানি পড়েছে। তবে গলার স্বরে বুঝতে পারছি, অমরেন্দ্র ঘোষ। এক একজন ডাক্তার এক এক রকম বলছে। কেউ বলছে অপারেশনের সময় হয়েছে, কেউ বলছে, না দেরী আছে। বড় বিভ্রাটে আছি।

ভাবলাম একবার বলি এবার ভিতরের চোখ খুলুন। কিন্তু বলে লাভ নেই। যতক্ষণ রইলাম, শুধু নিজের কাঁদুনিই গাইলেন গোপালদা। এঁদের কাছে রমেশদাদের নজির তোলা বৃথা।

প্রচুর আছে, তবু টিপে টিপে নোট গুনছেন, শোকের শেষ নেই।

৪।৫।৫৮—সকাল ৯টা-১১টা

এবার এলাম আর এক প্রকাশকের কাউন্টারে—খোদ জ্যোতিপ্রসাদ বসু বসে। গোলগাল সদা প্রফুল্ল মুখ। কত কুশল প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা।

আপনাকে ধন্যবাদ—রেডিওতে নাকি চমৎকার সমালোচনা করেছেন আমার ক'খানা সদ্য প্রকাশিত বইয়েব ?

আপনি শুনেছেন ?

না—তবে আপনার নামটা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। যেখানে যাই সেখানেই জ্যোতিপ্রসাদ। ইদানীং কার কার বই ছাপছেন ?

অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি দেখালেন। বললেন, হাত একটু খালি হলে আপনার ছোট গল্পের বইখানা ধরব! সব রেডি করে রাখবেন কিন্তু।

তবে আবার ধন্যবাদ।

জ্যোতিপ্রসাদ হোহো করে হেসে উঠলেন, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমরা জানি, এই বাঙলা দেশেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অর্ধাঙ্গিনী। তিনি ঠিক এমন করে হাসতে পারেন না—কারণ জ্যোতির মত যৌবনের ঢল নেই, নিঃসন্দেহে এখনো বরাঙ্গী। এঁদের সঙ্গে লেন-দেনে একটা নতুন আস্বাদ আছে। এঁরা শুধু চুক্তি নন, আমাদের ছোটখাটো দৈনন্দিন বেদনার সাথী। কত সময় কত দিক থেকে যে উপকৃত হয়েছি! সেবার মেয়ের বিয়ে। ভাগের সংসার, তবু শচীনবাবু যেন নিজের দায়িত্বেই হাত বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুত্বের। দিন চলে যায় কিন্তু রোদ খাওয়ান লেপের উত্তাপটুকুর মত স্মৃতি রয়ে যায় মনে।

এলাম 'পরিচয়' আফিসে, বেশ মজ্‌লিস্‌ জমিয়ে বসেছেন কর্মাধ্যক্ষ। আমাকে দেখে সবাই যেন হকৃচকিয়ে গেলেন। ছিলাম হাসপাতালে—মৃত্যু সংবাদ পেলে বোধ হয় কেউ আশ্চর্য হতেন না—তা নয় এখানে এলাম কিনা সশরীরে হেঁটে!

বললাম, বিস্মিত হবেন না।—আমি সত্যই অমরেন্দ্র ঘোষ নই। তার ভূত: যে ক'খানা বই এই সাত আট মাস ধরে আপনাদের কাছে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে, তার কি গতি হয়েছে জানতে এলাম।

কর্মাধ্যক্ষ লজ্জিত হয়ে বললেন, বসুন। একখানার সমালোচনা হাতে এসে গেছে, আসছে মাসেই যাবে। বড্ড জায়গার অভাব। সিগ্রেট খান?—চা? সত্য গুপ্ত যে কি সাজ্ঘাতিক যাতুকর তা জানি। তাই তাঁর আপ্যায়ন নিতে সাহস পেলাম না। মনুষ্য জন্মে অনেক ঠকেছি; চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েই, চা নেই, দিব্যি প্রীতির দ্রাক্ষারস। সব জিজ্ঞাস্য গুলিয়ে গেছে তখন। এখন ভৌতিক জন্মে।

একটু হেসে বললাম, ও কথায় আর ভুলছি নে। অনুগ্রহ করে লেখাটা দেখান।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রয়েছে। তিনি আজ আসেননি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। আসছে মাসেই ছাপা হবে, চিন্তা করবেন না।

যে কোনো মাসিকের দৈনিকের এ-দপ্তরের কাছে ভূতকেও হার মানতে হয়, এমনি একালের ব্যবস্থা। পরিচয় তবু লজ্জিত হলেন, চাইলেন চা সিগ্যেট খাওয়াতে—এমন অনেক কাগজ আছে যার ফাইলের সমুদ্রে ডুবে গেছে কত ভালমন্দ বই। কল্পনা করে নেয়া যেতে পারে নতুন লেখকের অবস্থা। তবে দহরম-মহরম থাকলে অন্য কথা।

ফেরার মুখে কর্মাধ্যক্ষকে বলে এলাম, তবে আজ আর ভয়

দেখাব না, ও ব্যাপারটা আগামী মাসের জন্য মুলতবী থাক। —নমস্কার, চললাম।

৫।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা।

সময় মত একখানার জায়গায় হু'খানা বইয়েরই সমালোচনা বেরুল। কর্মাধ্যক্ষ হয়ত জীবন্ত ভূতের দ্বিরাগমন বরদাস্ত করতে উৎসাহী নন। তিনি দায়িত্ব পালন করলেন যথাসাধ্য। কিন্তু লেখার নামে এমন অবহেলা আর খুব কমই দেখেছি। না হয়েছে নিন্দা, না হয়েছে স্তুতি, না কোনো নির্দিষ্ট মূল্যায়ন। রমেশদা বলেন, জাতীয় আলস্য! ঘোর তুর্দিন! আমি বলি এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল কি? আমার কাছে কি আপন-পর বিচার নেই? কটু ঠাট্টা ফাজ্‌লামি করলেও সত্যি সত্যি কি আমি ভয় দেখাতে যেতাম? যদি বামপন্থাই সংগ্রাম ও শান্তির পথ হয়ে থাকে, তবে আমার লেখার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ সে ঝংকার তোলেনি কি? যদি সত্যদর্শনের প্রত্যয় ও প্রতীতি সিদ্ধ পথে মহাজনেরা হেঁটে থাকেন, সে পথেও কি আমি চলিনি? সব প্রয়াস কি আমার বিফল হয়েছে? এখন আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই আমরা। আমি অভিযোগ জনতার কাছে পেশ করে রাখলাম। হৃদপিণ্ডের রক্ত ক্ষরণের ফটোগ্রাফ রেখে গেলাম জবানবন্দির ছত্রে ছত্রে। আশা রইল আগামী দিনের মানুষ নতুন মূল্যায়নে বসবে। অধ্যাপক শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানব গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রতিশ্রুতির দ্যুতি নিয়েই আলাপ আলোচনা করে। দেখে আশ্বস্ত হলাম ইতঃমধ্যেই নানা পত্র-পত্রিকার পাতায় নতুন চিন্তা ও ভাষার আয়ুধ শানিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তরুণ লেখক সম্প্রদায়। স্বাগতম দেবীপদ ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পরিচয়' থেকে নেমে ট্রামে উঠে খিদিরপুর ঘুরে বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাত্র তিনটি পয়সা অতিরিক্ত ব্যয়—গড়ের মাঠের সান্ধ্য হাওয়ার প্রলোভন এড়াতে পারিনে আমি। আর আছে

কবি দুর্গাদাস ও হরেন ঘোষের জন্য টান। অনেকদিন এদের সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু এসময় তো ভবঘুরেদের পাওয়া সম্ভব নয়। হাওয়া আফিসের কাছে এসেই মনটা টাটিয়ে উঠল। যদি আরও তিন পয়সা ক্ষতি হয় নেমে পড়ি। দেখলাম, দুর্গার মেসের সার্সি-কপাট বন্ধ।

মানব, শৈলেন্দ্র, হরেন, দুর্গা তখন সিক্স্থ্ ইয়ারের ছাত্র। বাঙলায় এম.এ.-যে দেবে। এদের সঙ্গে আলাপে আলাপে যেন তারুণ্যের এ.সি. কারেন্ট-য়ে স্পৃষ্ট হলাম। আরো অনেকগুলো তারের সন্ধান পেলাম ধীরে ধীরে। এক একদিন শৈলেন্দ্র অধ্যাপনা করত, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সত্য কথা হলেও কোন্ কথাগুলো লিখ্‌লে পাস, কোন্ কথায় ফেল—হেসে হেসে তা-ও বলত সে। বহুচরিত্রের মিলনক্ষেত্র—বহু নদীর পুণ্যধারা, আমি অবগাহন করে যেন স্নিগ্ধ হতাম।

এদের কাছে শিখেছি অনেক, আবার এদের শিখিয়েছিও বিস্তর। তরুণে বৃদ্ধে লেন-দেন কি-যে লাভ, কি-যে ক্ষতি তা আজ টের পেলাম। হাওয়া আফিসের কাছে যেন সে উদ্দাম বসন্তের হাওয়া নেই। তাই সার্সিগুলোও বন্ধ। জীবিকার প্রশ্নে ফাল্গুনের টাটকা ফুলগুলো নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। যাবা আছে তারা হয়ত আর তেমন তর-তাজা নেই।

যদি দুর্গার সঙ্গেও দেখা হত। হরেনও তো ডাক্‌তে পারত! এই গল্পকার কত দিন যে অভাবের ছোটখাটো চোরবালি থেকে আমায় বাঁচিয়েছে!

৬।৫।৫৮—সকাল ৭-৯টা।

হঠাৎ গোপালনগরের মোড়ে এসে নেমে পড়লাম। বছর কয়েক আগে ল্যাণ্ডরেকর্ড আফিসে ট্রেনিং নিয়ে আসায় অভ্যস্ত ছিলাম। সেই অভ্যাসেই ভুল করলাম নাকি? না—আখতাব মসজিদের পথ ধরে এক মন্দিরে এসে উঠলাম। মন্দির বলতে যে

কারুকর্মের ইমারত বুঝি, এবাড়ি তা নয়। নিতান্তই একখানা একতলা ভাড়াটে দালান। শিবতুল্য একটি গৃহী অথচ সন্ন্যাসীমনা মানুষ বসে। এ উপমা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে মোটেই অত্যুক্তি নয়। তাঁর পাশেই বাস করেন যশস্বী দিনেশ দাস। নম্র ভীরু অমায়িক। কিন্তু কবি-কর্মে তাঁর ভীরুতা নেই। মানুষ দেখে কবিকে চেনা যায় না। প্রতিভার এ এক বৈশিষ্ট্য! ভাবলাম—দু'জনার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু শুধু চিত্তরঞ্জনেরই সাক্ষাৎ পেলাম। মৃদু হাসি, মৃদু কথা, মৃদু অভিযোগ-প্রশংসা—তুমি শুভ্র শুচি হয়ে যাবে এ চরিত্র পাঠ করে। বিশ্বের যত গ্রন্থবার্তা বাণী হয়ে এঁর ভিতর যেন মিশেছে। প্রতিবাসী দিনেশ দাস। তাই মসজিদের পথ ধরে যেন তীর্থে এলাম।

ফেরার সময় আশীর্বাদের নির্মাল্যের মত একটা আশ্বাস পেলাম। সেই জন্যই বোধহয় শরীরটা সুবোধ ছেলের মত আশ্চর্য ব্যবহার করল সেদিন। রাত কাটল ভাল ভাবে। দু' একদিন যেতে না যেতে আরো একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

যাঁকে দুয়ারে মোটর ট্যাক্সি তৈরী রেখে সব সময় ধরা যায় না—সেই দক্ষিণারঞ্জন বসু আমার এ ঘরে উপস্থিত। বেলা তিনটা—কড়া রোদ। বুঝলাম নাড়ীর যোগ—শিল্পী সত্তার টান। এখানে বড় ছোটর অভিমান নেই। তাই আমার ঘরে আসা মানে 'ঋদ্ধি সিদ্ধির' 'বিদেশ বিভুঁই' পরিক্রমা নয়—একান্তই যেন 'ছেড়ে আসা গ্রামে' পদার্পণ। তিনি সহৃদয় হৃদয়-সংবেদী অনেক কথা বললেন। জেনেও গেলেম সব। সাহারায় বসে যেমন একখণ্ড কালো জলো মেঘ দেখলাম। তাঁর কাছ থেকেও একটি নির্মাল্য পেলাম আশ্বাসের। কথায় কথায় অনেকটা পথ এগিয়ে গেলাম। এবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এতটা পথ আর হাঁটিনি। ফিরে এলে স্ত্রী অনুযোগ করলেন, একটু আপ্যায়ণও করলে না? আমি বললাম, 'ছেসে আসা গ্রামে' এঁদের যোগ্য সমাদরের কি

আছে বলো? স্ত্রী নিশ্বাস ফেললেন। আমি নই, কে যেন চুপি চুপি বললে, এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। প্রত্যক্ষ না হলেও তখনো কি পরোক্ষে দক্ষিণারঞ্জন উপস্থিত?—উপস্থিত 'জীবন তৃষ্ণা'-র কবি? এই জন্যই কি তাঁরও অপূর্ব দরদী কণ্ঠ শুনতে পাই—

'ও মিঞা ও ইমাম সাব
সেলাম লও আর কইয়া যাও
সংবাদ কিছু জাননি,
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
তারা ফিরা আইবনি।'

৭।৫।৫৮—দুপুর ২-৪টা।

যখন প্রাপ্তি যোগ ঘটে, তখন একের পর এক কি করে যে আসে! রহস্যের পেটি খুলতে যাও দিশা পাবে না। কেবলই আসতে থাকবে। সন্ধ্যাবেলা ভরপুর মনে বসেছিলাম উঠানে। একখানা তক্তপোশে উন্মুক্ত আকাশের তলে বিছানা। ওপরে তারা, মাটিতে ফুল—বাতাসটা আকুল হয়েছে গন্ধরাজের গন্ধে। বেওয়ারিশ গাছ, সকলের ঝাঁটা কুড়ানো মাটির অনুকম্পায় কেমন বলিষ্ঠ হয়েছে। সবুজ ঝাড়, শাদা ফুলগুলোর দিকে চেয়ে কত কথাই যে মনের ভিতরে থৈথৈ করে! আমিও কি আবার আসন্নপ্রসবা কুঁড়ি ও গন্ধে?

জাগরণ সাহিত্য বাসরের সভ্য শিবদাস ভট্টাচার্য এবং শান্তনু শিরমণি এলো আমায় দেখতে। —কেমন আছেন আজকাল? জবানবন্দি কি শেষ হল? সেদিন সভায় বসে যা শুনেছি, খুবই কনস্ট্রাকটিভ রচনা হয়েছে।

এঁরা গোঁড়া বামপন্থী। এদের আলোচনার ধারাও আলাদা। তাই এদের সন্তুষ্ট করা মানে গত জন্মের পুণ্য। মাঝে মাঝে তীব্র আঘাতও পেতে হয়। তবু সুযোগ পেলেই আমি সভা সমিতিতে লেখা পড়ে শোনাই। পুলিশ হলে তো মাঝে মাঝে ট্রেনিংয়ে যেতে হত; সাহিত্যিকের কি কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই? আমি

বহু মন্তব্য চাল্‌নিতে ঝাড়াই বাছাই করে আজো বিকিকিনি করে সুখ পাই। তবে এখন আর তেমন গলা নেই, সময় সময় কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যেন রক্ত উঠতে চায়।

এরাও দু'টি ভরসা দিয়ে গেল। বেশ লোভনীয়।

অনেক ফুলের তোড়া—ফুটি-ফুটি আশার কুঁড়িই বেশী। ফুটলেও কৈফিয়ৎ চাওয়ার উপায় নেই। এখন তাজা। ঘরে উঠাই। ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখি। দেখি আগামী কাল কি হয়? হয়ত ফুটবে, নয়ত ঝরে যাবে। এর বেশি আর এখন ভাববার কিছু নেই।

৮।৫।৫৮—দুপুর ১ ৪ টা

আবার কাগজ কলম নিয়ে বসি। কলকাতা ছাড়ব তখন—তার আগে দিয়ে যেতে হয়, নন্দলাল রায়ের পরিচিতি।

কালিঘাট। নন্দবাবু বাইরের ঘরের ভাড়াটে। আমরা ভিতরের। সম্ভ্রম এবং বিনয়ের মধ্যে আলাপ জমে উঠেনি। একটা তুচ্ছ দাবী-দাওয়া অধিকার নিয়ে ঝগড়ার মাধ্যমে জমে উঠল প্রীতি। আমি কবিসুলভ চপল রোম্যান্টিক ভঙ্গি নিলাম, উনি বিস্তার করলেন যুক্তির জাল। আমি নিলাম দৈহিক শক্তির আশ্রয়, উনি আস্তিক। আমি বোধহয় ওঁর ঘরে প্রথম অনধিকার প্রবেশ করে চেয়ার একখানা দখল করে বসে পড়লাম। ফলে আমি আর উঠতে পারলাম না। এই সেদিনও চিঠি পেয়ে জবাব দিয়েছি—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।

৯।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা

আমার চেয়ে কিছু বয়সে বড় নন্দলাল রায়। তখন একুশ বাইশ। ইতঃমধ্যেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন শাস্ত্রে। বিদেশী এবং এদেশী সাহিত্যেও তিনি

পাঠ করেছেন যথেষ্ট। সবে তখন তিনি গোর্কির বাইস্ট্যাণ্ডার্ড শেষ করে উঠেছেন।

তোমার যা নেই, কিংবা সে মূলধন যখন অতি নগণ্য—তখন অপর্যাপ্ত দেখলে তুমি প্রলুব্ধ হবেই। কিছুতেই উঠতে পারবে না চেয়ার ছেড়ে। জোর করে এ ঐশ্চর্য কেড়ে নেয়া যায় না, তা বোধ হয় শিশুকালেই পড়েছ। তখন একমাত্র উপায় শিষ্যত্ব বরণ করে নেয়া। তোয়াজে ঈশ্বরও তুষ্ট।—মানুষ তো ছার!

নন্দবাবু নতুন পথে আমাকে আবার বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে নিয়ে এলেন। এ-পথ অর্থনীতি এবং সমাজনীতির নীতি দিয়ে বাঁধা। একেবারে কংক্রিট। মার্কস হচ্ছেন এ-পথের প্রথম এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়র। অচিন্ত্যকুমার নিয়ে এসেছিলেন কাঁচা সড়ক ধরে। দেখলাম রসের পথই একমাত্র পথ নয়। দুর্দিনে ঝড়ে বাদলে পাকা সড়ক ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ভিজা মাটিতে কেবলই আছাড় খাওয়ার ভয়। বিশ্বের বৃহত্তম সাহিত্যের মিছিলে আবার আমি এই ভাবে এলাম। নতুন দৃষ্টিতে দেখলাম শ'-কে, নতুন দৃষ্টিতে গোর্কিকে। যুক্তি নির্ভর চিন্তার এখানেই বোধ হয় বীজ মাটি স্পর্শ করল। অল্প পড়ে জিজ্ঞাসু ছাত্র হয়ে অনেক পেলাম। নন্দবাবুর মুখ দিয়ে যে বাণী প্রজ্ঞা নির্গত হত, তা আমার চৈতন্যে বিগলিত হয়ে পড়ত সহস্র ধারায়। আমরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে ভাবে কাটিয়েছি, তা বোধহয় নারী পুরুষেও সম্ভব নয়।

একদিন বড় আঘাত পেলাম। নন্দবাবু বললেন, ঈশ্বর নেই।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে আমি নৈরাশ্যে এবং নৈরাজ্যে পাক খেতে লাগলাম। বারবার এসে আমি যুক্তি দেখিয়েছি। উনি খণ্ডন করেছেন স্মিত মুখে। তারপর অনুরোধ উপরোধ করেছি বিস্তর।—আপনার উক্তি প্রত্যাহার করুন, আমি আর সইতে পারছিনে। সমস্ত ঐতিহ্য যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এমনি হাহাকারে মুখরিতা হয়ে উঠেছিলেন জয়ন্তীরাণী 'কনক পুরের কবি'-র অন্যতম উপনায়িকা। কিন্তু নায়ক-কবি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে বরং দৃঢ়তা দেখিয়ে মোহ মুক্ত করেছিল বাল বিধবা জয়ন্তীরাণীকে। নন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক বছর বাদে উপন্যাস রচনা। তবু দৃঢ়তার নিদর্শন আমি ভুলিনি। নিষ্ঠুর নন্দবাবু আমাকে মোহমুক্ত করলেন। আমার ভিতর থেকে মূর্তি পূজা শেষ হল। তার বদলে জেগে উঠল মানবতাবোধ। রঙিন চশমা খুলে নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছোঁয়ালেন। জগত-টাকে দেখতে শিখলাম, যেমন করে দেখা উচিত এ-যুগে।

আজ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যুগান্তরের যুগ্ম-সম্পাদক। কথা-সাহিত্য, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতায় কৃতী খ্যাতিমান। তখন অল্প বয়স—বেকার অথবা ছাত্র। 'গঙ্গা যমুনা'য় এসে মিশল আর একটি ধারা। কিন্তু তার স্রোতবেগ খরগতি। কবিতা গল্প কাঁচা মিঠা-নয়—একে-বারে পরিপক্ক। বরং বলব 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'। কত রাত যে আমরা তিনজনে পার্কে পার্কে কাটিয়েছি! দুই নন্দ কথা বলত, আমি বেশির ভাগই নীরব হয়ে শুনেছি। আমার লেখনী মুখে শেষ জীবনে যদি কোনো তত্ত্ব মহত্ত্ব এসে থাকে, এই আড্ডার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। কত ফুল ফলের বীজ চারা অঙ্কুর যে আমি কত ভাবে সংগ্রহ করেছি, তার হিসাব দেয়া আজ মুশকিল।

নন্দলাল রায় আমাকে করতেন স্নেহ, আর নন্দগোপালকে সম্মান। মাঝে মাঝে আমি আহত হতাম। কিন্তু আজ অনেক দেখে শুনে আশ্বস্ত হয়েছি। নন্দগোপালের পাণ্ডিত্যর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না বটে, তবে দুর্বল মুহূর্তে চিঠি-পত্র লিখলে আজো আমাকেই স্মরণ করেন নন্দলাল রায়।

সমস্ত স্নেহ প্রীতির নোঙর তুলে একদিন কলকাতা ছাড়লাম!

॥ ত্রিশ ॥

৮।৫।৫৮—সকাল ৬টা-৯টা

তারপর কত ঘাটে ঘাটে যে আনাগোনা! কত বন্দরে যে নাও ভিড়ালাম! কেউ দিলে আশার পণ্যে ভরে, কেউ বা নৈরাশ্যের নোনা জল। কত পাহাড় নদীর হাওয়া লাগালাম! কত স্বাস্থ্যকর জায়গার যে জল খেলাম! কৌটা বোতল শিশি জমল গণ্ডায় গণ্ডায়। শরীর ফিরল, ওজন বাড়ল—কিন্তু একটা ফুটো রয়ে গেল চৌবাচ্চায়। সেই ফুটোটাই এখন বড় হয়েছে। একা ডাক্তার বন্ধু আর যুঝে উঠতে পারছেন না। আরো ব্যয়সাপেক্ষ হিতে চিকিৎসার কিংবা আবার হাওয়া বদলের প্রয়োজন। কিছু অভিযোগ আছে সমাজ ব্যবস্থার ওপর। এমনি ফুটো মেরামত করে আবার সমুদ্রাভিসারে কি আমাকে পাঠান যায় না?

আমি সামুদ্রিক চোরাগোপ্তা পাহাড়গুলোর মানচিত্র এঁকে রেখেছি মনের দর্পণে। জলস্তম্ভ খরস্রোত সাইক্লোনের সংকেত, কি না চিনি! আমার কাঁটা-কম্পাস কখনো দিশা হারায় না—দিক্‌ভ্রম নেই আমার সমুদ্র-জীবনে।

যদি মেরামত চলে রিপিট ঠোকো, তুর্পিন মারো, তীব্র তীক্ষ্ণ আগুনে ঝলসাও তাতেও আপত্তি নেই—শুধু বলি, এখনি বাতিল করে দিও না ভাই। পুরান ইস্পাত সহনে ধৈর্যশীল। আমার বুকে শুধু ঝ'ড়ো বিপ্লবের কথাই নেই, আমি শুনিয়েছি, আরো শোনাবো কত পাতালকন্যার কাহিনী। আজ আমার মেরামতি খরচা নেই, কিন্তু যা কিছু রত্ন মৌক্তিক যেখানে পেয়েছি, তোমাদেরই তো নিবেদন করেছি। হে সমাজ! মরলে দেবে চিতায় মঠ, এ রেওয়াজটা এখনও পালটাও।

চেইঞ্জের থেকে ফিরে আর কল্‌কাতা তিষ্ঠান গেল না। সুরু

হল অজ্ঞাত বাস পর্ব। হাওয়া বদলে তবু সাহিত্যের সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগ ছিল, গ্রামে এসে কিছু পাণ্ডুলিপি এবং দু' একখানা বই বাণ্ডিল করে পঙ্কজিনীর হাতে দিলাম। তিনি কি করলেন তার আর সংবাদ নিলাম না।

প্রথম জীবনে শুধু মাত্র পাঁচটি টাকা পেলাম প্রবাসীতে 'একটুখানি নুন' একটি গল্প লিখে।

বাবার চাকরি নেই, অথচ যৌথ পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে পাহাড়ের মত কাঁধে চেপে। একটু অদল-বদল করো ঘাড, অমনি টের পেয়ে যাবে সাত গাঁয়ের মানুষ—ঘোষ বংশ ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। মাঝ দরিয়ায় জাহাজ ডুবছে। বাবা তবু হাল ছাড়েননি। আমি তখন বহাল হলাম তাঁর নব্য সহকারী। কর্তব্যের ডাকে অনেক সময় প্রাণান্ত হলেও, সাড়া দিতেই হবে।

১১।৫।৫৮ রাত্রি ১-৩টা

একটা বিরাট পরিবার—যার নিত্য পাত-পিঁড়ি পড়ে অতিথি অভ্যাগত ছাড়াও বেলায় একশ-সোয়াশ জনার—তা ধসের মুখে দাঁড়িয়ে। কল্পনা করায় দোষ নেই, ওপরে মেঘের বুনো হাতি দাপাদাপি করছে, পায়ের নীচে নদীর বিরাট ঘূর্ণি। এখন যে কোনো মুহূর্তে ভাঙলেই হল। উপমাটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়—এই আতঙ্কের ভিতব দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। দেখছি যা কিছু বৈজ্ঞানিক চোখে চেয়ে। নন্দলাল রায়ের দৃষ্টি এবার পরীক্ষা করছি সরেজমিনে এসে। আর্থিক ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে আসে চারিত্রিক ভাঙন। পরিবার ভাঙলে গ্রাম ভাঙে। গ্রামের পরই শহর। তারপর সমগ্র দেশ—জাতির ইতিবৃত্ত ধীরে ধীরে কলঙ্কিত হয়। ভবিষ্যৎ মূল্যায়ণ করে এটা ছিল অন্ধকার যুগ।

এই ভাঙনের মধ্যেই আমি 'দক্ষিণের বিল'-এর উপাদান পেলাম। কলঙ্কের ভিতর কল্যাণ। কিন্তু সাহিত্যের জন্য কিছু

সংগ্রহ করা হয়নি। জীবন এবং জীবিকার তাড়নায় যা কিছু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। তখন কি জানতাম এই উপকরণই একদিন একমাত্র সম্বল হয়ে থাকবে নিঃসম্বল অমরেন্দ্রর!

১২।৫।৫৮ রাত্রি ২-৪টা।

হয়ত পাঠক তোমার স্মরণ নেই 'দক্ষিণের বিল'-এর মধ্যেই আমার গ্রামজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা খণ্ডে খণ্ডে রয়ে যেত—এক রঙ্গমঞ্চে বহু নর্তক-নর্তকীর আবির্ভাব। কিন্তু তা হল না স্বনামধন্য প্রকাশকের কৃপায়। বাধা পেয়ে বহুধা হয়ে গেল উপকরণ। ভাল মন্দ সাহিত্য বিচারে কি দাঁড়াল তা আর ভেবে লাভ নেই। পরে বিভিন্ন প্রকাশক মহোদয়দের সঙ্গে চুক্তি করতে সুবিধা হয়েছিল। বাঙলাদেশে এসে মিটিংয়ের শেষে নেহেরুজী যা বলেন, আমিও আজ তা বলি—জয় হিন্দ্! বই লেখার চেয়ে যে লাগান কঠিন!

শহুরে সভ্যতা বর্জিত পূর্ব বাঙলার এক প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে পড়েছি। ডাক বিলি হয় সপ্তাহে একদিন। তাও আবার মাঝে মাঝে বন্ধ যায়। নদী নালা বিল ঝিলে বিচ্ছিন্ন এদেশ। বারমাস নৌকা ছাড়া গতি নেই। জোয়ার ভাঁটা আসে পুকুরঘাট পর্যন্ত। এখানের বিরাট প্রকৃতি ঐশ্বর্যশালিনী। যেদিকে তাকাও জলের মত সব থৈ-থৈ। শুধু পদ্মা-মেঘনায় ঘুরে এর পরিমাপ করা যায় না। সবুজে-শ্যামলে শস্যে-পণ্যে দানে-গ্রহণে এর তুলনা হয় না। এ এক নূতন পৃথিবী। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এখানে খাদ্যাভাব নেই, তেমন দুর্ভিক্ষ কখনো দেখিনি। যার সঙ্গে ঘোর মামলা, তার সঙ্গেই হয়ত সকাল-সন্ধ্যা নৌকা-যাত্রী। কোর্টে গিয়ে তফাত। অসুখ হলে কুশল প্রশ্ন। বাবা হয়ত কেড়ে নিয়েছে জমি, তুমি আবার ফিরিয়ে দিচ্ছ। যে হিংসায় জর্জর, সেই হয়ত একদিন সমবেদনায় অধীর।

তবু সত্যাশ্রয়ী সমাজ একদিন স্বার্থের কুঠারে কাটা পড়ল। মিথ্যার চাপে সামন্ত যুগ শেষ হয়ে এলে, এই সন্ধিক্ষণে আবার

আমার নতুন দীক্ষা। লেখা নয়, এবার শিক্ষা। হয়ত ভাবগুরু বললেন, পদ্মা-মেঘনা দেখেছি, কিন্তু তার নতুন চর দেখিনি জাগ্‌তে। তুমি নতুন পত্তনে বাসা বেঁধে নাও। কাঁধে কাঁধ মিলাও জনসাধারণের সঙ্গে। আমাদের অসমাপ্ত বাক্য তোমাকে দিয়ে সমাপ্ত হক। তোমার পাঠ পুঁথিতে নয়, তোমার পাঠ মৃত্তিকায়। ...'যে আছে মাটির কাছাকাছি...সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি...'। এ কবিতা তখনো আমি পড়িনি, কিন্তু কি-আশ্চর্য ঋষিবাক্য সিদ্ধ করতে দায়িত্ব নিয়েছি।

১৩।৫।৫৮—তুপুর ১-২টা

আজ রোগশয্যায় শুয়ে অনেক কথা ভাবি। আজ সে সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবি নেই, থাকলে হয়ত বলতেন, 'অব্রাহ্মণ্‌ নহ তুমি তাত,...তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত।'.. কত সাহিত্য সভায় যে কাগজে-কলমে কঠোরে-কোমলে তার মূল্যায়ণ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তার জন্য কি তিনি গলা টিপে মারতেন! আমি যে তাঁর ভাবলব্ধ আত্মজ। তাই কি জবানবন্দির প্রস্তাবনায় আমার অজ্ঞাতেই সূর্য-বন্দনা করে এ রচনায় হাত দিয়েছিলাম? তবে আবার বলি, হে পিতা প্রণাম!

১৪।৫।৫৮ বিকাল ৪-৬টা

একটা প্রশ্ন এসে গেছে, খাদ্যাভাব নেই, তুর্ভিক্ষ নেই, একি তবে কল্পনার স্বর্গ? না, এই হচ্ছে সুজলা সুফলা বাঙলার তখনকার রূপ। তবে গ্রাম-জীবন ভাঙল কি করে?

এর জবাব 'পথের পাঁচালি'তে নেই, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় নেই, না আছে 'পদ্মা নদী মাঝি'তে। শেষ পর্যন্ত অবান্তর 'ট্রেজার আয়লর্যাণ্ড' জাতীয় অবিশ্বাস্য গল্প। অমন দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সত্যতাও নেই পূর্ব বাঙলার কোনো স্থানে। আমিই বলেছি মানিক ইতিহাস হলেন, আবার আমিই বলছি, মানিকের সবটাই মাণিক্য নয়, অনেকখানি বক্তব্যে অসমুজ্জ্বল নিরেট

পাথর। তাই এত বড় প্রতিভার পক্ষেও মহৎ সাহিত্যে উত্তরণ সম্ভব হল না। তিনি বুদ্ধিকে জয় করলেন, হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারলেন না। তিনি জীবনের কুটিল জটিল আংশিক রূপ দেখলেন বটে, কিন্তু বড় উলঙ্গ করে, শনির কোপ দৃষ্টিতে। তাঁর হিসাবে তিনি চরম আদর্শবাদী। এবং যে আগুন সাহিত্যে জ্বালালেন সেই লকলকে শিখায় নিজেকেও বুঝি আহুতি দিলেন। বাঙালী পাঠক সমবেদনা সহানুভূতিতে কাঁদল, কিন্তু তিনি কোনো দিকে না তাকিয়ে অকালে চলে গেলেন।

বহু ত্রুটি থাকলেও মানিক বাঙলা সাহিত্যের ভূগোলে এক নিষ্ঠুর দুঃসাহসিক নাবিক। এবং পূর্ববঙ্গের ভূগোলে হয়ত প্রথম পথচারী। তাই তিনি নমস্য।

সমস্ত কল্লোল যুগেও আমার প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ জবাব নেই। তারপর দীর্ঘ গড্ডলিকা প্রবাহ। যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা অনেক লিখলেন। কেউ পঞ্চাশ, কেউ একশো খানা বই। কিন্তু ধোপে টিকল না একখানাও। আজকাল তো একেবারে বৈশ্য যুগ। মলাট হল সাহিত্যের চূড়ান্ত ললাট। আর শঠ-সংস্করণ দিয়ে হয় মূল্যায়ণ। এটা প্রায় বনস্পতির যুগ। তাই খাঁটি ঘি বড় দুষ্প্রাপ্য।

বাণী বক্তব্যের যাঁরা চমক দেখালেন উপন্যাস এবং গল্পে তাঁরা কেউ কেউ আদর্শ ত্যাগ করে শেঠজীদের অঙ্কশায়িনী হলেন। আর কেউ কেউ বা নানা কারণেই লেখা দিলেন ছেড়ে। ১৯৫৯-এ এই জবানবন্দি কিছু ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে দেখছি দল উপদল কঠিন দানা বেঁধেছে সাহিত্যে। এখন তো পুরোপুরি কূটনীতির মশানে এসেছেন কলা-লক্ষ্মী। মানিকের প্রতিভার ট্রেডমার্ক জাল করছে বীভৎস যৌন বিকার। যা কিছু মহৎ সংজ্ঞা তা প্রায় নির্বাসিত। ঘোর নৈরাশ্য। তবু ভরসার কথা নারায়ণ চৌধুরী, দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতির শানিত কলমের ডগায়

বহু পাঠকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতি অনিবার্য। গরল মন্থন করে অবশ্য জন্মাবে অমৃত।

যুদ্ধোত্তর যুগে আমি এলাম। কি বলব, হয়ত ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, নয়ত কোন্ দুর্জ্ঞেয় শক্তির টানে কেন আমিই আমার প্রশ্নের জবাব হয়ে এলাম? সভ্যতা ভাঙে অসমবণ্টনে, মনের, অর্থের অথবা ভূমি ব্যবস্থার। তুমি আমার যে কোন উপন্যাস অথবা ছোট গল্প খোলো এর নজির পাবে। আমি সার্বিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করেছি। যে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ গৌণ ছিল সাহিত্যে, তাদের রক্ত মাংসে মননে মুখ্য করতে ঘাম ঝরিয়েছি। আমি শিশির ভাদুড়ীর মত পরচুলা লাগিয়ে বাঙলা ভাষায় আলমগীরের পাঠ বলে হাততালি নেইনি। আমি জীবন্ত আলমগীরকেই আনতে চেষ্টা করেছি, নয়ত মারাঠার জয়তু শিবাজী। আশা করি, পাঠক তোমার উপমাটা বোঝা কঠিন হবে না। শ্রদ্ধেয় শিশিরবাবু নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নই। আমার লেখায় আমার কালের মানুষই কুশীলব। বেদে-বেদেনীর কথা, হিন্দী, ফার্সি, উর্দু, নেপালী, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, শিখতে হয়েছে অনেক রকম। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জীবনবোধও অধ্যয়ন করতে হয়েছে প্রচুর। আমি পরচুলা নই, আসল দাড়ি গোঁফ। আমি বর্তমানের ইতিবৃত্ত। কিন্তু আমাতে রয়েছে বিগত অনাগত।

১৫।৫।৫৮—সকাল ৭-১১টা

আমি অহংকার নই, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ কল্লোলের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যেমন ফুল থেকে ফল, পিতা পিতামহের রক্তে পুত্র পৌত্র ইত্যাদি। সে দৃষ্টিতে আমি বঙ্গ-ভারতী, মহাভারতী, বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গমতীর্থ। তবু আমি শুধু জীবনে জীবন যোগ করার অকিঞ্চিৎ প্রয়াস মাত্র। স্থান কাল মাহাত্ম্য হচ্ছেন যতো পূর্বসূরি আচার্য গুরুজন।

আমি বহু ঈপ্সিত জীবনের স্বাদ। কিন্তু কালের বড় সকালে

এসে পৌঁছেছি এদেশে। হয়ত সকাল সকালই চলে যেতে হবে। তাই প্লাটফর্মের পাথরে উপস্থিতি জানিয়ে যাই। এখানে লজ্জা করা গর্হিত। আমার তো বিশ্বভারতী নেই। না তেমন আশা রাখি আপাততঃ আসবেন বন্ধু বসওয়েল। এত ডাইরী রেখেছে রামপরায়ণটাও যদি মানুষ হত!

॥ একুশ ॥

আমি কথা-সাহিত্যে নীতিতে বিশ্বাস করি। সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার দেখতে ভাল, কিন্তু মানুষের চিরন্তন মন গন্ধলোভী। এই সুগন্ধই নীতি। ইদানীং নারায়ণ চৌধুরী কতগুলো প্রশ্ন তুলেছেন 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবন্ধ লিখে। প্রবন্ধগুলো যুক্তিতে ক্ষুরধার এবং মৌলিক, উদ্ধৃতি কণ্টকিত নয়: স্বভাবতই শিবনাথ শাস্ত্রী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি শ্রীচৌধুরীর মূল সত্যটা স্বীকার করি, নীতিহীন হয়ে সমাজে যেমন বাস করা চলে না,—তেমনি সাহিত্যে আসুক অশ্লীলতা, আসুক অতি বাস্তবতা, কুৎসিত আসুক, সুন্দর আসুক, কিন্তু যোগফল হবে সত্যের সন্ধানে ক্রান্তি যাত্রা। দু'খানা মহাকাব্য আমাদের হাতের কাছে রয়েছে—রামায়ণ মহাভারত। অনেক চরিত্রের খুঁটিনাটি যুক্তি পদ্ধতি আমরা এ যুগে বসে ষোলআনা স্বীকার করতে পারিনে—যেমন যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা, ভীষ্মের মত বীরের কুরুসভায় ভীরুতা প্রকাশ। দ্যূতপণে যাজ্ঞসেনী বিকিয়ে গেলেন, তবু সব জড়িয়ে এঁরা এখনো সমাজে আদর্শ। কারণ সমগ্র কাহিনী হচ্ছে সত্য উদ্‌ঘাটনের বেগবতী নীলগঙ্গা। তাই রাম লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠির অর্জুন আজো মহানায়ক। এখানে বীভৎস অশ্লীল তলিয়ে গেছে পুণ্যধারায়। জীবনটা শুধু 'ইট্ ড্রিঙ্ক' আর, 'বি মেরি' নয়।

এই নৈতিক আদর্শ সেদিনও সজনীদার কলমে লক্ষ্য করা

গেছে। সামন্ত সিংহ বুঝি রুদ্ধ অপমানে গর্জে উঠেছিলেন এ বয়সে। বাঙালী পাঠক ভয়ে বিস্ময়ে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি করে উলটে পালটে দেখেছিল 'শনিবারের চিঠি'-র সংবাদ সাহিত্য। আমার রোগশয্যা পর্যন্ত এসেছিল ঢেউ। 'পরশুরামের তেজোহরণ' 'হাসি খুশির যুদ্ধ' ব্যঙ্গ রচনায় যেন পাহাড়ী বিছের কামড়, বললে রামপরায়ণ এসে। তবে প্রথমটা তর্ক তুলবে, দ্বিতীয়টা ইউনিক।

আমি বলি পড়িনি, কি জবাব দেবো।

হ্যাঁরে সত্যি?

রমেশদা বললেন, সজনীকান্ত ইন্ হিজ ফুল্ ফর্ম এগেইন।

১৬।৫।৫৮—সকাল ৬-১০টা

একটি নবাগত সাহিত্য-রসিক যুবক বললে, কাছে থাকলে সজনীদার পায়ের ধুলো নিতাম।

এ অম্ল মধুর হুল। হেসে উঠব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভাবিয়ে তুললে। আজ উনিশ' আটান্ন পনরই মে। চারিদিকে কি দেখছি? দুধে ও ওষুধে ভেজাল। ওপর মহলে দুর্নীতি। ছাত্র বিদ্রোহ। উদ্বাস্তুদের অসহায় পরিণাম নানা। প্রতিশ্রুতির চরম ব্যর্থতা, শ্রমিক বিক্ষোভ। কাশ্মীর এবং নাগা প্রশ্ন। মধ্যবিত্ত অসন্তুষ্টি। সমাজের শিরায় শিরায় কালো-কারবার। সাহিত্যের নামে চুরি এবং যা খুশি পুরস্কারের সততা সম্বন্ধে নাবালক ছাত্রেরও সন্দেহ। আন্তর্জাতিক সমস্যায় ঝড়ো সংকেত, সর্বোপরি শোষণ, এই নৈতিক অবনতির দিনে, স্ফুলিঙ্গের মত নীতিবোধ কোথাও উচ্চারিত হলে, সাধারণ মানুষ, পিষ্ঠ দলিত মানুষ সম্বর্ধনা জানায়। সে তখন বিচার করে না সজনীকান্ত, না দেব জ্যোতি বর্মন, না বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অথবা বর্তমান বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু। নিমজ্জিত মানুষ একটা খুঁটি ধরতে চায়।

এই নীতি মেনে চলার জন্য দেখেছি নিরক্ষর চাষী আদিত্যর ঘরে বার বার আগুন দিতে। জবান দিয়ে ফিরতে পারল না

বলে, সমাজ-বিরোধী গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিলে কৃষক আবছুল কাদের। এ দু'জনার আমাদের গাঁয়েই বাড়ি। এদের শ্মশানে কেউ স্মৃতি স্তম্ভ গড়েনি, না গোরস্থানে মিনার। কিন্তু আমি মুগ্ধ অভিভূত হয়ে এদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখেছি।

এই নীতি এবং কল্যাণ বোধই আমার সাহিত্যের জারক রস। তবে কথা-সাহিত্যে পরিবেশনের ধর্ম আলাদা। গল্প আগে গল্প হওয়া চাই।

আবার প্রশ্নের সুতায় জড়িয়ে গেলাম। গল্প উপন্যাসের কি কোনো নিয়মপদ্ধতি গ্রামার আছে? নিশ্চয়। সেকালের মহাকাব্য মহাভারতকে বাদ দিয়ে একালের একখানা ক্লাসিককে ধরা যাক—ওয়ার এ্যাণ্ড পিস্। বর্ষামুখর বেগতীব্র কাহিনী যত সাগরমুখী হচ্ছে, দুপারের দৃশ্য ততই বদলাচ্ছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলো ক্রমবিকশিত হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য, বক্তব্যের জন্য। কিন্তু সুষম সমবায় বজায় রেখে। সাত আটশ পাতা লিখল শিল্পহীন প্রসাদগুণবর্জিত বর্ণনা, খুব জোর তার ভিতর শ'খানেক পাতা আদি রস কিংবা যে কোনো রসের অযৌক্তিক সংমিশ্রণ, এপিকের ধর্ম নয়। এ সব হচ্ছে শৌখিন মজদুরী। তার চেয়েও ভাল করে বলা যায়, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে, বিশেষ করে অপাপবিদ্ধ তরুণ মনকে বিভ্রান্ত করার বাণিজ্যিক কৌশলমাত্র।

তবে কি নতুন কিছু ফর্ম টেকনিক আসবে না? নতুন শিল্প-নৈপুণ্য?

অবশ্য আসবে। আমরা স্বাগতম বলে হাতজোড় করব। কিন্তু তাদের আসতে হবে পুরাতনের স্বীকৃত বহুমুখী প্রতিভাকে বন্যায় ছাপিয়ে। ঠিক পাতা গুণে যেমন এপিক হয় না, তেমনি হয় না নতুন পরিবেশের চমকে। বড় গল্প কিংবা উপন্যাসের ধর্ম, বড়। তেমনি ছোট গল্প ক্ষণধর্মী, থাকবে লিরিক মূর্ছনা।

১৭।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা

একটু আগে সজনীকান্ত এবং নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে গোপাল হালদার ও অচ্যুত গোস্বামীর নাম উচ্চারণ করেছি বলে আমাকে কেউ ভুল বুঝ না। পথ এঁদের বিভিন্ন, কিন্তু মূল শাদা কালো এঁদের চোখে অভিন্ন। গোপাল হালদার অচ্যুত গোস্বামীর যা কিছু আমি পড়েছি, তা আদর্শে বক্তব্যে প্রজ্জ্বলন্ত বহ্নিদীপ্তি। নীতিবাদে পূর্ণগর্ভা।

এখানে শিবনারায়ণ রায় ও জগদীশ ভট্টাচার্যকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন "গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ" লিখে একদিনে প্রতিবাদে প্রতিবাদে যশস্বী হয়েছেন, আর একজন বহু মধুক্ষরা যুক্তি সমৃদ্ধ প্রবন্ধে নিবন্ধে। এঁরাও আমার বক্তব্যের সমর্থক।

এবার জিজ্ঞাস্য হতে পারে নীতিটা কি? বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তুচ্ছ অমরেন্দ্র বারবার তা তোমাদের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। যদি তাতেও না বোঝো, অনুগ্রহ করে টালিগঞ্জ ব্যারাক বাড়িতে এসো। একশ আট ডিগ্রি হিটে অ্যাসবেসটার ছাউনির তলে স্মিত মুখে বসে রয়েছেন আচার্য! তিনি বলবেন, হে তাত! ভিতরে অবলোকন করো। জ্ঞানের চোখ খোলো।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের গ্রাম-জীবনের কাহিনী সুরু করে এলাম কিনা নীতি ব্যাখ্যা করতে! ইচ্ছা ছিল কত ঝড় তুফানের কথা বলব, দেখাব বিল নদীর ছবি, আপাতত তা আর সম্ভব হল না। প্রথম থেকেই তো আমি পারম্পর্য মেনে চলিনি। যদি পাঠক অধীর হও একখানা 'দক্ষিণের বিল' খুলে নিয়ে বসো। প্রকৃতিতে ডুবে যেতে পারবে, দেখতে পাবে ধানের চাষ, গন্ধ পাবে নেবু ফুলের, হয়ত সামলে না থাকলে ভিজিয়ে দেবে বর্ষার পশলা পশলা বৃষ্টি!

না, তুমি দেখি আগের প্রসঙ্গই শুনতে চাও, ধন্যবাদ।

গল্প কি করে গল্প হয় এই সময় সেই আলোচনাটা তবে সুরু করি।

হয়ত আমার বই অনেকেই তোমরা পড়োনি, কিন্তু নিশ্চয় পড়েছ শরৎ বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ। অল্প বিস্তর বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গেও তোমার পরিচয় হয়েছে। আধুনিক কালের পাকা গল্প লেখকদেরও তুমি অবশ্য চেনো। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতিটি গল্পের প্রথম লাইনে চোখ বুলালে শেষ লাইন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় কেন?

এর জবাব কি নিজের মনের ভিতর কোনো দিন খুঁজে দেখেছ? ঘরের কথা আর বলব না, বিশ্ব-সাহিত্যেও শরৎচন্দ্রের তুলনীয় গল্পকার আছেন মুষ্টিমেয়। এর কারণ শুধু বক্তব্য বিচার নয়, প্রসাদগুণ। ইদানীং ধীরে ধীরে এই প্রসাদগুণের স্থান বুদ্ধি এবং ভাষার চাকচিক্যে বেদখল করছে। মুখের বদলে আসছে মুখোশ—নারীর বদলে যেমন শাড়ি। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি লাইন পেরিয়ে পংক্তি, পংক্তি পেরিয়ে পৃষ্ঠা, তারপর পরিচ্ছেদ। সব একত্র করলে ঝর্ণা থেকে সাগরমুখী নদী-বেগের কথা মনে করিয়ে দেয়। যিনি যে গৌরবের মুকুট পেয়ে থাকুন, তা শরৎচন্দ্র কেড়ে নিতে পারবেন না—কিন্তু শরৎচন্দ্রের এ আসনও কেউ টলাতে পারবেন না। সহজ সরল প্রসাদগুণে জড়ো জড়ো যে গল্প বাঙলা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ ছিল, তা তিনি দিয়েছেন অনেক। এবং এক্ষেত্রে প্রথম পুরুষই বলা চলে। তাই জাতির জীবনে তিনি গভীর রেখাপাত করে অমর হয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে, ভারসাম্যে, মনস্তত্ত্বে প্রচুর ত্রুটি, তবু তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার বিশ্বে। সবিনয়ে বলছি, মম, টুর্গেনিভ সে প্রতিভার অধিকারী নন।

১৮।৫।৫৮—রাত্রি ৩-৪টা

খাদ্য বিভাগ থেকে বিদায় নিচ্ছি। উনিশ' তিপ্পান্ন। সত্য-বন্ধু ভৌমিক অগ্রণী হয়ে বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করলে। প্রধান অতিথি কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি সভায় এসে একান্তে আমায় ডেকে বললেন, আপনি অসন্তুষ্ট না হলে একটা কথা বলি,

আপনাকে সাহিত্যের কোনো কৃতী পুরুষের সঙ্গে তুলনা করতে চাই।

এ হেন বিদগ্ধ জনের মুখে এ উক্তি শুনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। বললাম, আপনার যা খুশি তা করতে পারেন। আমাকে জিজ্ঞাসার কি আছে?

আপনি যতটা মার্কসিস্ট, তার চাইতে বেশি হিউম্যানিস্ট। সেই জন্যই অনুমোদন চাইছি।

এ ব্যাখ্যা তো এভাবে রামও কখনো করেনি। শুনে আবার বিস্মিত হই।

কাজী আবদুল ওদুদ বললেন, শরৎচন্দ্র জীবনের শেষভাগে সংকল্প করেছিলেন মুসলমান সমাজের চিত্র তিনি যা জানেন অঙ্কিত করে যাবেন। কিন্তু তার সময় তিনি পাননি।···শরৎচন্দ্রের মত দরদী শিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষ যেন তাঁর গুরুকৃত্য পালন করলেন।··· লেখক বামপন্থী।···

প্রসঙ্গান্তরে তিনি আবার Contemporary Indian Literature (p. 30)-এ বললেন, His 'Charkashem' is a memorable production of our time.... But Ghosh is more a humanist than a leftist.

আমি আমার অজ্ঞাতেই শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গি হজম করে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিলাম। অথবা আর একটু অন্তর্দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, এ বাঙলা দেশের মৃত্তিকারই নিজস্ব ভঙ্গি—যা মা দিদিমার মুখে শুনেছি। এখন প্রায়ই দেখা যায় ভাষার চমকপ্রদ কংক্রিটা। যেন 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ' নাটক—যত টানো শেষ নেই। দুঃশাসনই ক্লান্ত। পাঠক তো দর্শক—দেখে শুনে তার চক্ষু স্থির।

রবীন্দ্রনাথ আমার ভাবগুরু, শরৎচন্দ্র গল্পের গুরু—বাকী গুরু যাঁরা আমায় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছেন। এ পৃথিবীর চরণ প্রান্তে

আমি শিষ্য প্রণতি জানাই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমি যেন শিখে যেতে পারি। জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে এখনো তো নুড়ি কুড়ানও সুরু করিনি।

১৯।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা

কিন্তু সিঁড়ি টানার হুকুম এসেছে—বন্দর থেকে নোঙর। এবার অন্ধকারে যাত্রা। এ যাত্রা সমাপ্তির। এখান থেকে কেউ ফেরে না। ওয়ার্নিং বেল বেজেছে, শেষ শিগ্‌ন্যালের যে ক'টা মুহূর্ত দেরী। তোমার আমার হিসাবে হয়ত ক'টা বছরও গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু কালের ক্যাপটেনের কাছে মুহূর্তের সমষ্টি। সম্রাট, ভিখারী, দার্শনিক, সৈনিক এ অগস্ত্য যাত্রার অন্ধকার থেকে কেউ আজ পর্যন্ত বাদ যায়নি। আমারও আশা নেই।

হে রবীন্দ্রনাথ! এখন কবিপক্ষ চলছে। কাল তোমার জন্মতিথি পালন করে এসেছি হাঁপাতে হাঁপাতে। এটি প্রথম ও শেষ এ বছরের জন্য। গত বছর সারাপক্ষব্যাপী যে কত প্রণতি জানিয়েছি। আবার দুর্জয় রাগে অনুরাগে তীব্র সমালোচনাও করেছি। বলেছি, তুমি নিষেধ করেছ শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলাতে। তুমি শৌখিন মজদুরীর প্রতি করেছ ঘৃণার প্রস্তর নিক্ষেপ। হে পিতা তোমারও তো সব লেখা 'কাব্যে উপেক্ষিতা' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ' নয়। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' 'পোষ্টমাষ্টার' দিয়ে কি গল্পগুচ্ছের কলেবর না বাড়ালেই চলত না? শরৎচন্দ্রের তো এমন স্ট্যাণ্ডার্ড ফল্‌ করেনি কখনো।

তুমি কোনো জবাব দাও-নি। ছবির আড়ালে রয়েছ স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে। একি তোমার উপেক্ষার হাসি?

আজ রোগ শয্যায় শুয়ে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করি। তুমি বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। এ স্বীকৃতির সহায়ক ছিল নাকি তোমার রাজপৌত্র বংশ পরিচয়, অনঙ্গ সুন্দর খ্রীষ্ট তুল্য কান্তি, সব ছাপিয়ে অজস্র সুবর্ণ মুক্তার ফুলঝুরি? তুমি কি দু'হাতে সোনা

ছড়িয়ে প্রতিভার বরমাল্য আনো-নি? নইলে খ্রীষ্ট হলেও ওদেশের চোখে নেটিভ। ওদেশের লোক বর্ণবৈষম্যে কত যে সেনসেটিভ, তা নিগ্রো পার্দিংয়েই দেখছি।

ওদেশের লোকের মালা দেখে এদেশের লোক আরো মালা নিয়ে ছুটেছিল। তুমি অভিমানে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলে যত মালা। তুমি দাস মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করো। কিন্তু এখনো যে মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিমান সমাজটা সেই পথেরই যাত্রী। আমরা কিন্তু এই ভীরুদের অনায়াসে ক্ষমা করি।

কিন্তু জীবন দেবতা তবু প্রশ্ন থেকে যায়। তুমি অতুলনীয় প্রতিভা, কিন্তু ভারতের মাটিতে কি একান্তই মৌলিক? তুমি দিয়েছ অনেক কিন্তু তার বদলে কি পাওনি আরো বেশি? তবে দিকে দিকে এ পূজা অর্চনা প্রশস্তি বন্দনা কেন? একাল হতে আগামী কাল পর্যন্ত? লক্ষ গান গেয়ে, নিরক্ষর চাষীর ঘর থেকে রাজার ঘর পর্যন্ত প্রতিভার দীপ জ্বালিয়ে সাধক রামপ্রসাদ তা পায়নি কেন? হচ্ছে না কেন ব্যাস বাল্মীকীর একটিও জন্মতিথি পালন? তুমি তবে সবটাই সত্য নও, অনেকখানি আরোপিত। বশ্য দাস্য নাগরিক শিক্ষার বাহুল্য। তাই বুঝি তুমি কৃষকের গলায় নেই, নেই কলকারখানায়। নেয়ে মাঝি তোমায় তাই হয়ত চেনে না। চেনে না জনসাধারণ। ওরা শুধু কাজ করে নগরে প্রান্তরে! তুমি বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হও-নি। তবু তুমি ব্যাখ্যাত হও অখণ্ড—যেন ব্রহ্মের মত ত্রুটিহীন। আমার শুনে দুঃখ হয়, এ ব্যাখ্যা না শিক্ষিত মনের স্তাবকতা?

তোমার কথায় বলি, ওদের কতগুলো ফলবান মুহূর্তকে আমি এনেছি সভ্য সমাজে। কত দুঃখ বেদনায় যে এনেছি, তা যদি জানতে, গায় হাত বুলিয়ে দিতে মায়ের মত স্নেহে। কিন্তু স্বীকৃতি পাইনে কেন তোমার অজস্র অযুত বন্দনার লক্ষ কোটি ভগ্নাংশ?

আমি আর আমার কথা ভাবিনে—ভাবি যারা কাজ করে যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে।···

আজো তুমি নিরুত্তর, তুমি মৃত্যুর আড়ালে জীবন্ত কিন্তু।

এর কি কোনো জবাব নেই তোমাতে ? তবে তোমাকে ক্ষমা করি তাত।

একবার আমি এর জবাব দিয়েছি। আবার স্মরণ করিয়ে দেই গীতার বাণী—মা ফলেষু কদাচন !

॥ বাইশ ॥

২০।৫।৫৮ সকাল ৭-১০টা

সংসারে ঢুকেই বুঝেছিলাম, কেন মানুষে বলে বিষয় বিষ। ভূমি ব্যবস্থার অন্ধ্র-রন্ধ্রে জাল-জুয়াচুরি দাঙ্গা-মামলা হিংসা-দ্বেষ। সব চেয়ে মারাত্মক দিনের পর দিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলা—যে প্রতিশ্রুতি কোনো দিন তুমি পালনের নৈতিক দায়িত্ব নেবে না। এক কথায় দেখলাম বিষয়ের সবটাই বিষ, শুধু কলসীর মুখে একটুখানি যা ক্ষীর। সামন্ত যুগ তখন ভেঙে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত। দেখে শুনে দম বন্ধ হয়ে এলো। এ পাপ কলসী থেকে কি পালিয়ে যাওয়া যাবে না ? হায় কলকাতা, হায় কবি প্রতিভা উন্মেষের দিনগুলি !

বাবা ভাঙছেন, তবু মচকাতে চাইছেন না। বলছেন, এখনো যা আছে তা রেখে-বেঁধে তদারক করে খেলে তোদের একপুরুষ রাজার হালে কেটে যাবে। এমন সব দলিল রয়েছে যার জন্য এ ভূসম্পত্তি কেউ পাট্টা-কবলা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ভোগ করতে পারবে ইচ্ছামত। কখনো মা ওয়ারিশ, কখনো ছেলেরা, আবার কখনো বা মেয়েরা।

বাবা দলিল দেখালেন নানা রকম। আমি এ জ্ঞান-সমুদ্রের তটে

তখন সবে মাত্র শিক্ষানবিশ। বিস্ময়ে হতবাক। এক এক দলিলের এক এক চরিত্র পরিচয়। কত দাঙ্গা হাঙ্গামা চোখের জল যে রয়েছে হয়ত সামান্য এক টুকরা জমি নিয়ে। কত ক্ষুধার্ত মানুষ যে গেছে উৎখাত হয়ে! আমরাও ধ্বংসের মুখে। বুঝতে পারলাম কেউকে নিরন্ন করে রেহাই নেই। মিথ্যার শেষ হচ্ছে মিথ্যায়—বিনাশে।

আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সেই হাঁপানিটা কি এত কাল যাপ্য থেকে আবার বেড়েছে? অনেক শোষণের রক্ত তো রয়েছে এ দেহে। অনেক মিথ্যার বেসাতি।

কলসীটার ভিতরে বসে কেবলই নাকানি চোবানি খাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই ভাঙতে পারছিনে ভিতর থেকে লাথি মেরে। এমনি দুর্নীতি কালোকারবারের কলসীতে তুমিও কি আজ হাবুডুবু খাচ্ছ না? আমি অভিজ্ঞ হতাশ হতে নিষেধ করি। শুধু বল সঞ্চয় করে রাখো, আর যতদূর সম্ভব ম্যান-পাওয়ার। বার থেকে যখন সত্যের হাতুড়ি পড়বে, তখন তোমরাও পা চালিও। যৌথ ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে বিষকুম্ভ। শ্রেষ্ঠী সভ্যতা সমষ্টির হাতে আসবেই। কিন্তু সেখানেও চরিত্র চাই, মানুষ চাই প্রেমিক: ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টি গড়ে না—সপ্ত সুরের সুসম সমন্বয়েই তো ঐকতান।

কেত্তায় কেত্তায় মামলা—ফৌজদারী আদালত। তার সঙ্গে যোগ হল বকেয়া খাজনার নালিশ। আঘাতে আঘাতে বাবা যেন ক্ষেপে গেলেন। ছিলেন ধর্মভীরু, হয়ে উঠলেন হিংস্র। আয়ের সঙ্গে এখন আর ব্যয়ের সঙ্গতি নেই। অথচ বজায় রাখতে হচ্ছে মস্ত মান মর্যাদা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড দোল দুর্গোৎসব। যাঁদের এতকাল প্রতিপালন করেছেন, তাঁহাদের বা কি করে বলবেন তফাত যাও, তফাত যাও। শত্রুরা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে চারিদিকে। সারা বছরের খোরাকি নেই ঘরে। চাকরিটাও গেছে ষড়যন্ত্রে। বাবাও আবার উলটে আঘাত দিতে লাগলেন—এক পাই-র জমায় আর্জি দিয়ে হাইকোর্ট। মামলা তো নয়, মৃত্যুকে নিয়ে যেন মহরত।

একটা পরিবার ভাঙছে—সাম্রাজের মত যৌথ পরিবার। তবু দাবা-পাশার চীৎকার চলছে আটচালার প্রাঙ্গণে। তামাকের ধুনি জ্বলছে। হুঁকো ঘুরছে ব্রাহ্মণ কায়স্থ হিন্দু মুসলমানের ক্রমিক আভিজাত্যের তকমা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এবং বাবারও মাথা ঘুরছে।

অন্ন নেই, সাম্রাজ্য ভাঙ্গছে—আরো অন্ন চাই, ফসল চাই নানাবিধ। আরো ফসল ফলাও—আরো।

এই শপথ নিয়ে আবার হাল লাঙল—খাসে ধান চাষের পত্তন। একদিন এই হালুটিই আমাদের ছিল দূরে দক্ষিণের বিলে। পরে আমি সে পর্যন্তও ধাওয়া করেছিলাম গরু মোষ নিয়ে—সপ্ত ডিঙা সাজিয়ে। সে বর্ণনা রয়েছে আমার উপন্যাসে। "দক্ষিণের বিল" পড়লে আর কিছু না হক তোমার ইচ্ছা করবে সোনালী ফসলের লাবণ্যে ডুবে যেতে। স্বাধীন রাষ্ট্রে এসে যখন আমি নিরন্ন, পশ্চিমবঙ্গে রিফিউজি, তখন আমি উপন্যাসের জারক রসে প্রথমেই বলতে আরম্ভ করেছি, উপোসী জাতটাকে বাঁচাও, আরো ফসল ফলাও হে কল্যাণব্রতী!

২১।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা

ভাঙার ভিতরই গড়ার আস্বাদ পেলাম খাসে চাষ জুড়ে। অঙ্কুরে বীজধানে প্রাণের স্পন্দন। আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম নতুন সৃষ্টিতে। দায়িত্ববোধের একটা মাদকতা আছে। এতগুলো মুখের জোগাতে হবে দানা—এমন একটা পরিবারের দূর করতে হবে হতাশা। আমি ঝড় তুফান রৌদ্রের মধ্যে যেন নেশায় মশগুল হয়ে খাটতে লাগলাম। ভাঙা স্বাস্থ্যও জোড়াতালি দিয়ে চলল বেশ। দামী ডাক্তারী ওষুধ বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলাম। এবার টুকটাক কবিরাজী, নয়ত মুষ্টিযোগ। তারপর স্রেফ খাই-সোডার ওপর নির্ভর। মাসে পাঁচ পো সোডা খেতাম আমি।

কিছুদিন পাটনা ছিলাম। মামা শ্বশুর নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার এখন প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনারিং কলেজে। তখন একজন বড় অফিসার। অত্যন্ত হৃদয়বান লোক। মামী শাশুড়ীও তেমনি। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক দেখালেন। ক্যালসিয়াম এবং নানাবিধ ইনজেকশনে শরীর বাড়ল দশ সের। কিন্তু পেটের ও বুকের ব্যথাটা কমল না মোটেই। ডাক্তাররা একসঙ্গে রায় দিলেন—আর বড় জোর আমি বাঁচব ছ মাস।

অনেক যত্ন করেছেন মামা শ্বশুর—অনেক অর্থব্যয়। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন। চিঠি লিখে আমার পরমায়ুর আভাসটা জানিয়ে দিলেন দিদিকে—অর্থাৎ পঙ্কজিনীর মাকে। তিনি তৎকালের একজন আদর্শ মহিলা। কত বড় হৃদয়ের যে অধিকারিণী ছিলেন তা বোঝাতে হলে একখানা আলাদা বই-ই লিখতে হয়। এই মহিয়সী বিধবার কাছে আমার দেনা ছিল অনেক, কিন্তু কিছু শোধ করার সুযোগ হয়নি। শুধু ছেলের চোখ নিয়ে দেখেছি। আর গলা ভরে ডেকেছি মা! তিনি এখন স্বর্গতা। কেবল টাকা হলেও কিছু শোধ করা যেত, এ ঋণ তো শোধ করা সম্ভব নয়।

ছ মাসের পরমায়ু নিয়ে এসে প্রায় ছত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলাম। কেবল খাই-সোডার দৌলতেই পঁচিশ বছর। তোমরা সভ্য পাঠক চমকে যাবে এত ক্ষার কি করে আমি হজম করলাম? যতক্ষণ জমি উর্বর জলপড়ায়ও কাজ হবে--ক্ষার তো একপ্রকার সারই বটে। জমি নষ্ট হলে যত মহার্ঘ ওষুধ দাও, আজ যদিও বা কাজ করল, কাল তার আর এ্যাকসন নেই। বিজ্ঞরা বলবেন, ফর্ম করেছে ইমিউনিটি। চালাকরা বলবেন—মহান এ্যালার্জি। দিদিমা নিয়ে আসবেন তাবিজ মাদুলি অথবা পদরেণু শত ব্রাহ্মণের। একালের বৈঠকী বন্ধুরা বলবেন, লেট হিম ডাই ইন পিস্!

কিন্তু অদৃষ্টের লেখা খণ্ডান যায় না। বিশেষ করে বাঙালী

সাহিত্যিকরা তা পারে না। তুমি শ্রেফ ভুলে যাও স্বরে অ-তে আমি, না অন্তস্থ য়-তে, তবু রেহাই নেই। হাতে কড়া পড়ুক লাঙল এবং দাঁড় বৈঠা ঠেলে, লিখ্য এবং গাঁয়ের কথ্য ভাষা একেবারে গুলিয়ে ফেলে—তবু নিষ্কৃতি নেই। তোমাকে একদিন কলেজ স্ট্রীট পাড়া চষে বেড়াতে আসতেই হবে। এক সীমান্তে ডি. এম. অন্য সীমান্তে শচীন মুখোপাধ্যায়। মাঝখানে শ্রীভুবন মোহন মজুমদার, সাত্ত্বিক আদর্শ আলোতে সাহিত্যের গোডাউন এখনো উজ্জ্বল করে রাখতে চেষ্টা করছেন। আছেন গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষ—লক্ষ্মী এবং বাণীর সাধনায় সিদ্ধ হয়ে। এভাগ্য 'কোটিকে গুটি'। আর দেখা যায় মৃদুভাষী পরম সাহিত্যানুরাগী সুধীর সরকারকে। আরো আছেন দুচার জন, যাদের নাম বলা বারণ। চাহিদা থাকলে চুমো, নইলে ঠোনা—অবশ্য চা সিগ্রেট পাবে কমার্শিয়াল ভ্যালু মাফিক। ডাক্তাররা বললেই হল ছ মাস তোমার পরমায়ু!

২২।৫।৫৮—সকাল ৭-১০টা

যুদ্ধের বাজারে যে যা পুঁজি করুক, আমি হাটে বন্দরে বেনে দোকানে পাগল হয়ে খুঁজে ফিরেছি, আছে নাকি খাই-সোডা? কী কষ্টে যে জোগাড় করেছিলাম প্রায় আধমন সোডি-বাই-কার্ব অজ গণ্ডগ্রামে বসে!

বছর দুই বাদে প্রচুর ধান পেলাম নিজ চাষে। কিন্তু টলমল করে উঠলেন গৃহলক্ষ্মী। পড়ন্ত বেলার সূচনাতেই মা চোখ বুজলেন। বাবা এবার যেন ক্ষেপেই গেলেন একেবারে—মামলা আর মামলা। কম করে হাজারভরি সোনা ছিল মার গায়ে। বেশির ভাগই গেল উকিল মোক্তার পুলিশের পেটে, বাকিটা নিল চোর ডাকাতে। শত্রুরা ঘরে আগুন দিলে দুবার। এসব বর্ণনা করলে মহাভারত হয়ে দাঁড়ায় পর্বে পর্বে। তবে মহাভারতে উই পোকার এমন কীর্তি নেই। কী সাঙ্ঘাতিক যে এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ

পূর্ববাঙলার শত্রুগুলো। তোমার একটু অসাবধানে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে ঘরের খুঁটি বাঁশ বাখারি বাক্সের কাপড় জামা। মহার্ঘ শাল দুষ্প্রাপ্য নক্সি-কাঁথা মূল্যবান গ্রন্থ গীতা এদের দাঁতের কাছে কিছু নয়। বাবার মৃত্যুর পর একটা কাল-বোশেখীর কয়েক মুহূর্তের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল তিনতলা টিনের বসত ঘর, সুমুখের টিনের প্রকাণ্ড নাটমন্দির ও লম্বা চওড়া মণ্ডপ। দেখতে দেখতে যেন ভূমিসাৎ হয়ে গেল সব। কিন্তু কী আশ্চর্য গোটা পঁচিশ গরু বাছুর আশ্রয় নিয়েছিল নাটমন্দিরে ঝড়ের সূচনা দেখে। একটিও মরল না, কিংবা আঘাত পেল না এতটুকু। আমিও সপরিবারে বেঁচে গেলাম বসত ঘরের চাপার ফাঁকে ফাঁকে। সেদিনের সকালটা চিরকালই মনে থাকবে। আর উইয়ের দাঁতের দংশন।

অচিন্ত্যকুমার ঠিকই বলেছেন, এ আমার যোগসাধন। নইলে যে গরু-বাছুরগুলো বাঁচলো সেদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে, সেগুলো কেন এল না পার্টিশানের চাপে পশ্চিম বাঙলায়? কেনই বা তাদের দেখিনে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে? না আমাতে গরুতে সামিল হয়ে গেছি, বেঁচেছিতো এক সঙ্গে বরাত জোরে

তবু আমি অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসেছিলাম না। আগুনে পোড়া ঝড়ে ভাঙা টিন এবং লোহা কাঠের খুঁটি কিনে ঘর তুলেছিলাম শক্ত পোক্ত। দাঙ্গার সঙ্গে মামলা কিছুতে এড়াতে পারলাম না। জাহাজ ফুটা হলে, সেঁউতি দিয়ে জল ফেলে বেশীদিন ভাসিয়ে রাখা অসম্ভব। তবু আমার পরিশ্রমে কার্পণ্য নেই। এর মধ্যেই আমাকে শ্রাদ্ধ শান্তি পূজা পার্বণ বজায় রাখতে হল। বিয়ে দিতে হল দুটি বোনেকে সমান ঘরে। তেমনি ছোটভাই দুজনাকে চাকরি ব্যবসা বিয়ে দিয়ে ভাঙা জাহাজ থেকে কূলে তুলে দিলাম। আমি ভেসে চললাম অন্ধকারে খোলা সমুদ্রে। একে একে যৌথ পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। যে যার সুবিধা মত পাড়ি জমাল

লাইফ বোটে, সম্ভব মত স্বার্থ নিংড়ে নিয়ে। আমি কিন্তু শিকলে বাঁধা। জাহাজ ডুবছে তিলে তিলে।

এর মধ্যেই আমি আনন্দ সংগ্রহ করেছি। ছুটে বেড়িয়েছি ঢপ কীর্তনের দলের সঙ্গে। সন্ধ্যার নদীতে শুনেছি খাঁটি ভাটিয়ালি গান। ফৌজদারী মামলায় তারিখ নিয়ে জারী-কবির পালা শুনতে যেতাম। কখনো বা বৃন্দার দলকে বায়না করে নিজের নাটমন্দিরে আসর বসাতাম।

এক ফরাসে ছোট বড় সব মানুষ—এক আসনে সব ঠাঁই। আভিজাত্যের তকমা ছিঁড়ে এক হুঁকাই চালিয়ে দিতাম।

বিজয় ব্যানার্জির মত কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, 'চরকাশেম'-এর উপনায়ক জীবন পিওন আমার জীবন প্রবক্তা—সব হুঁকো এক করতে হবে—কথাটার সূত্রপাত বোধ হয় এভাবেই। এর অন্তরালে বোধ করি নন্দলাল রায়েরও প্রভাব রয়েছে। এ সব ঘটনা সামান্য হলেও আমার কাছে তুচ্ছ নয় মোটেই। উপন্যাস তখন কল্পনায়ও আসেনি, আমার বৈঠকখানায় ক্রমে ক্রমে এক আসন এক হুঁকো চালু করেছিলাম অনেক মাশুল দিয়ে। এমন কী শত্রু হলেন গুরু পুরুত অনেক আত্মীয় বান্ধব। কিন্তু আমি শক্ত হয়েই অনাগত শুভর জন্য ক্ষুদ্র একটা পথ তৈরী করে রাখলাম।

২৩।৫।৫৪—সন্ধ্যা ৭-৮টা।

মাঝে মাঝে শ্বাস রোধ হয়ে আসত বাস্তবের নিষ্ঠুরতায়। মাথার ওপর হয়ত তিনটা দেওয়ানি, পাঁচটা ছোট বড় ফৌজদারি। হাজার টাকার মাল ক্রোকী পরওয়ানা। যখন-তখন টেনে নিয়ে যেতে পারে যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি। নিলামে তুলতে পারে ঘর-দোর জমি-জায়গা। হয়ত থানার দারোগা চালান দিতে পারে মিথ্যা খুনের দায়ে। ঠিক স্মরণ করা কঠিন, তখন হয়ত মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর দুটি পংক্তি, 'চেরাপুঞ্জির থেকে...একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার

বুকে ?' হয়ত এ কবিতা মোটেই মনে আসত না। কিন্তু দাবদগ্ধ মন একখণ্ড জলো মেঘ চাইত। তাই হয়ত ধেণুর্বৎসপ্রযুক্তা বাছুরটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতাম মার কাছ থেকে। কবিতার মাধুর্য পেতাম গোবৎসের শান্ত চাহনিতে। আবার বৈশাখের খরদীপ্ত উগ্ররূপ দেখতাম মোষের চোখে। এগুলো মায়া মমতাহীন যাযাবর জীব। যে দিকে খুশি দল বেঁধে চলল—সন্ধ্যাবেলাও ঘরে ফেরার টান নেই। গরুর প্রকৃতি ভিন্ন। মায়ের মত স্নেহময়ী। একটু ঘোর হলেই উঠানে এসে হাজির। কাব্যের আস্বাদ পেতাম লাল পলাশের নেশায় গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ ফুলে—নদীর পাড় পর্যন্ত হেঁটে এসেছি একা। সন্ধ্যার সুরুতে রওনা দিয়েছি, যখন ফিরে এসেছি মাথার ওপর এক ফালি চাঁদ। শৈশবেও যেমন দেখেছি, আজো তেমনি। যুগ যুগ ধরে হাসছে। আমি চলে যাবো তবু হাসবে—এ-পথ ধরে একের পর এক কত মানুষই যে আসবে যাবে! চাঁদ কি কেউকে আজ পর্যন্ত মনে রেখেছে ?

২৪।৫।৫৮ সন্ধ্যা ৬-৮টা।

আবার ঝড় এলো—ভোলায় যেবার শেষবারের মত বন্যা এসেছিল। ভেঙে উপড়ে নিয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার সুপারি নারিকেল গাছ, মানুষের পাকা পোক্ত বসতি। লণ্ডভণ্ড হাট বন্দর। ঝেটিয়ে ধুয়ে নিয়ে গেল মানুষ জন্তুর প্রাণ। উড়িয়ে নিয়ে গেল আবার আমাদের বসত ঘরের টিন। ফের ঘর বাঁধলাম। টুটা-ফুটা মধ্যস্বত্ব কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগলাম। গরু মেষ মরে চাষ-বাস ইতিমধ্যেই হয়েছে শ্রীহীন। আবার ধার-কর্জ করে দক্ষিণের বিলে ফসলের আশায় পাড়ি দিলাম। ফসলও পেলাম প্রচুর। কিন্তু আবার ফৌজদারি এবং মালক্রোকী ধাক্কা। কত আর সামাল দেয়া যায়! তবু জানি এই মাটিতেই যেমন আঘাত, তেমনি প্রলেপ —এই আমাদের নিত্য পরিচয়। এ 'ঠিকানা বদল' হওয়ার কথনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই, তখনো ছিল না। একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি নাকি গান জানেন, প্রতিবেশী বন্ধু রমেশ ভট্টাচার্যের নাকি ভগ্নিপতি। নাম বীরেন্দ্রনাথ আচার্য, পেশা ইস্কুল মাস্টারি—গ্র্যাজুয়েট।

অনেকদিন বাদে যেন একটি সভ্য মানুষের সঙ্গ পেলাম, মন্দ লাগল না, তিনি একটি নেশার কথা ব্যক্ত করলেন। ভীষণ কৌতূহল হল। কিন্তু চুপ করে রইলাম। পঙ্কজিনী প্রচুর জলখাবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক দিন বাদে বার হল বাক্সে তোলা হারমনিয়ম। খানিক উইয়ে তোকা, খানিক ভাঙা ও পোড়া। তবু লোক জমে গেল অনেক।

পঙ্কজিনী বললেন, আগে হাত দেখা হোক। এবং আমিই সাব্যস্ত হলাম প্রথম শিকার।

অনেক দেখে শুনে ভদ্রলোক বললেন, শেষ জীবনে এসব ছেড়ে আপনাকে সাহিত্য করেই খেতে হবে। আপনার হস্তরেখার এই বক্তব্য।

আমি ভাবলাম লোকটা পাগল।

॥ তেইশ ॥

এখনো আমি আদৌ বিশ্বাসী নই জ্যোতিষে। কিন্তু আমার জীবনেই দেখছি পাগলের উক্তি সত্য হল। এটা দুর্বলতা নয়, একটা বিস্ময়কর ঘটনা মাত্র। বামপন্থী বন্ধুরা এ কথা শুনলে হয়ত হেসেই উড়িয়ে দেবেন। সরোজ দত্ত তো নিশ্চয়। কিন্তু যা-ই মানুষের জীবনকে আন্দোলিত করুক, তার একটা বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। যে নির্ধারণে ভরে যাবে মন প্রাণ এবং চৈতন্য—শুধু আলফা-বিটা-গামা নয়।

২৫।৫।৫৮—সকাল ৫-৯টা।

এবার পার্টিশনের পর সরোজ দত্তের সঙ্গে পরিচয়। মাধ্যম

সাহিত্য—মাধ্যম কবি-বন্ধু বিমলচন্দ্র ঘোষ। শ্রীদত্ত আমার চেয়ে বয়সে বেশ কিছু ছোট, কিন্তু বুকটা দেখলাম খুবই বড়। সাহিত্য সাংবাদিকতা বিচার বিশ্লেষণ—অনেকগুলো গুণের তিনি অধিকারী, কিন্তু সব গুণকে ছাপিয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ দরদী মানুষ—যিনি শুধু উদ্ধৃতি কণ্টকিত থিওরী সর্বস্ব নন। তবে রাজনীতি সমাজনীতির কথা উঠলে তিনি বড় নিষ্ঠুর। পরম বন্ধুরও এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি সইতে নারাজ। সাহিত্যে তো বটেই। দেখলাম নন্দলাল রায়ের মতই একখানা খাপ-খোলা বাঁকা তলোয়ার। এঁরা চরম আদর্শবাদী—মনে মনে স্থির করলাম সত্যিকার হিউম্যানিস্ট। এখানে বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও দেখেছি—দেখেছি রবীন মিত্র, অনিল সিংহ, সুধী প্রধানকে, এমনি জানা অজানা অনেককে। সাহিত্য চর্চাই ছিল প্রধান আকর্ষণ, তবু বিমল ঘোষের বাড়ীটা মনে হত যেন পার্টি আফিস। কবি যেন মোহিতলালের বিপরীত সংস্করণ। কণ্ঠে দন্তে যাচাই করলে ভুল হবে। তা প্রায় দুজনারই তুলের তুল। এঁরা বিপরীত হচ্ছেন দর্শনে। অনেকে আসতেন হাওয়াই সার্ট ও প্যাণ্ট পরে। অনেকে মোটা ফ্রেমের চশমা। তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বুঝিয়ে বলতেন পাক-প্রণালীর মত। আমি বয়স্ক ছাত্র থাকতাম দূরে শিষ্যের আসনে বসে। বড় লজ্জা হত নিজের জ্ঞানের পরিধি উপলব্ধি করে। যদি অন্তত কতগুলো টার্মসও জানা থাকত। এঁরা নিক্তিতে মেপে ব্যঞ্জন চড়াতেন বিলেতি সসপ্যানে। আমার তুলনায় এঁরা সব পাকা গ্র্যাজুয়েট গিন্নী। আমি চুরি করে চেখে দেখতাম। আন্দাজে উড়ে ব্রাহ্মণের মত আমি যজ্ঞের হাঁড়িতে যা রেঁধেছি তা তো কম স্বাদু নয়। আমার নিক্তি ছিল না—তেমনি ছিল না সময়। তার ওপর জীবিকার তাড়নায় জর্জর। তখন বলো তো আন্দাজে নুন তেল মসলা দেয়া ছাড়া উপায় থাকে কি?

আমি শ্রেণী-সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল উপাদান

মানুষের মন থেকে সংগ্রহ করেছি। আবার মানুষের দরবারেই তা সাহিত্যের আকারে পরিবেশন করেছি। সরোজ দত্ত 'পরিচয়'-তে শুধু একটি লাইন বললেন, 'চরকাশেম' পড়ে কোথায় যেন দাঙ্গা বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমি বিস্মিত হলাম এঁর সাহিত্যানুরাগ দেখে। শ্রীদত্তের চোখে আমি কখনো চশমা দেখিনি।

গ্রাম্য রাজনীতি করে করে আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক কূটনীতিও ছিল স্বচ্ছ সরল।

আরো ভাঙল গ্রাম-জীবন—আরো ভাঙল জীবিকার মাপকাঠি, মধ্যস্বত্বে তো ধরেছে বিশ্বগ্রাসী ফাটল। ষাটটা ঝুনো নারকেল একটাকা—চৌদ্দ আনা একমন ধান। তাও নিত্য খদ্দের নেই। কতদিন যে হাট থেকে নারকেল সুপারি ধান চাউল বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেছি! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের মরশুম। মাপের ডালার ওপর চার পাঁচ সের ফালতু নিয়ে গেছি। কিন্তু মামলা মোকর্দমা যৌথ পারিবারিক দায়িত্ব যে ঘরে, সেখানে ব্যয় সংকোচের কোনো উপায় নেই। তার ওপর রয়েছে পুলিশ এবং সিঁদেল চোরেব ট্যাক্‌সো।

একদিন দেখলাম পঙ্কজিনী নিরাভরণ। দেড়শ ভরি পড়ে মরুক, একটু সোনার জলের দাগ নেই কোথাও। প্রথম খুব হাঁক-ডাক করলাম। পরে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে বুঝলাম—মোটেই অন্যায় করেনি স্ত্রী। প্রথম দিয়েছেন বাবাকে, তারপর দৈনন্দিন নিষ্ঠুর চাহিদাকে। আমারই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমিই লক্ষ্য করিনি।

এত দিন খালি ছিল গলাটা। সেবার খাদ্য দপ্তর থেকে বদলি হচ্ছি। সত্যবন্ধু ভৌমিক যে বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করলে তার সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্র দেব। বললেন—বড় সাহেব এবং ছোট সাহেবকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায় জানি, কিন্তু সাহিত্যিক সহকর্মিকে এই আন্তরিকতা নিবেদন আমার চোখে নতুন। বন্ধুরা

আমায় দিলে সোনার আংটি, বৌদিটিকে সোনার মালা। সত্যর ধ্রুব ধারণা বৌদি ছাড়া নাকি আমার সাহিত্য করা হত না। সে মালাও হল জ্বালা—আমার অসুখে প্রথম বন্ধক, তারপর বিক্রি। হাসপাতালে বসে দিতে গেলাম ফুলের হার, সেখানেও দৈবাৎ প্রতিবন্ধক। আমি আমার ভাগ্যকে এভাবে যে কতবার ক্ষমা করেছি।

সাত হাত ঘুরে শহর বন্দর থেকে দু একখানা খবরের কাগজ আসত আমাদের গাঁয়ে—মানে শুক্তাগড়ে। রাজাপুর থানার অধীন বরিশাল জেলার একটি গণ্ডগ্রাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি অক্ষর পড়া হত। আলোচনা হত তারও বেশি। কী সদম্ভ চীৎকার সংবাদপত্রের পাতাগুলোর। পাকিস্তান নাকি আকাশকুসুম কল্পনা। এ হয় না, হতে পারে না, অতএব মাভৈঃ পূর্ববাঙলার হিন্দু অধিবাসী। মুসলিম প্রধান এ অঞ্চলের গ্রাম্য রাজনীতি দেখে আমি কিন্তু অনেক আগেই বুঝলাম—পার্টিশান রোকা যাবে না, পাকিস্তানও কায়েম হবে নির্ঘাত। সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর উক্তি শুভ নয়। মাটির মত সহজাত সরল মনগুলোকে কলুষিত করা হচ্ছে বিদ্বেষেব বিষ ছড়িয়ে।

বুঝলাম যত স্থায়ীই হক এবার ডেরা তুলতে হবে। যত কালের ভিটাই হক—যত চিহ্ন থাক পূর্ব পুরুষের, এবার খুলতে হবে বাঁধন-ছাদন। আমরা বলি হব বহু ঈপ্সিত এ স্বাধীনতার।

হেনা ও ছায়া বড় হয়েছিল। দুটি মেয়েকে পাত্রস্থ করলাম বহু কষ্টে কলকাতা এসে। তবু রইল গীতা বাসুদেব রেবা—নিষ্পাপ কিশোর কিশোরী।

সাত পুরুষের ভদ্রাসন। ছাড়তে চাইলেই ছাড়া যায় না। প্রশ্ন আসে জীবিকার, প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় আশ্রিত আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধুজন। প্রশ্ন করে গাছপালা। প্রশ্ন তোলে নদী জল বায়ু। এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষ নেই।

২৬।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা

কলিকাতার সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালি পর্যন্ত। আকাশে যেমন ইথার, পূর্ববাঙলায় তেমনি জল। সেই জলপথ ধরে সংবাদ আসতে লাগল প্রতিদিন, আজ নারী ধর্ষণ হয়েছে। কাল আগুন দিয়েছিল অমুক বন্দরে। এ অঞ্চলের অবস্থাও নাকি খুব উদ্বেগজনক। রায়ট, রায়ট আসছে। উৎখাত হচ্ছে এবং হয়ে যাবে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়। কতিপয় বুদ্ধিজীবী মোল্লা মৌলানা বিষম চাল চেলেছে রাজনৈতিক দাবার। আশপাশের শান্ত নিরীহ মুসলমান ভাইরা হতবাক।

বাড়ীতে বিষ সংগ্রহ করা রয়েছে। মাঝে মাঝে গীতা বাসুদেব জিজ্ঞাসা করছে, কতটুকু বিষ খাবো বাবা?

তখনকার আমার মনের অবস্থা আমিও ঠিক লিখতে পারব না। পাঠক তোমার ওপরই অনুমানের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।

এমনি দিনে আমার এক খুড়তাত ভাই এসে উপস্থিত। দেখতে অনেকটা কাপালিকের মত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কপালে রক্ত তিলক। চোখে রক্তাভ দৃষ্টি। ছিল বহুদূরে দক্ষিণে মামাবাড়ী। সঙ্গে দুটি উলঙ্গ ছেলে এবং প্রায় বিবস্ত্র স্ত্রী। দক্ষিণে নাকি আর থাকা যাবে না মান মর্যাদা নিয়ে। ভাই আমার আশ্রয়প্রার্থী।

আমার মনে মনে হাসি পেল। চমৎকার সময় এসেছে আশ্রয় চাইতে! তাকে আমার বসত ঘরের এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিলাম। বললাম সরল ভাবে, বাকি তিন ভাগ বিক্রি করে আমি কলকাতা চলে যাবো। এছাড়া আর টাকা পয়সা জোগাড় করার উপায় নেই,—মধ্যস্বত্ব ইতিপূর্বেই অনেকখানি নীলাম হয়ে গেছে। খাসের জমি তো ভোগ করা ছাড়া বিক্রি করার কোনো পথ বাবা রাখেননি।

আমার কাপালিক ভাই একবার সারা বাড়িটা ঘুরে, ফলকর বলিষ্ঠ গাছ পালাগুলো দেখে নিয়ে একচতুর্থাংশ বসত ঘরে কায়েম

হয়ে বসলে। গান শোনালে দেহতত্ত্ব এবং রামায়ণের। কদিন বাদে জানতে পারলাম সে নাকি আমাকে খুন করতে চাইছে। সর্বদা একটা ধারাল কাটারি নিয়ে ঘোরে। আমি বলি বাঁশ বাখারি চাঁচবে। আমার স্ত্রী বলেন, উঁহুঁ, তুমি ওর মতলব বুঝতে পারছ না।

সাপের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা উচিত নয়। নিজের ঘর ছেড়ে এক জ্ঞাতির ঘরে আশ্রয় নিলাম। সাবধান হওয়ায় দোষ কী!

এখন আর ঘরের বাকি অংশ বিক্রি করতে পারছি নে। খদ্দের আসছে অনেক চেষ্টা যত্নে, কিন্তু ভাঙানি দিচ্ছে কাপালিক ভাই। ভালরে ভাল, আশ্রয় দিয়ে আমিই পথে বসলাম। এত মানুষ চরিয়ে শেষ কালে আমারই পা কাটলো কিনা পচা শামুকে। তা নয়—তলিয়ে ভাবলে আরো অনেক ভাবা যায়। আমরা মধ্যস্বত্ব ভোগীরা পুরুষানুক্রমিক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ঘর ভেঙেছি, এ তারই উত্তর। কখন কী ভাবে যে কার কাছে আসবে তা আজো রহস্য! তবে এ্যভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস্ রিঅ্যাকশন, এ বিজ্ঞানের উক্তি। সকলেই বোধ হয় এবার অনায়াসে মানতে পারো যুক্তিটা।

তেরশ পঞ্চাশ সন তখন গত হয়েছে। এখনো একটু দূরে দূরে নদীর চরে দেখা যায় মানুষের কঙ্কাল।

এই জেলারই উদ্বৃত্ত ফসলের ভৌগোলিক খণ্ডগুলোকে বাদ দিয়ে এখনো শোনা যায় বিলাপ। যুদ্ধটা বেশ দানা বেঁধেছে পূর্ব এবং পশ্চিম গোলার্ধে। সঙ্গে সঙ্গে দানা বেঁধেছে মিথ্যাচার, ফাটকাবাজি, কালো-কারবার। নেতাদের অলীক প্রতিশ্রুতি আমাদের হতাশ করেছে। সৎ-মহৎ যা কিছু শুভ সংজ্ঞা তা যেন কে রাতারাতি প্রত্যাহার করে নিয়েছে দুনিয়া থেকে। মানবের বৈজ্ঞানিক তপস্যা দখল করেছে দানব।

এ সামান্য ক্রৌঞ্চমিথুনের কান্না নয়, ধরিত্রী কাঁদছে, সমস্ত

সভ্যতা বিপন্ন। মহাকবি থাকলে কী করতেন জানিনে, আমি কিন্তু দেখছি 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-য়ের পটভূমি সৃষ্টি হচ্ছে। বহু দিন বাদে সুপ্ত কবি-চিত্ত হাহাকার করে উঠল বুঝি ভিতরে ভিতরে। কিছু তো বলা হল না আমার! অনেক প্রতিবাদ বাকী, অনেক ব্যক্তব্য।

পঙ্কজিনীর কাছে একখানা আয়না থাকতো। সহজেই তাতে ধরা পড়ত আমার-মনের ছবি। তিনি বললেন, তুমি আবার লেখো, নইলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে এভাবে ভাবলে।

বলো কি? আমি আবার লিখব? বলতে গেলে অনেক সময় যে নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে সন্দেহ জাগে!

তাতে হয়েছে কী! চর্চা করলে আবার বানান শুদ্ধ হবে। লিখতে লিখতে এসে যাবে লেখা। একদিন তো তুমি ভালই লিখতে।

কীটপতঙ্গে ঝড়ে আগুনে মামলায় নষ্ট হয়েছে অনেক মূল্যবান সামগ্রী—চোর ডাকাতে আত্মসাৎ করেছে বহু জিনিস, শুধু একটি বস্তু সকলের দাঁত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পঙ্কজিনী, সেটি হচ্ছে কল্লোল যুগের ছাপা লেখা ও নন্দবাবুর বোন রানীর হাতের নকল করা কিছু গল্প কবিতার পাণ্ডুলিপি. দু তিনখানা ইংরেজি বই। গোর্কি-টলস্টয়-শ'। মনে মনে আর ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না ফরিদপুর জেলার-উলপুরের বিলাঞ্চলের এই মেয়েটিকে। আজ না হয় মহিলা। পঁয়ত্রিশে পা দিয়েছেন। এ বাণ্ডিলটি যখনকার সঞ্চয় তখন তো পনর বছরের নাবালিকাই ছিলেন।

হ্যাঁ আমি লিখতাম বটে! এই তো সন তারিখ সময়—উনিশ সাতাশ, পয়লা মে। রাত দুটা.

যন্ত্রশালা

শহর সীমান্ত প্রান্তে নভোস্পর্শী লৌহ যন্ত্রশালা,—
রজনীর অন্ধকারে জ্বলে সেথা লক্ষ দীপমালা
বিকিরিয়া পাংশুরশ্মি জাল
স্তূপে স্তূপে উদ্ভাসিয়া ভগ্ন অংশ যন্ত্রের কঙ্কাল।
...বক্ষমাঝে শোভিছে মলিন
পশুর পঞ্জর সম মেদ মজ্জাহীন
সারি সারি কৃষ্ণ করোগেট গৃহ ;
মেরুদণ্ড ভেদি' তার জাগে অভ্রংলিহ
ধূমায়িত চিমনি-শীষ ;—ওড়ে তাহে কুহেলী কেতন :
নির্বাক আতঙ্কে রহে বসুন্ধরা তিমির মগন।
কেঁপে ওঠে তারা স্তোম
ভীতিমগ্ন মহা ব্যোম !

নিতিনিতি বিরচিয়া নবনব ছন্দবন্ধ গান
নিখিলের কবি তোমা করে অপমান,
তারা বলে তুমি ক্ষুধাতুর
বর্বর নিষ্ঠুর !
শত রথচক্র তব ভীম বেগে রুষিয়া গর্জিয়া
মত্ত হাহারবে যেন, ফেরে আবর্তিয়া
দিবসে নিশীথে
অতি তুচ্ছ অসমাপ্ত স্বার্থের সজ্ঘাতে ;—
নাহি ক্লান্তি, নাহি পরাভব
হে যন্ত্রদানব !
তব বক্ষ রোলারের রূঢ় নিষ্পেষণে
গর্জনে ঘর্ষণে

অর্ধভগ্ন কাংস্যস্তূপে, ধাতুপিণ্ডে জাগে আর্তনাদ,
শুধু আমি জানি, বিংশ শতাব্দীর লাগি'
অহোরাত্রি জাগি
এনেছ কী শুভ আশীর্বাদ !

তুমি তার নাগরিকা রমণীরে
নানারূপে ধীরে ধীরে
ক'রেছ সুন্দর ;
তার দুটি কম্প্র ওষ্ঠাধর
রাঙায়েছ আধুনিক রক্তরাগে।
রুমালের প্রান্তভাগে
চূর্ণীকৃত সুগন্ধি পরাগে
মুছায়ে নিয়েছ তার আতপ্ত কপোল।
রক্তপীত বর্ণের হিল্লোল
তরঙ্গিয়া গেছে কভু রেশমী বসনে
লীলায়িত অঙ্গ আভরণে।
উজ্জ্বল দশনে
দিলে আনি' কুন্দকান্তি মৌক্তিকের ভাতি,
চমকে নখর পাঁতি।
রঙিন্ পাদুকা পায় বাতায়নে কে ওঠে উচ্ছ্বসি' ?
করেছ প্রিয়ারে তার বিদুষী উর্বশী !
ওগো অনুরাগী !
তারি লাগি
নবতর ইন্দ্রপ্রস্থ গড়িয়াছ ইষ্টকে প্রস্তরে ;—
শত শত প্রাসাদ শিখরে
বুলায়েছ সুচারু পরশ
পাষাণের পুষ্প পুঞ্জে তোমারি হরষ,

ফুটাইলে লৌহস্তম্ভে রক্ত শতদল
রূঢ় তুমি হ'লে কি কোমল ?

হে শিল্পী দানব,
উতলা করেছে মোরে ওই তব যন্ত্র কলরব
তাই আমি ধূমায়িত নীলাভ সন্ধ্যায়
মুগ্ধা বধূসম ছুটে আসি' ত্রস্ত লঘু পায়
সুউচ্চ পরিখা পারে
তব অভিসারে
সংখ্যাতীত পিষ্টন নর্ত্তনে
রণনে ঝননে
করে মোরে বিবশ বিধুর
কানে বাজে ছন্দ বন্ধ অপরূপ সুর
মরি মরি, মধুর ! মধুর !
হে বিরাট !
ওই তব পরিখার পারে
বিষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত লক্ষ লক্ষ চুল্লির কিনারে
যুগে যুগে জন্মিয়াছে কত সাহিত্যিক
সাম্যবাদী বৃদ্ধ দার্শনিক,
বিশ্বের বেদনা বোধে ব্যথা যার হয়েছে মৌলিক।
অতি তুচ্ছ লৌহতারে
আকাশের বিদ্যুৎ শিখরে
বাঁধি আনি করিয়াছ সে চিন্তার দূতী—
নব নব তীক্ষ্ণ অনুভূতি
দিকে দিকে মুহূর্ত্তে ছড়ালে,
যে অমৃত গুপ্ত ছিল ওই তব বক্ষের আড়ালে।

কভু আমি স্বপ্ন দেখি সহস্র অর্ণবজান
উন্মত্ত সাগর মাঝে ছিন্ন পালে ঝঞ্ঝা বেপমান
দেশে দেশে চলিয়াছে বার্তাবহি'
অবহেলে সহি'
লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ আঘাত
নিষ্করুণ অশনি সম্পাৎ !
বয়লার গর্ভে তার বাষ্পপুঞ্জে সে কী আলোড়ন
ধরাগর্ভে যেন ভূকম্পন !
নিখিলের সভ্যতার ওগো অগ্রদূত !
বর্বর বিশ্বেরে তুমি পরাইলে বসন অদ্ভুত।
নূতন সম্বিৎ দিলে, দিলে আত্মবোধ
দুর্বার বন্যার বেগে আর তার কে করিবে রোধ ?

কবিতাটা মনে মনে প'ড়ে শেষ করে মনে মনেই বললাম, হ্যাঁ একদিন আমি লিখতাম বই কী ! আজ ভিতর এবং বাইরের যে চেহারাই হক, একদিন সত্যই লিখতাম !

॥ চব্বিশ ॥

এখন আবার লেখা সুরু করলে প্রথম সমস্যা কাগজ, দ্বিতীয় সমস্যা কলম এবং কালি। সমস্তই গেছে কালোকারবারীদের হাতে। ভাল দু'দিস্তা কাগজ এ বাজারে দুর্লভ। এই অজগণ্ড গ্রামে খুঁজলে হয়ত ব্ল্যাকে কেনা যাবে দু'দশ টিন কেরোসিন। ছিল একটা আপার প্রাইমারী ইস্কুল তাও বন্ধ হয়েছে সাম্প্রদায়িক টানা হেঁচড়ায়। অতএব কাগজ কলম নিষ্প্রয়োজন।

একটা কলম আনতে ছুটলাম একদিন এক রাত্তিরের পথ দিদির কাছে, নযুল্লাবাদ—নাও ভাড়া করে। মাঝখানে ঝালকাঠি নেবে একখানা চিঠি ছাড়লাম কলকাতা বড় শালীর কাছে।

দিদি দিলেন একটা আধভাঙা ব্ল্যাকবার্ড কলম, শালী পাঠালেন

ছোট ছোট খান কয়েক রাইটিং-প্যাড। সব গুছিয়ে লিখতে বসলাম। কিন্তু কি লিখব? কবিতা, গল্প না প্রবন্ধ?

মেজো মেয়ের বিয়েতে একখানা বই উপহার দিয়েছিল। কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার সময় আমি হাতে করে এনেছিলাম। একবার খুলেও দেখিনি নামটা। যে-মন নিয়ে বইখানা এনেছিলাম সে-মন আমার শতধা হয়ে গেছে পথে।

স্ত্রী বললেন, আমি পড়েছি, তুমি পড়ে দেখো—লেখিকা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, নাম পার্ল বাক। এমন উপন্যাস লেখা তোমার পক্ষে কঠিন নয় মোটে। তর্জমাটি বেশ করেছেন পুষ্পময়ী বসু।

স্ত্রীলোকের লেখা হলেও আগ্রহ নিয়ে শেষ করলাম 'গুড আর্থ'। বিশ্লেষণ করে দেখলাম লেখিকার গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ। খানিক গ্রামে থেকেই শহরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তারপর গতানুগতিক শহুরে ব্যভিচারের দৃশ্য। শেষ করেও যেন তেমন চিন্তার খোরাকি মেলে না। চীন দেশের কি এই প্রতিনিধিমূলক চিত্র?

পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের উপকরণ নিয়ে তো এর চাইতেও ভাল বই লেখা যায়। এই 'দক্ষিণের বিলে'র সূত্রপাত। কিন্তু ভাব আসে তো ভাষা নেই। কাহিনী আছে তো কথা নেই। ইচ্ছা আছে, শক্তি নেই। আসন্নপ্রসবা মায়ের মত ব্যথা বেদনায় পায়চারি করতে লাগলাম।

একদিন স্বুরু হল 'দক্ষিণের বিল' লেখা। কিন্তু কোথায় থামব তা তো জানিনে। বর্ষার ধারা স্রোতের মত আসতে লাগল কাহিনী, এ ঢল সামাল দেয়া দায়। ক্ষুদে মাছির মত শত শত অক্ষরে হয়ে যাচ্ছে পাতা বোঝাই। কম করে দেড়শ লাইনের ঠাশ বুনোট এক পাতায়। আনুমানিক ছাপা পৃষ্ঠার পাঁচশ লিখে একবার নিশ্বাস ফেললাম। এবার কাকে পড়ে শোনাই? শ্রোতা কোথায়? রসিক শ্রোতা?

ওঁাকে রোজই কিছু কিছু লিখে শোনাই, কিন্তু তাঁর ওপর তখন পর্যন্ত তেমন আস্থা জন্মেনি। কৃষাণ জবেদালীকে ডাকি, ডাকি নেয়ে-মাঝি চিনামদ্দিকে—আর আসেন খুড়িমা। চুপ করে এসে দূরে উঠানে বসে শোনে আমার কাপালিক ভাই। পাঠ শেষ হলে সকলে বলে, মন্দ হয়নি। কিন্তু একদিন কাপালিক ভাই মন্তব্য করে, খুব ভাল হয়েছে দাদা। ছাপতে দাও, টাকা পাবে। আমি একটা লঙ্কাগাছ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না, আর তুমি কিনা একখানা বই লিখে ফেললে। আমাদেব কোনো গুণ নেই যে কলকাতা যাবো।—তার গলায় একটু ব্যথার সুর। চোখে মুখে হতাশার ছাপ। আমার ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ওর হাতে যে কাটারি! আজ ভাবি এই অস্ত্রের লজ্জায়ই তো হয়ে যাচ্ছে কত সত্য উন্মেষের সমাধি!

২৮।৫।৫৮—সকাল ৬-৯টা।

একটি পনর ষোল বছবের ছেলে এল, আমাদের পড়শী—মানিক গাঙ্গুলী। সে এমনি সময় নিয়ে এলো নারায়ণ গাঙ্গুলীর পরিচয়। কিছু দিন কংগ্রেসের কাজে মানিক নাকি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়দের দেশে ছিল। বরিশাল জেলারই একটি গ্রাম।

কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়?

এ-কালের একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পড়েছেন—'টোপ'? একটা ছোট গল্প 'বিতংস' লিখে তিনি এগার হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন সেদিন।

আমি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম, সামলে রাখলাম কাগজ কলম। নিশ্চয় বড় বিসদৃশ্য হয়েছে চেহারাটা। কতদিন দাড়ি কামান হয়নি।

তিনি কি তোমাদের কেউ হন?

ঠিক জানিনে। তবে অসম্ভব নয়। আমরাও তো গাঙ্গুলী।

ঠিক করে বলতো মানিক তিনি সত্যি সত্যি তোমাদের বাড়ি এসেছেন নাকি?

না, না কাকা। ভয় পাবেন না। তাঁকে আনতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তিনি কত বড় সাহিত্যিক।

২৯।৫।৫৮—সকাল ৬-১০টা।

তখন থেকে মানিক হল আমার লেখার প্রধান সমঝদার। অর্থাৎ কিনা শ্রোতৃমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। অনুপস্থিত অপরিচিত বিখ্যাত 'টোপ' উপন্যাস লেখকের সঙ্গে এই ভাবেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সেতু সংযোগ করিয়ে দিলে প্রথম মানিক। আজো সে সেতু অক্ষুণ্ণ। আজ আর আমার কাছে 'বিতংস' গল্প নয়, 'টোপ'ও উপন্যাস নয়—কিন্তু নিপুণ কথাকারের নামকরণ বৃথা হয়নি। যিনিই যখন ক্লিষ্ট দীন অবস্থায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এসেছেন, সমমর্মীতার 'টোপ'য়ে আকর্ষিত হয়ে, দরদের 'বিতংস'য়ে বাঁধা পড়েছেন। নারায়ণ চির জাগ্রত—সাহিত্যের স্রোতে আজো অফুরন্ত। তিনি যে কত 'উপনিবেশ' গড়েছেন ছাত্রছাত্রী গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবীর মনে!

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করতে না করতেই এসে দাঁড়ান নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতিপথে। শান্ত নিরীহ মানুষ। এমন অজাতশত্রু সাহিত্যিক বোধ হয় এ-কালে কেউ নেই। এতক্ষণ এঁর পরিচয় দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু লজ্জার দায়ে দিতে পারিনি।

বুঝতে পারছি অনেকখানি প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু এখন আর তাঁর কথা না বলে উপায় নেই। নারায়ণবাবুর স্ত্রী আশা দেবীর কাছে পেয়েছি সাহিত্যের অজস্র প্রশংসা, বিশেষ করে 'চরকাশেম'-য়ের—কিন্তু নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শোভনা মিত্র অনেক খাইয়েছেন চা সন্দেশ এবং ভাত। কখনো বা নিমন্ত্রিত কখনো বা উপস্থিত মত। সাহিত্যের প্রশংসা নিঃসন্দেহে উপাদেয়, কিন্তু যখন তুমি হন্যে হয়ে ঘুরে চযে বেড়াচ্ছ শহর তখন চারটি ভাতের সঙ্গে প্রিয় হাতের ব্যঞ্জন অতুলনীয়। উপমাটা তেমন বোধ হয় জুতসই হল না। 'চেনামহল'-য়ের সাহিত্যিক যাঁর হাতের

নাগালে, তিনি অনায়াসে ত্রুটিটুকু যখন খুশি শুধরে নিতে পারবেন।

ফরটি সিক্স ধর্মতলায় সেবার আলোচনা হচ্ছে বিগত পূজা সংখ্যার গল্প উপন্যাস নিয়ে। নরেন্দ্র মিত্র উপস্থিত, আমিও। আলোচ্য গল্প যখন 'এক পো দুধ' দেখলাম এই অজাতশত্রু সাহিত্যিকের একমাত্র প্রতিবাদী আমিই। ব্যঞ্জনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেয়া যেটুকু নুন খেয়েছি ভুলে যাইনি। তাই আমি কিন্তু সিরিয়াস্। সকলে প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ আমি বললাম, গল্পটার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু ত্রুটিও বিষম। গল্পটা কেউ যদি আজ না পড়ে এসে থাকেন, আমি গল্পকারের ভাষায় বলব, 'কি যেন বাদ গেছে জীবন থেকে'। আর ত্রুটিটা হচ্ছে এই যে, খুকির এক পো দুধ বাড়তি থাকতে বাঙলাদেশের কোনো মা এ গল্পের ঝড় বইতে দিতেন না সাহিত্যে। খুকি অবুঝ, তার দুধটুকু দিয়ে দিলেই তো সব শেষ। এবং সাধারণত তাই করেন গৃহিনীরা। বাস্তবতা-বোধের এই সঙ্গতিহীনতার দিকে আমি ঈঙ্গিত করলাম।

একটি যুবক বললে, আপনার চোখে জনডিজ হয়েছে।

স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবার বলেছেন, এ কথার সত্যতা আপনাতে নেই। তবে যিনি বলেছিলেন, তাঁকে পেলে একবার পরীক্ষা করে দেখতাম!

কিন্তু কী করে ধরব তাঁকে, তিনি তো হারিয়ে গেছেন অন্ধকারে! রয়েছি আমি এবং নরেন্দ্রনাথ। 'চেনামহলে'র দরদী শিল্পী নিশ্চয় এ স্বীকারোক্তির পর আমায় ক্ষমা করবেন। আর বন্ধুপত্নী শোভনা মিত্র তো অন্নপূর্ণা তুল্য। তাঁর দুয়ার এখনো আমার জন্য আর সকলের মতই খোলা। নরেন্দ্র মিত্রের ভাই ধীরেনের সঙ্গে এখনো ধর্মতলায় দেখা হলে টালা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চান। এঁরা এখনো ভুলে যেতে পারেননি গ্রাম বাঙলার রেওয়াজ।

বড় দুঃখে একটা কথা এখানে লিখতে হচ্ছে, সাধ্যের শেষ শক্তি খুইয়ে সাহিত্যের পাদ্যঅর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে গেছি ঐ উত্তর কলকাতায়। প্রতিদানে জখমি কাপে ঠাণ্ডা চা গিলে পালিয়ে এসেছি। হে মহামানব তুমি যে কত রূপেই বিকাশিত আমার সুমুখে! কখনো মহৎ আবেগে সুদৃঢ় আলিঙ্গন, কখনো দুর্জয় অবহেলায় পদাঘাত। আমি তো সবই মাথা পেতে নিয়েছি!

৩০।৫।৫৮ সকাল ৭-৯টা

এক মিত্রের কথা লিখেই মনে এলো আর এক মিত্রের কথা। আমার মত সামান্য ব্যক্তির মিত্রতার মাত্রা কিন্তু সামান্য নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র হচ্ছেন বাঙলা সাহিত্যে বিশ্ব মৈত্রেয়ীর প্রতীক। তুমি যে আবেদন নিয়েই যাও, তিনি ধৈর্য ধরে শুনবেন। সংক্ষেপে এমন একটা পথ বাতলে দেবেন, যা তুমি কল্পনাও করোনি। তিনি তাঁর লেখার মতই ব্যঞ্জনাময়। হাসিতে ব্যবহারে বুদ্ধিদীপ্ত অমায়িক। ইনি হচ্ছেন কল্লোল যুগের ত্রয়ী চন্দনের মধ্যে সব চেয়ে সৌভাগ্য-বান। লেখার গুরুভারের চাইতেও এঁর প্রযুক্তি বুঝি বেশি ধারাল। এঁর গল্প শুধু বাঙলায় নয়, ভারতে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এত অল্প লিখে এ ভাগ্যের অধিকারী বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ হননি। বহু পুরস্কৃত তারাশঙ্করকে এখন যেমন বলা চলে 'নভেল লরিয়েট' তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও 'পোয়েট লরিয়েট'। এঁর 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারী সম্মানে ভূষিত। একদিন ট্রামে দেখা, প্রেমেনদা বারবার জিজ্ঞাসিত হওয়ায়, কথা প্রসঙ্গে নিস্পৃহ চিত্তে বললেন—'সাগর থেকে ফেরা' নাকি মাসে এডিসন হচ্ছে।

সঙ্গে ছিল রামপরায়ণ। সে বললে, এখন আর আমাদের দোষ দিতে পারবেন না। পাঠক সমজদার হয়েছে। এককালে আপনারাই তো পঁচিশ টাকায় কপিরাইট বেচেছেন।

বারবার আমি নানা প্রয়োজনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে গেছি।

বারবারই চন্দনের গন্ধে গুণে অভিভূত হয়ে ফিরেছি। সাহিত্যাদর্শে এঁর সঙ্গে আমার হয়ত অনেক গড়মিল কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে ইনি আশ্চর্য দরদী। ইনি শুধু কাব্যে কামারের ছুতারের কবি হলে আমার মত সাহিত্যের মজুরের জন্য কিছুতেই এতখানি হাত বাড়িয়ে দিতেন না। কোনো এক পরম মুহূর্তে ভাবি, এই কবিই কি আমার দিকে চেয়ে লিখেছিলেন, 'দ্বার খোলো হে প্রহরী···আনো নব উষালোক, সঞ্জীবিত করো আজ নূতন অমৃতে···'।

এখানে অনিবার্যভাবে আসতে চাইছে হুমায়ুন কবিরের কথা। এখন স্বাধীন দেশের মহামান্য অমাত্য, তখন ছিলেন পরাধীন বাঙলার এক কৃতী কবি। কৈশোরে তাঁর পদ্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, এখনো সশ্রদ্ধ তাঁর সাহিত্য নিষ্ঠা এবং পদ গৌরবে। এই কৃতী কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর দরদী মনের দরবারে পৌঁছে গেছি চন্দন বৃক্ষের সাঁকো সংযোগে। নইলে শুধু লিখে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিলো।

দুঃখ কষ্ট দুর্দিনে প্রাণ বাঁচাতে আরো একখানা খেয়া নৌকাতে আশ্রয় করতে হয়েছে বার কয়েক। এই সাহিত্যের সওদা নিয়ে পারাপার হতেই আলাপ আতওয়ার রহমানের সঙ্গে। নানা লোকের ভিড়ে আমি হয়ত হারিয়ে গেছি তাঁর চিত্ত থেকে। সেদিন দেয়া হয়নি খেয়ার কড়ি। আজ এই অকিঞ্চিৎটুকু দিয়ে কী করে যে বলি, উসুল করে নাওগো বন্ধু সেদিনের বাকি!

৩১।৫।৫৮ বিকাল ৩-৬টা

কিছু আগে প্রযুক্তি কথাটা ব্যবহার করেছি। এ কথাটা একেবারে যে অজানা তা নয়, কিন্তু ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের মুখে শুনলেই নতুন লাগে। একদিন একই সভায় আমি ও শ্রীযুক্ত মিত্র উপস্থিত। হরপ্রসাদ মিত্র বক্তৃতা দিচ্ছেন, প্রযুক্তির খর কুঠার প্রয়োগে ভূমিসাৎ করে দিচ্ছেন তাঁর মতে যে সব আগাছা। পরিচয় ছিল না, মানুষটির পরিচয় পেলাম। আরো আগে একবার এঁর

নিষ্ঠুর পরিচয় পেয়েছি এক নামজাদা দৈনিকের রবিবাসরীয় স্তম্ভে। আমার একখানা উপন্যাসকে হিংসায় যেন কচুকাটা করেছেন। শুধু সেখানেই ক্ষান্ত হননি অধ্যাপক মহাশয়, করেছেন মূল সত্যে আক্রোশের অগ্নিসংযোগ। এর প্রমাণ আমার হাতে নেই—শুনেছি ডালপালা শাখা-প্রশাখার মারফত। আবার ঐ দৈনিকের ভগ্নী অংশে সেই উপন্যাসেরই একটি সমালোচনা বেরুল—বক্তব্যে মতান্তরে বলিষ্ঠ, কিন্তু শ্রদ্ধায় মূল্যায়নে ঘনিষ্ঠ। এমন সচরাচর দেখিনে, তাই লেখাটা পড়ে ছুটলাম কাগজের অফিসে। শাখা-প্রশাখার মাধ্যমেই খোঁজ নিলাম সমালোচকের। এবং ঘন ঘন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম একজনকে। তিনি মৃদু হেসে হজম করলেন সব নির্বিকার চিত্তে। শ্রীযুক্ত মিত্রের ওপর বহুদিন মনটা নুনকটা হয়ে রইল। মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতা প্রবন্ধ পড়ি, কিন্তু আস্বাদ পাইনে মোটে।

দুর্গাদাস সরকার একদিন এনে দিলে আস্বাদ। সে প্রিয় ছাত্র অধ্যাপকের—ভাঙিয়ে দিলে ভুল। বললে প্রথম লেখাটা তাঁর নয়, দ্বিতীয়টা।…বল কী!…একদিন কলেজের পর হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চেয়ে এলাম ক্ষমা—আর জানিয়ে এলাম ন্যায্য জনকে ধন্যবাদ। গাছে চড়তে হলে ডালপালা শাখা-প্রশাখার সাহায্য ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু আমি বলি হুঁশিয়ার! পরের কথায় শ্রদ্ধা হারালে অপূর্ব কবি-কর্মও তোমার কাছে বিস্বাদ।

'হাজারে, লক্ষে, কোটিতে তারাই ঘেউ ঘেউ করে—রাস্তা হারাই!' (হরপ্রসাদ মিত্র)

এমনি ঠকে জিতে যে কত দূর এগিয়ে এলাম!

'দক্ষিণের বিল' শুনতে শুনতে কাপালিক ভাইর কী যে পরিবর্তন হল! সে আর প্রতিবন্ধক হয় না খদ্দের এলে। কিন্তু যত ডামাডোল বাড়ে তত দাম কমে ঘরের অংশটার। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জিনিস বেচে মাত্র চারশ' টাকা পেলাম।

পাড়া প্রতিবেশীরা বললে, একি করলে ?...আমি বললাম, এখানে আর বাস করা যাবে না।...কেন ?...পাকিস্তান হচ্ছে।...একটি লোকও আমার কথা বিশ্বাস করলে না। যারা বুদ্ধিমান, তারা মনে মনে বুঝলেও, মুখে স্বীকার করলে না। ছোট বড় প্রায় সকলের অভিশাপ নিয়ে আমি সপরিবারে বাপদাদার ভদ্রাসন ছাড়লাম চিরকালের মত। আজ আমাদের গ্রামটা একেবারেই ছাড়া, কিন্তু সেদিন যাবতীয় অভিশম্পাতের ভাগী হয়েছিলাম একা।

॥ পঁচিশ ॥

তখনো পার্টিশান হয়নি। উনিশ শ' সাতচল্লিশ-এর প্রায় মাঝামাঝি, বরিশাল টাউনে এলাম। টাকা চারশ একটা প্যাঁচে পড়ে গেল। আমরা স্বামী স্ত্রীতে প্রায় দাসত্ব বরণ করলাম। এবার সময় মত জোটে না ছেলেমেয়ের দানাপানি। স্বাধীনতা হীনতা যে কী জিনিস এই প্রথম টের পেলাম। এটুকু আমার সাহিত্য জীবন নয়, দুর্বিসহ অপমান ও লাঞ্ছনার কাল—সকালের আশায় পূর্ব দিগন্তে চেয়ে রইলাম, বিশদ ভাবে আর বলে লাভ নেই।

১।৬।৫৮ সকাল ৬-৯টা।

সারাদিন রাত এক দোকান সামলানোর কর্মচারী—সকাল পাঁচটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত বেচাকেনা। কোনো দিন ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, কোনো দিন হয় না। এ দোকান আমার হাতেই প্রতিষ্ঠিত, শরিক হয়েও এখন আর তা নই, গ্রহ দোষে করুণার পাত্র। ভয় আছে সামান্য ত্রুটিতে জবাবদিহি করার। মাথা গুঁইয়েই খাটছি। কিন্তু রাত জেগে আবার নতুন করে 'দক্ষিণের বিল' সেজে ঢেলে লিখছি। এবার টের পেলাম কাহিনীর সঙ্গে ভাষার সঙ্গতি হচ্ছে। টাইট হচ্ছে ঢিলা নাট বল্টু

স্তু। এখানে আর কেউ শ্রোতা নেই, যদি পঙ্কজিনীকেও শোনাতে পারতাম!

এখন এ-সময় কেন লিখছি উপন্যাস? বক্তব্য, না প্রতিবাদ? দায়িত্ব, না প্রতিষ্ঠার আশা? মনের খোরাকির জন্য লিখছি। নইলে উন্মাদ হওয়া বিচিত্র ছিল না।

'দক্ষিণের বিল' দ্বিতীয় পর্যায় লেখা সারা হল। একদিন ভাবলাম কী লিখেছি তা তো সঠিক জানা হল না। ব্রজমোহন কলেজের বাঙলার অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরীর কাছে ছুটলাম সাইকেলে চড়ে। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি, স্থানে স্থানে খয়ের চুনের দাগ। বললাম, পানের দোকান করি বড় স্টেসনারি দোকানটার সঙ্গে—সদর রাস্তায় জগদীশ হলের অপজিটে। একখানা বই লিখেছ, শোনাতে চাই।

অধ্যাপকের কৌতূহল হল। তিনি একা এলেন না। আরো চার পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে একটি যুবক প্রথমই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—যেমন সুপুরুষ, তেমনি কথা-বার্তায় শান পালিশ। কিন্তু অন্তরে মরমী। শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, বৃহত্তর কল্যাণে। শামসুদ্দিন আবুল কালামের মধ্যে তখন নব-জাগ্রতির বিদ্যুৎ শিখার সন্ধান পেলাম। আর একজনার মাত্র নাম মনে আছে কিরণময় রাহা, ইনক্যাম ট্যাক্স অফিসার। এবার এঁদের দেখে বুঝলাম, সব সময় সব জায়গায় রসিক শ্রোতা দুর্লভ।

প্যাকিং বাক্স, পুরান কাগজ, নম্বর ভাঙা ফাইল সরিয়ে এঁদের দোকানের একটা গুদাম খোপে বসতে দিলাম। আরশোলা এবং দু একটা ইঁদুর বিরক্ত হয়ে গেলো ছুটে।

...এখানেই কি আপনি থাকেন?...বললাম, হ্যাঁ।...একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পাণ্ডুলিপি খুলে পড়তে বসলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা পড়ে গেলাম একটানা। এঁরা কেউ ওঠার নাম করলেন না,

সকলের কৌতূহল যেন বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। শামসুদ্দিন আবুল বললে, বাঙলা সাহিত্যে এ-লেখার স্বীকৃতি অনিবার্য।··· শ্রীযুক্ত রাহা বললেন, আপনি তারাশঙ্করকে চেনেন? আমি বললাম, না।···সেকি! তিনি এখন স্বনামধন্য। মানিককে চেনেন?···আমি আবার বললাম, না।..অধ্যাপক বললেন, অনেক বিদেশী নামজাদা লেখকদের তুলনায় আপনার লেখা বর্ণনায় অভিজ্ঞতায় জীবন্ত।···আরো কদিন এঁরা এলেন। পরিচয় আরো একটু নিবিড় হল। সহানুভূতি আরো একটু দানা বাঁধল। অধ্যাপক আমার হয়ে দিলীপ গুপ্তের কাছে চিঠি লিখবেন বললেন। নতুন করে এঁরা যেন দায়িত্ব নিতে চাইলেন আমার অদৃষ্ট গড়ার। ছিলাম লাঞ্ছনার শিকলে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িত—এমন অযাচিত সহানুভূতি আমাকে যেন উদ্বেল করে তুলল। তবু সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমার জীবনের বড় একটা বাঁক ঘুরছে। সৃষ্টি করছে নব দিগন্তের নিশানা।

২।৬।৫৮ সকাল ৬টা-৯টা।

কে এই দিলীপ গুপ্ত? এঁর নাম তো কখনো শুনিনি। ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পে এক বৈপ্লবিক আদর্শ সৃষ্টি করছেন ইনি। বাঙালা দেশে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রকাশক এখন। একখানা বই দেখবেন, কেমন চমৎকার ছাপা বাঁধাই। বিদেশকেও যেন হার মানায়।

অধ্যাপকের হাত থেকে একখানা বই নিলাম। এমনটি যে আমাদের দেশে হতে পারে তা তো জানতাম না। সেকালের কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের তুলোর প্যাড্‌ওয়ালা মলাটের বাড়া তো কিছুই কল্পনায় আসে না।

হয়ত এখান থেকেই আপনার এ বই প্রকাশিত হবে। এঁদের আভিজাত্য আলাদা। যশ খ্যাতির সঙ্গে বেশ কিছু অর্থাগমও হবে বুঝলেন।

কদিন কী যে ছটফট করে কাটালাম—কিছুতেই সংবাদটা জানাতে পারছিনে, না স্ত্রীকে। কিন্তু বসে রইলাম না। শামসুদ্দিনকে একান্তে ডেকে গোটা পাণ্ডুলিপিটা হাতে দিয়ে অনুরোধ জানালাম, ভাই একটু পড়ে দেখো, এই সাম্প্রদায়িক ঘনঘটায় আমি কিছু ভুল করেছি কিনা!

যত্ন করে শামসুদ্দিন পড়ে ফেরত দিলে পাণ্ডুলিপি। বললে, আপনার রাজনৈতিক চেতনা সহজ সরল প্রগতিশীল। কোনো ত্রুটি পেলাম না আমি। তবে জায়গায় জায়গায় প্রাকৃতিক বর্ণনা একটু বাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। নিজে ভেবে যা হয় করবেন কিন্তু।

প্রগতিশীল বলতে কি বোঝায়?

সেই সুপুরুষ তরুণ হেসে হেসে ব্যাখ্যা করলে কথাটার—বিশদ ব্যাখ্যা। শুনে অনেকদিন বাদে মনে পড়ল নন্দলাল রায়ের মুখখানা। এ ব্যাখ্যা তো আমার কাছে নতুন নয়।

একটা দায়িত্ব বোধ করতে লাগলাম। আবার পালটে সুরু করলাম 'দক্ষিণের বিল' লেখা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যাদের সুখ-দুঃখ বেদনায় আজ আমি সম্বৃদ্ধ তাদের কথাই লিখব। সত্য বই মিথ্যার আশ্রয় নেবো না।

কলকাতা থেকে চিঠি এলো দিলীপ গুপ্ত নাকি এখানে নেই—দিল্লী গেছেন জরুরী কাজে। আপাতত আমার সাহিত্য জীবন নতুন কোনো চেহারা নিলে না। ক্রমে পার্টিশানের চাপ অনিবার্য হয়ে এলো। এখন ধন প্রাণ মান ইজ্জত নিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ঠরা আকুল। এ পরিস্থিতিতে সাহিত্য গেল তলিয়ে। আবার গতানুগতিক জীবন—সেই দাসত্ব, ছেলে মেয়ে স্ত্রীর দিকে চাওয়া যায় না। কাতারে কাতারে লোক চলেছে কলকাতায়। আমি কিন্তু বন্দী। তবু 'দক্ষিণের বিল' লিখছি।

প্রাক্তন বন্ধু ক্যাপটেন হ্যারির সঙ্গে দেখা। একটা ব্যবসা

দিতে চায় সে। এবং সেই জন্যই একটি বিশ্বাসী লোকের দরকার।

—কোথায় দিবি ব্যবসা?

কেন এখানে। হুজুগে আমি দেশ ছাড়ব না।

তুমি একটি আস্ত গাধা। এটা হুজুগ নয়। পার্টিশান অনিবার্য। এবং রক্ষক ভক্ষক হলে সেখানে শান্তিকামী মানুষ বাস করতে পারে না।

একদিন হ্যারির সঙ্গে পূর্ব বাঙলা ছাড়লাম। সুমুখে সাহিত্যের কোনো স্বপ্ন নেই। কলকাতায় সপরিবারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তারও স্থিরতা নেই। কী করে যে খাবো তাও জানিনে। শুধু ভরসা ক্যাপটেন হ্যারি চালিয়ে নেবে। কিন্তু কত দিন! কী ভাবে! তার ব্যবসারই তো গোড়া-পত্তন নেই! এই যে চলেছি, এ সবই তো আমার খরচ। এখানে বলা দরকার প্যাঁচে-পড়া টাকা কিছু উদ্ধার হয়েছিল।

দিন পনর এক আত্মীয়ের রান্না ঘরে কাটিয়ে দিলাম। কোথায়, কী ভাবে দোকান দেবে ক্যাপটেন হ্যারি, তার কোনো পরিকল্পনা নেই। আমিও ঝুলে রয়েছি দুরাশার বোঁটায়। কিন্তু লেখা বন্ধ করিনি 'দক্ষিণের বিল'।

৩।৬।৫৮ বিকাল ৪-৬টা

ধুয়ে ধুয়ে খাচ্ছি হাতের জমা টাকা কটি। স্ত্রীর তাড়ায় ঠিক পনরদিন বাদেই ৩৮ প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড কলিকাতা-৩৩ একটি কোঠায় এসে উঠলাম। ছোট্ট একটি পায়রার খোপ, তবে দক্ষিণ খোলা, সুমুখে কাঠা দশেক উঠান। অনেকদিন বাদে স্বাধীনভাবে হাত পা ছড়িয়ে ঘরে এবং বারান্দায় শুয়ে পড়লাম সবাই। কি খেলাম মনে নেই, ঘুমিয়ে নিলাম খুব। বারান্দা সমেত হাত আষ্টেক লম্বা, হাত সাতেক চওড়া অ্যাসবেস্টোর ছাউনির জন্যে সেলামী দিয়েছি পঁচাত্তর টাকা। কল পায়খানা থাকলেও রান্নাঘর নেই। কোনো অসুবিধাকে বড় করে না দেখে ওর মধ্যেই স্ত্রী তোলা

উনান কিনে ভাত চড়িয়ে দিলেন বারান্দায়। আমাকে দোর-গোড়ায় হাত দেড়েক চওড়া জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি লেখো। ছেলেমেয়েদের বললেন, চুপ। এইভাবে নতুন সংসারী সুরু হল। যা গেছে তার জন্য দুঃখ না করে, যা পেয়েছি তাই নিয়ে আবার যাত্রা সুরু। এবার স্ত্রী ক্যাপটেন, আট বছরের ছেলে বাসুদেব সহকারী—আমি শুধু শ্রম দিয়ে যাবো।

চাকা ঘুরাতে গিয়ে স্ত্রী দেখেন, তাঁর হাতে অবশিষ্ট জমা আছে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা। পাঁচটি মুখ, রিফিউজিরও অতিথ অভ্যাগত আছে দু একজন। হবু সাহিত্যিকেরও রয়েছে চা পিয়াসী সমজদার। এ-টাকা দিয়ে ক'দিন চলবে ?

দীর্ঘ দিনের কথা না ভেবে আমরা অল্পদিনের কথা স্থির করে নিলাম। মাসের কথা না ভেবে, পক্ষের। এবার সাম্যবাদকে জীবনবাদে প্রয়োগ করলাম। যেন লড়াইয়ে নেমেছি। ব্যক্তি এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে সংসার। ছোট বড় সকলের শ্রম অর্থ প্রতিভা দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা চাই। আমি লেখার গতি বাড়িয়ে দিলাম স্থিতধী হয়ে। আমরা স্থির করে নিলাম যে আমাকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি একটা কিছু হবে, অন্য কাউকে দিয়ে সে আশা নেই। পঙ্কজিনী এই সুযোগে ব্যক্তির মুক্তি চেয়ে বসলেই রক্ষা ছিল না। তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন আমি এতদিন অন্ধকারে কাটিয়েছি, এবার নেচে গেয়ে নিজেকে স্বার্থকতার স্বর্গদ্বারে নিয়ে যাবো, আমারও তো যৌবন যায় যায় !

হাতের টাকা দিন দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু একটা প্রশান্তির দুর্গপ্রাচীর গড়ে নিয়েছি। এমনি দুর্গপ্রাকারে নিজেকে সুরক্ষিত করে চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছি। সম্পৃক্ত অথচ বিমুক্ত এই আপাত বিরোধেরও সমবায় সাধন করতে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। এটা বাস্তবের তিক্ততাকে অস্বীকার করা নয়, বরং বলব তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় মাত্র।

হ্যারি একটা দোকানঘর ভাড়া করলে রাসবিহারী এবং রসা রোডের মোড়ে। তখনকার ওয়াক্ফ্ স্টেট দিয়েছে ভাড়া, কিন্তু কোনো গোলমালের জন্য তারা দায়ী নয়। তখনো চোরা-গোপ্তা ছুরি চলছে কলকাতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের।

দখল নেয়ার ভার পড়ল আমার ওপর—স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরের কাহিনী; আমাদের কলজে-চেরা স্বাধীনতা, আগস্ট না হলেও সেপ্টেম্বরের প্রথম।

দখল নিলাম, কিন্তু নকৃরি রইল না বেশি দিন। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে ফার্নিচার ফিট করা হল, সাহেবী কেতায় দর্জি-দোকান। কাঠের দোতলা, রেলিং-সিঁড়ি-লাইট-ফ্যান। কিন্তু আর টাকা নেই মূল ব্যবসা চালাবার। দিন রাত দোকানে থাকতাম, একদিন বিছানা গুটিয়ে বাসায় ফিরলাম।

হ্যারি আমাকে ঠকায়নি, কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেল স্ত্রী কন্যার। প্রথম যেদিন দখল নিতে যাই, সেদিনও মুখ শুকিয়ে ছিল এদের! আমি ভাবি, এটা বরাত নয়, শাখের করাত। কর্মকারের চাতুরী—এটাকে আঘাত মেরে ভাঙা চাই।

ছোট বড় অনেক গল্পে, 'বেআইনি জনতা' এবং 'একটি স্মরণীয় রাত্রি' উপন্যাসে আমার কি হাতুড়ির শব্দ শোনোনি? আমি পূর্ব সূরীদের উত্তর সাধক, তাই কমলাকান্তর দপ্তরের মশাল ধরে 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'-তে এসে পৌঁছেছি। খুঁজলে 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'-র ভিতর হায়ার ডাইলিউশনে শ'চাচাকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ সে কথা থাক। যদি রম্যরচনা বলো, 'কমলকান্তের দপ্তর' হচ্ছে সৃষ্টিধর্মী শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা। আমি ব্যঙ্গ উপন্যাসের প্রেরণা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রথম। তির্যক শ্লেষে বঙ্কিম বারবার বিদীর্ণ করেছেন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মেরুদণ্ড। রামপরায়ণ বলে, এখনকার রম্যরচনা ভঙ্গি সর্বস্ব, নইলে বড় জোর কথার সুড়সুড়ি। রমেশদা বলেন, ঠিক বলেছ ভাই, বঙ্কিমের নীতিবোধ আজ প্রায় লুপ্ত।

৪।৬।৫৮—সকাল ৯-১০টা

কে ?—কলম থামিয়ে মুখ তুললাম।

আমি রামহরি কর। —লম্বা শ্যামবর্ণ জোয়ান। কাজ করেন সরকারী কোন্ অফিসে যেন। প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ চলছে কলকাতায়। বেলা দশটার ঝক্‌ঝকে রোদে উঠানে এসে দাঁড়ান। আজ জুনের চৌঠা—উনিশ' আটান্ন।

আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

না, না আপনি লিখুন। এই নিন টোকনটা। কাল পরশু দিয়ে যাব চেকখানা।

আমি আমার কেন্দ্রীয় সাহায্যের টাকার বিল ভাঙাবার জন্য আগে প্রতিমাসে দু'তিন দিন যেতাম এ.জি.বি.-তে। কখনো বা গলদ ঘর্ম হয়ে ফিরতে হত সই মেলাতে গিয়ে। হাতের দরুন বারবার বিগড়ে যেতো লেখা। এঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, এ. জি. বি.-র দায়িত্ব ইনিই নিয়েছেন। আমি সময়তে যা পনর দিনে করে উঠতে পারিনি, শ্রীকর তা করেছেন দুদিনে। এবার যা দেরি, আমারই ত্রুটি। শ্রীকর পয়লা দোসরা বিল এবং লাইফ সার্টিফিকেটের জন্য এসে ফিরে গেছেন। যিনি ক্রশ চেক ক্যাশ করে দেন ক্ষিতীন্দ্র গুহ বক্‌সী—তিনিও তাগাদা দিয়েছেন। বাতে পা ফুলেছে, ক'দিন অন্ত্রের অভিযোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছি, এ্যাসবেস্টোর ছাউনিতে কখনো একশ চার কখনো আট ডিগ্রি হিট, তবু মনের একটা প্রশান্তি নিয়ে আছি। শৈলেনের প্রাক্তন সহপাঠী সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকক্ষণ এসে কাছে বসেছে, জবানবন্দি পড়ে শুনিয়েছি খানিকটা। বললে, আপনার লেখায় যে প্রশান্তি দেখছি, এই কঠোর বাস্তবমুখি জীবনের যুগে একি সম্ভব ?

শুধু বলা নয়—আক্রমণ করেছে সুধীন্দ্র। আমি বেশি প্রতিবাদ না করে শ্রীকর ও শ্রীগুহ বক্‌সীকে উপস্থিত করলাম।

ভাঙনের মুখে এঁরাই তো প্রশান্তির উর্বর ব-দ্বীপ। এঁদের অস্বীকার করে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ কী?

সুধীন্দ্র চলে গেল। আমি ভাবতে বসলাম, নিজেকে নিজে মিথ্যার মোড়কে মুড়ে কী খুব আত্মতৃপ্তি পাচ্ছি? তা নয়। একটিবার সারাজীবন ঘুরে এলাম, বাল্য কৈশোর সাহিত্য গার্হস্থ্য।

॥ ছাব্বিশ ॥

দোকানে সুবিধা হল না। একেবারে বেকার বসে আছি। 'দক্ষিণের বিল'ও বোধ হয় লেখা শেষ হয়ে গেছে তিনবারের মত। এবার এলেন রমেশদা। এসেই জানিয়ে দিলেন তাঁর উপস্থিতি। বাড়িয়ালার সঙ্গে বাদানুবাদ। কী যেন দাবি করেছে বাড়িওয়ালা অযৌক্তিক। রমেশদার প্রতিবাদ আমার কানে কিন্তু ভাল লাগল না। তখন আমার মনের সমস্ত যুক্তিতর্কের বুনিয়াদ ধসে পড়েছে। কোনো রকমে মাথা নুইয়ে শুধু বাঁচতে চাইছি। যেন তলিয়ে গেছি অবসাদে।

দিন দুই বাদেই আলাপ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—এই যেন রমেশদার মুখের আশ্বাস। আমার ভিতরের মুমূর্ষু শক্তি যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল আবার।

৫।৬।৫৮—সকাল ৫-৯টা

পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম পুরান আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে। একটা প্ল্যান এলো মাথায়। খুঁজে খুঁজে পেলাম নৃপেন্দ্র মুখার্জি, প্রাণতোষ দাশগুপ্ত এবং কিরণময় রাহাকে। শ্যালক রবীন্দ্র রায় চৌধুরীকেও পেলাম। জামাতা অনিল এবং সন্তোষ ইতিপূর্বেই এসে দেখা করেছিল। তখন জলের স্রোতের মত রিফিউজি আসছে কলকাতায়। একখানা পায়রার খোপ ভাড়া পাওয়াও সমস্যা। বড় জামাই-ই ঠিক করে দিয়েছিল টালিগঞ্জের এ বাসাটা। এর মধ্যেই দু' জামাই এবং শ্যালক সম্ভবমত আর্থিক

সহানুভূতি জানাতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু একটা ভাঙা সংসারের গোড়া-পত্তন থেকে মাসে মাসে চালিয়ে নেয়া অসম্ভব।

সকলের কাছেই প্রশ্ন পাড়লাম, কী করব এখন?

কেউ কিছু জবাব দিতে পারলে না।

কিন্তু একটা জবাব তো খুঁজে বার করতে হবে। কিছু কিছু সরকারী সাহায্য সুরু হয়েছে তখন, দিন তিনেক হেঁটে কিছুই হদিস করতে পারলাম না। ওখানে গেলে বলে সেখানে, সেখানে গেলে দাঁত-খিচুনি। মাঝে মাঝে মন্তব্য শুনি—কি বোকা বাব্বা। অনেকদিন কলকাতা ছাড়া, বারবার ভুল হয় রাস্তাঘাটের ঠিকানা। কথাবার্তা জগাখিচুড়ি।

সময় সময় কলকাতার পথের দিকে চেয়ে স্মরণ হয় ইস্কুল কলেজের উচ্ছল দিনগুলোর কথা। আর মনে পড়ে বাবার উক্তি—জীবনে যে কতবার বোকা এবং চালাক হলাম!

ঠিক করলাম যত কষ্টই হক ক্যাম্পে গিয়ে উঠব না। তা উঠলে আরো তছনছ হয়ে যাবে সব। বয়স যা হক, জোটাতে হবে একটা চাকরি। কী চাকরি পাবো, এবং কবে পাবো, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। ততদিনের রসদ কোথায়?

আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে একটা প্রস্তাব করলাম—প্রত্যেকে মাসে দশ দশটি করে টাকা দেবে। এমনি ছ'মাস। প্রস্তাবটা শুনে নৃপেন্দ্র, প্রাণতোষ, শ্রীরাহা সবাই রাজী।

ঘুরে ঘুরে একমাস আদায় করে দেখলাম, পূর্ণ প্রতিশ্রুতি হাতে এলেও শ' টাকা হয় না। অন্যূন মাসিক একশ' টাকা নইলে তো সংসার চলে না। তবু চালাতে হয় সংসার। মরা ঘোড়াও তো দায় ঠেক্‌লে গাড়ি বয়। ধার-দেনা বাড়তে থাকে রোজ। এক এক সময় চরম বিপর্যয়।

একদিন সংবাদ পেলাম শামসুদ্দিন আবুল কালাম এসেছে কলকাতা। গিয়ে দেখা করলাম। সব শুনে জিজ্ঞাসা করলে,

'দক্ষিণের বিল' কোথায়? চলুন দিলীপ গুপ্তের কাছে নিয়ে যাবো।...পরদিন এলাম। দিলীপ গুপ্ত নাকি এখানে নেই। কী করা যায়? শামসুদ্দিন আবুল কালাম আমাকে বললে, তবে চলুন বসুমতী মাসিক পত্রিকার অফিসে। ধারাবাহিক ছাপা হলে কিছু টাকা পাবেন।...দেরি না করে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। আজ জীবনের যে কত বড় একটা লগ্ন তা বুঝতে পারছিনে। এসেছি. টাকার জন্যে, কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটলেই ধন্য। অর্থের বাইরেও যে একটা পরমার্থ আছে এ-পথে, তা তখন আমার অনুভূতির বাইরে। কৈশোরে একবার আস্বাদ পেয়েছিলাম এখন তা ভুলে গেছি বেমালুম। এবার আমি তপস্যা করে আসিনি এখানে. এসেছি মুদীর মন নিয়ে। সব বিকিয়ে দিয়ে কিছু টাকা পেলেই হল। এতো আমার বাড়তি পরতা মাল।

অভিজাত্যের কোনো প্রকাশ দেখলাম না শ্রীঘটকের ভিতর। দু'টি একটি অন্তরঙ্গ কথা।—লেখা আমাদের পছন্দ হলে ছাপব বই কী! মাসখানেক তো সময় দিতে হবে।

শামসুদ্দিন আবুল কালামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ মাঝখান থেকে আমি বললাম, অত দেরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এটা সৌজন্য নয়—তাই বুঝি প্রাণতোষ আমার মুখের দিকে তাকালেন। অথবা এমন উক্তি তিনি শুনতে অভ্যস্ত নয়, তাই বুঝি একটু বিস্মিত হলেন।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার একটা অনুমানও সত্য নয়।

তখন পর্যন্ত প্রাণতোষের সাহিত্যিক খ্যাতি এমন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি, তখন সবে মাত্র একখানা ছোট গল্পের বই লিখেছেন 'মুক্তা ভস্ম'। 'আকাশ পাতাল' উপন্যাসের লেখক তখন পর্যন্ত পদ পরিক্রমা সুরু করেননি বাঙলা সাহিত্যে। কিন্তু তাঁর অদ্ভুত দরদী মনটার স্পর্শ পেলাম আমি।

বললেন, তা হলে দু' সপ্তাহ বাদে আসুন।

নিরুপায় হয়ে স্বীকার করে গেলাম। এবং দু' সপ্তাহ বাদে ফের হাজির। সঙ্গে শামসুদ্দিন ছিল, কী বরিশাল ফিরে গিয়েছিল মনে নেই।

শ্রীঘটক জিজ্ঞাসা করলেন, উপন্যাসখানা ছাপব আমরা, কত টাকা চাই?

কত চাইতে হয় না-হয় আমি তো জানিনে। আপনি কি কপি-রাইট কিনে নেবেন?

প্রাণতোষ হেসে বললেন, না, না—এখানে শুধু ধারাবাহিক বেরুবে, তারপর আর সমস্ত রাইট আপনার। ইচ্ছা হলে বই বার করতে পারবেন। কত টাকা চাই বলুন?

একটু ভেবে বললাম, আপাতত দু'শ দিলেই চলবে। এক মাসে না যদি সম্ভব হয় দু' মাসে দিন।

মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, দু'শ চাইলেন যে?

দু' মাস সংসার চলবে। এর ভিতর আর একখানা বই লিখব। তবে খুদে লেখা লিখে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, একজোড়া চশমা দরকার।

প্রাণতোষ আড়াইশ টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এমাসে দেড়শ, পরের মাসে একশ। এ টাকাকে আমি শুধু অগ্রিম বলে কখনো ধরে নিতে পারিনি—প্রাণতোষ করলেন যেন এক অন্ধকে দৃষ্টিদান। 'দক্ষিণের বিল' বসুমতীতে একটা সংখ্যা বেরুন মাত্র আমি প্রতিষ্ঠার সুগন্ধ পেলাম। আমি আজো প্রীতিমুগ্ধ সকৃতজ্ঞ। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা প্রাণতোষ ঘটক আমার জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

চশমা কিনে লিখতে বসে এবার অনেক প্রশ্ন মনে এলো। কেন লিখব? কাদের জন্য লিখব? কী আমার বক্তব্য? এবার বেশ কিছুটা সুস্থ হয়েছি, তাই দায়িত্ববোধ এসে গেছে পরিপূর্ণ। এতদিন

বসে যা ভেবেছি, উপলব্ধি করেছি, অধ্যয়ন করেছি মানব চরিত্র থেকে, সেগুলো এসে ভিড় জমাল। এবার সুরু হল ছাঁটাই বাছাই। 'দক্ষিণের বিলে' যা লিখব খণ্ডে খণ্ডে তার মাল-মশলা আলাদা করে নিলাম। মনে এলো সন্ন্যাস বড়, না সংসার বড়; তার জবাবে 'পদ্মদীঘির বেদেনী'-তে হাত দিলাম।. ভৈরব সংযম এবং ত্যাগের আদর্শ, ময়না ভোগের—মাতৃত্বের। লিখতে লিখতে নায়িকা ময়নাই বড় হয়ে উঠল'। দু'মাসে 'পদ্মদীঘির বেদেনী' রচনা সারা হল। ৭।৬।৫৮—সকাল ৯-১০টা।

রাঁধতে রাঁধতে সাহিত্যের স্বাদ, এমনটি জীবনে আর ঘটেনি, —পঙ্কজিনীর রাইটার এতদিন বাদে সত্যই লিখছে। দু'বেলাই রমেশদা আসেন, আরো দু'একটি শ্রোতা জুটে যায়। তার মধ্যে ভাগ্নে নীরেন ও অনিল নাগই প্রধান। মেয়েদের মধ্যে মনে পড়ে অঞ্জলি ও শেফালি দাশগুপ্তার নাম। বুলু ও এ্যালদির কৌতূহলও উল্লেখযোগ্য। এক প্যাকেট চা-র পাতা এক কেটলিতে ফেলে পঙ্কজিনী আপ্যায়ণ করেন। অমনি জমজমাট সাহিত্যের আসর। আমি প্রথম প্রথম এইভাবে নিজেকে যাচাই করে নিতাম। ক্রমে মায়া, মিলি, কুহু, সুলেখা শ্রোতা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ ভবিষ্যতে নায়িকা হওয়ার ঐশ্বর্য ফেলে যায় অবলীলায় এখানে। আমি কুড়িয়ে রাখি এ যুগসন্ধির কিশোরী যুবতী ও মহিলা মনের উপকরণ। এই পরিবেশে বসেই সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণের আস্বাদ পাই। বহু বন্দর-ছোঁয়া নাবিক, অনেক মেঘলোকে পাড়ি-জমান পাইলট, বুলেট-কামান মোকাবিলা-করা দুর্ধর্ষ সৈনিক, এখানে এসে ভিড় জমাত। আমি গণসংযোগ রেখে চলেছি নিয়মিত। তাই এখন আর পায়রার খোপে বাস করি বলে দুঃখ নেই। হাজার অসুবিধা তুচ্ছ করে ভাবি, এই আমার শান্তিনিকেতন।

নির্দিষ্ট ষাটটা দিন। দু'মাস গত হতেহ আবার অভাব। চাল,

চিনি, কয়লায় লাইন। নগদ টাকা চাই। ছেলে মেয়ে স্ত্রীর মুখ শুক্‌না। কী করব ভেবে অস্থির!

আবার শার্মসুদ্দিন আবুল কালামের সঙ্গে দেখা। এবার 'পদ্মদীঘির বেদেনী'-কে নিয়ে ছুটোছুটি। আমার চিন্তা সে যেন মাথা পেতে সম্যক নিলে। আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু লেখা কামাই দিলাম না। আমার অভিজ্ঞতা যখন মানুষের ভাল লেগেছে, এ অভিজ্ঞতা তো রয়েছে অফুরন্ত। বাকি জীবনটা বলেও তো শেষ করা যাবে না। এইবার 'মন্থন' উপন্যাসের জন্ম। একটা বক্তব্য স্থির করে নিলাম—এই স্বাধীনতায় হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ পেল কী? ছোট উপন্যাস, একমাস দশ দিনেই লেখা সারা হল।

ইতিমধ্যে শামসুদ্দিন আবুল কালাম অগ্রণী মাসিক পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে 'পদ্মদীঘির বেদেনী'র। দিয়েই উধাও। এই চঞ্চল মহান কবি-চরিত্রের আরো যে কত ভাবে কত বার স্পর্শ পেলাম! অনেক আনাগোনা অনেক পায়ের চিহ্ন এ বুকের ধূলায়। কত ঝড় বৃষ্টি গেছে মত ও পথের, তবু এ তরুণের পায়ের দাগ মলিন হবার নয়।

গতকাল দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল এসেছিলেন (৪. ৬. ৫৮)। কেন এসেছিলেন জানিনে। প্রশ্ন করেছিলাম, বললেন, পাশের বাড়ীতে একটু কাজ ছিল—তা শেষ করে দেখলাম আপনার বাড়িটা কাছে, তাই একটু খবর নিয়ে গেলাম। মনে হল এটা কথার চাতুরী। বিশ্বাস করলাম না। 'অচল পত্রের' গায় ফণীমনসার যত কাঁটাই থাকুক ওর আড়ালে দেখেছিলাম একটি উদারচিত্ত মানুষ—যখন অন্তত অহংকার, জীবিকার কোলাহল নেই।

কল্যাণ দাশগুপ্ত কেমন আছে?

ভাল।

একদিন সত্যিই ভাল লেগেছিল এর কিছু লেখা এবং ব্যবহার। সেই তাগিদেই এ প্রশ্ন।

দীপ্তেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কি লিখছেন?…বললাম, জবানবন্দি।
…উপন্যাস লিখছেন না?…একখানা লেখা রয়েছে, সময় পেলে আরো লিখব।…তিনি বললেন, হ্যাঁ মহৎ এবং আদর্শবাদ অথবা চিরন্তন কিছু নয়—বাব বার এডিশন হওয়া চাই। এডিশন মানেই টাকা, টাকা ছাড়া এযুগে বাঁচোয়া নেই।·চুপ করলেন শ্রীসান্যাল।

দীপ্তেন্দ্রের মুখে একথা আরো শুনেছি। তবু আমার স্থির বিশ্বাস এ-কথা শ্রীসান্যালের নয়—'অচল-পত্রের' উক্তি। আমি এ-মানুষটির মুখ ও মুখোশ অনেকবার দেখেছি। যদি ধরে নেওয়া যায় মুখোশ সত্য, তার উত্তরেই তো 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু' লিখেছি। আজ জীবিকার প্রশ্নে সাহিত্য যে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে তার প্রতিই শ্লেষ বিদ্রূপেব চাবুক।

আরো একদিন দীপ্তেন্দ্রকে বলেছি, আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার সুরু করেছি যাত্রা। আমার লক্ষ্য এডিশন নয়, মেরুজয়! আমি ইচ্ছা করেই দারিদ্র্যকে ববণ করে নিয়েছি। সেদিন মুখোশ তো চেঁচিয়ে বলতে পারেননি, তবে আপনি মরুন। ভেবে দেখো পাঠক ঠিক চিনেছি কি না একটি মানুষের দ্বৈত সত্তা! এমন যে কত ক্ষত বিক্ষত মহতের সন্ধান পেলাম!

৮।৬।৫৮—সকাল ৭-৯টা

এবার আব অগ্রিম কিছু দিতে পারলে না 'অগ্রণী'। সম্পাদক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য বললেন, মাসে মাসে পনর টাকা দিয়ে যাবো। প্রফুল্ল রায় বললেন, 'বসুমতী'র মত আমাদের ক্ষমতা নেই।

৯।৬।৫৮—রাত্রি ২-৪টা।

যাক তবু ঘর ভাড়াটা তো প্রায় কুলিয়ে যাবে, আমি স্বীকার করে এলাম।—ছাপুন।

এবার প্রথমই দেখা করলাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি স্মিত মুখে মানিক গাঙ্গুলীর কাহিনী শুনলেন। বললাম, আজ

হল মৌখিক পরিচয়, আন্তরিক পরিচয় 'দক্ষিণের বিল' লেখার সময় হয়েছে।

আমার কথাগুলো তিনি যেন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। আমার মাটির দীপখানি যেন মমতায় নারায়ণ তুলে নিলেন দেয়ালির লগ্নে। একে একে ছুঁইয়ে দিলেন সাহিত্যের স্বর্ণ দীপগুলোর সঙ্গে—এই তারাশঙ্কর, এই মনোজ, এই নরেন্দ্রনাথ মিত্র আর নীরব রইলেন নিজে। গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষকেও চিনলাম। যেমন ভাল লাগল গজেন্দ্রের 'রাত্রির তপস্যা', 'কলকাতার কাছে,' তেমনি সুমথর 'বাঁকা স্রোত', 'মাধুকরী'। এমনি চিনলাম মরমী সমঝদার জগদীশ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেককে। একটা সুপ্ত আশা রয়ে গেল। নিছক শিল্পী জীবনের দুর্বলতা। জগদীশ ভট্টাচার্যের দরদী কলমের স্পর্শে কী আমার বিখ্যাত গল্প-সংগ্রহ কোনো দিন আরো বিখ্যাত হবে না? কিন্তু তখন পর্যন্ত তো তেমন একটি গল্পও লেখা হয়নি। আমি সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় সকলের সাহিত্যই কিছু কিছু পড়লাম।

'ফসিল' পড়ে চমকিত হলাম, কিন্তু সুবোধ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতে অনেক দেরি হয়েছে। তবু এই অমিত শক্তিধরকে মনের তাগিদে চিঠি লিখে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

এই সময়ই আবার অচিন্ত্যদার সঙ্গে আলাপ। তিনি একজন মহামান্য হাকিম। আমি এক নগণ্য উদ্বাস্তু। একটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। কিছুক্ষণ বাদেই বুঝলাম এ আমার নিতান্তই কম্‌প্লেক্স। অচিন্ত্যর ভিতরে পূর্বস্মৃতি তখনো অনির্বাণ, প্রায় ঘণ্টা খানেক ফুটপাতে দাঁড়িয়েই বুঝি কথা হল। কত শুভ কুশলের প্রশ্ন। কী আশ্চর্য, জায়গাটার ভৌগলিক নির্দেশ আজ ভুলে গেছি! একি স্মৃতির মতিভ্রম? স্মৃতি বললে, না গো—সেদিনের অচিন্ত্য তোমার ভূগোল-খগোল সবখানি জুড়ে এক মহান পুরুষ। এই হল আসল গুরু শিষ্য সংবাদ। একালে বুঝি একান্তই দুর্লভ। তারপরই সাহিত্যাগ্রজ সজনীকান্ত দাস, গোপাল

হালদার, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। গুণ ও সৌজন্যতার বাঁধনে বাঁধল রঞ্জনকুমার দাস। আজো সে বাঁধন শিথিল হয়নি এতটুকু। বিজয় ব্যানার্জি ও মোহিতলালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন রমেশদা। আরো অনেকের কথা আজ আর মনে করতে পারছিনে। কিন্তু মোহিতলাল হয়েছিলেন 'বেআইনি জনতা' উপন্যাসখানা লেখার হেতু। তাঁর আঘাত ব্যতীত বোধহয় অত বক্তব্যে বলিষ্ঠ হত না রচনা। এখন তিনি গত, তবু তাঁর আত্মাকে প্রণাম জানাই, যখনই 'বেআইনি জনতা'র জন্মকথা স্মরণ হয়। কিন্তু সে কথা বিশেষ করে বলার আগে আরো কথা আছে। এবার তত্ত্ব নয়, কঠিন সংগ্রাম। উপোস ঝুলছে খাঁড়ার মত মাথায়। সকাল বেলা কিছু সংগ্রহ হলে বিকালের কথা ভাবিনে; কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে যাই। মাঝে মাঝে এই কলকাতা শহরে, যার গুদামে আছে হাজার হাজার দিস্তা কাগজ—সেখানেও সামান্য কিছু কাগজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। মানিক, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণের কিছু কিছু বাছাই গল্প পড়েছি, এঁদের ঐশ্বর্যে উত্তেজনা জন্মে, কিন্তু ছোট গল্প ছোট করে বলার টেকনিক আমার আয়ত্তে নেই। অর্ধাহারে কঠোর সংকল্প নিয়ে সাধনায় বসে গেলাম। বারবার লিখলাম, বাতিল করেও দিলাম বারবার নিষ্ঠুর হাতে। বছর তিনেক লিখতে লিখতে নতুন টেকনিক আয়ত্ত করলাম। ক্রমে জলের মত সরল হয়ে এলো প্রয়োগ পদ্ধতি। 'ক্লাইম্যাক্স', 'সমুদ্র পোত', 'কসাই', 'ডিউটি', 'কপি রাইট' তার নজির। তথ্য ও তত্ত্ব তো আমার নিজেরই রয়েছে প্রচুর—নতুন নতুন প্রযুক্তি আহরণ করেছি, আর আমার চিন্তার কিছু নেই। উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে আজো গল্প লিখি। কোনো শিল্পীই তাঁর জীবনের অসাধারণ গল্প দু' চারটির বেশি লিখতে পারেন না। কিন্তু মামুলী গল্পেও নিষ্ঠা না রাখলে বিপদ। তাই অনেক প্রথিতযশা জীবদ্দশায়ই মরে

থাকেন। আমি অবশ্য হুশিয়ার হয়ে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার সিদ্ধির বিচারক আমি নই, তুমি। সে-তুমিকে এতদিন ঠিক চিনতে পারিনি,—এবার রোগশয্যায় শুয়ে খানিকটা চিনেছি। সে-তুমি সুমুখে এসে যতটা জানায় তার অস্তিত্ব, তার চেয়ে বেশি থাকে পিছনে, ছায়ার মত, স্নেহের মত, মায়ের মত। সে-তুমিকে হয়ত তুমি হঠাৎ দেখবে সতীর্থ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভিতর। আশ্চর্য নয় দেখা বিজনকুমার ঘোষের ভিতরেও। বরেন, দীপেন্দ্র তো যুক্তি বিশ্লেষণেও ক্ষুরধার। কোনো সভা-সমিতিতে এদের কলম কিংবা মুখের বক্তব্য শুনলে অবাক হয়ে ভাববে কেমন করে ছড়িয়ে যাচ্ছে মাকড়শার চাইতেও নিপুণভাবে ক্ষিপ্র যুক্তি-প্রযুক্তির লুতাতন্তু জাল! এরপর বীরভূম ডি. ভি. সি. ঘুরে এসো, একে একে প্রত্যক্ষ করবে তপোবিজয় ঘোষ, অমলেন্দু মিত্র এবং গোপালকৃষ্ণ দত্তকে। কেউ ছাত্র, কেউ শিক্ষক, কারুর বা দাঁত ভেঙেছে ফাইলের গুঁতোয়,—শুধু কেরানী কিনা! এত হানাহানির মধ্যেও সে-তুমির অন্ত নেই। এলো লীনা সেন এক নবীনা কথা-শিল্পী। কিন্তু কলমে বেশ প্রবীণতা। একেবারে শেষলগ্নে বুঝি মানিক শেঠ। তার আগেই দেখছি এক ধারাল কিশোর প্রতিশ্রুতিকে, সুব্রত সেনগুপ্ত নাম। গল্প কবিতা লেখা ছবি আঁকা এর যেন অনায়াসলব্ধ। না, না শেষ হয়েও এ রাগিণীর থেকে যায় অশেষ পর্যন্ত টান। শীতের প্রথমতম অরুণোদয়ের মত কখনো দেখতে পাই শ্রদ্ধাশীল সতীর্থ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে, কখনো বা ভূষণ দাসকে। শেষ হয়েও সে-তুমির শেষ নেই!

আবার স্মরণ হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। আশ্চর্য এক সারল্য, আশ্চর্য এক সুপুরুষ ভাবপ্রবণ তরুণ। সেদিন রাত বারটা।—অমরদা! অমরদা!

কী ভাই? কে, শ্যামল? আমি এবং স্ত্রী উঠে বসলাম। এত রাত্রে কী মনে করে?—কী চাই?

কিছু সে চাইলে না। শুধু দিয়ে গেল সে সতীর্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি। এইমাত্র সে আমার 'চরকাশেম' ও কী যেন একটা গল্প পড়ে ছুটে এসেছে!

সে-তুমি যে কতভাবে এখনো আমার কাছে আসছে-যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা উচিত ছিল। কিন্তু আরো একটি বন্ধুর কথা না বললে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে জবানবন্দি। তার নাম বলার অধিকার সে ছিনিয়ে নিয়েছে নিষ্ঠুর হাতে, তবু বলতে হবে তার কথা ভিতরের তাগিদে। সুব্রতর মতই একদিন সে-কিশোর এসেছিল হাফপ্যান্ট পরে আমার রেশনস্টোরের কাউন্টারে। জোরজুলুম করে চেয়ে নিয়ে গেল 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' এক কপি। পরদিনই এসে ফিরিয়ে দিলে বইখানা। এত তাড়াতাড়ি পড়া হল দু'শ পাতা অমন একখানা কঠিন বই! ভাবলাম প্রশ্ন তুলে জব্দ করে ছাড়ব। দেবো শিক্ষা এই অকাল-পক্ক ছোকরাকে। তার জবাব শুনে আমিই উলটে জব্দ হলাম। এতটা তলিয়ে ভেবে আমিও তো লিখিনি বই। সে দিনের আঘাতে আমি আবিষ্কার করলাম এক প্রতিভাকে। আমার চাল, চিনি, আটা-ময়দার অন্ধকার কাউন্টার উজ্জ্বল হয়ে উঠল এক অপার্থিব দ্যুতিতে। আমি মনে মনে চেঁচিয়ে উঠলাম, ইউরেকা! ইউরেকা!

পরবর্তী কালে যে সপ্ত সারথীর উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করলাম 'বেআইনি জনতা', এই কিশোর তাদের ভিতর একজন—সর্ব কনিষ্ঠ কিন্তু আমার জীবনপঞ্জীর প্রথম সূত্রধর। তখন থেকেই লেখা সুরু। আজ জ্যেষ্ঠের আসনে এসে বসেছে সাহিত্যে। আজ তার আসমুদ্র হিমাচল পদযাত্রা। কখনো আসাম, কখনো আন্দামানে ডেরা। বিপুল বিস্ময়ে কান পেতে শুনি তার ঝড়ো গতি। জীবনের প্রস্তুতি পর্বের যে কা খরবেগ! এখন নিশ্চয় ও যুবকটি হয়েছে। অনেকদিন দেখা নেই, নাম প্রকাশেরও অধিকার নেই। তাই

শ্রদ্ধার কিছু দাগ রেখে গেলাম স্মরণের কাঁচা কংক্রিটে। পাঠক তোমার কাছে কী এ ভনিতা মেলোড্রামা ঠেকছে ?

একদিন 'মন্থন' উপন্যাসখানা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভাবছি, দশটাকায়ও বিক্রি করে যদি রেশন আনতে পারতাম ! 'পদ্মদীঘির বেদেনী'র পনর টাকা হাতে আসতে না আসতে খরচ। ভাল করে এখনো এখানের কথ্য ভাষা বলতে পারিনে—না আছে তেমন জামা কাপড়। আড়াই টাকার ক্যাম্বিসের জুতাও ছেঁড়া।

১০।৬।৫৮—সকাল ৬-৯টা।

এক সাহিত্যিকের কাছে গিয়ে হাজির। ইনি একজন বর্ষীয়ান্ কবি। এককালে পরিচিত ছিলেন—এখন যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে না পেরে জীবিত থাকতেই মৃত। ভাল একটা চাকরি করেন সওদাগরী অফিসে, বোধহয় বিজ্ঞাপন বিভাগে।

বললাম, কল্লোল যুগে কিছু কিছু লিখেছি, এখন পশ্চিম বাংলায় রিফিউজি। তখন আপনাকে আমি চিনতাম, এখন আমার দু'খানা উপন্যাস বেরুচ্ছে 'বসুমতী' ও 'অগ্রণী' মাসিক পত্রে। তৃতীয় একখানা লিখেছি, যদি একটু পরিচয়-পত্র দিয়ে দেন, তা হলে 'ভারতবর্ষে' গিয়ে দেখা করি।

আপনি কী লেখেন, না-লেখেন—কী করে চিঠি দিয়ে দেই বলুন ?

এই তো আমার উপন্যাস পড়ে দেখুন। পাণ্ডুলিপি এনেছি।

অতখানি কে পড়ে বলুন,—সময় কোথায় ?

তবে একটা ছোট গল্প,—সদ্য লিখেছি।

রেখে যান গল্পটা। ক'দিন বাদে আসবেন।

সপ্তাহ একটা কাটিয়ে গেলাম, কিন্তু চিঠি পেলাম না।

১১।৬।৫৮—সকাল ৬-৭টা

ঠিক এইখানেই মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

কথা। ইনি হচ্ছেন এক আলাদা জাতের মানুষ। এমন মানুষের সঙ্গে জীবনে বহুবার দেখা হয় না। কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনে সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে প্রথম দর্শন পেলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম সবিনয় ব্যবহারে। 'চরকাশেম' ও 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' তাঁর হাতে দিলাম। এখানে বলা বাহুল্য তিনি আমার উপন্যাস আগে পড়েননি। মিনিট দশেক উল্টে-পাল্টে দেখলেন বই দু'খানার পাতা। তারপর জহুরীর মত মুক্তা বেছে তুললেন ঝক্‌ঝকে সাচ্চা। সেই মুক্তায় সাজিয়ে দিলেন নিজের নামাঙ্কিত প্যাড্‌। বাইরে এসে পড়ে দেখলাম কী দুর্বার সত্যসন্ধ প্রখর দৃষ্টি। কোথাও বিশেষণের ব্যভিচার নেই, অথচ কিছুই বাদ যায়নি। আমি মানবিক রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্ব মৈত্রেয়ীতে বিশ্বাসী, কিন্তু আজ স্বাজাত্য বোধে কেন যেন গৌরবান্বিত হয়ে পথ চলে এলাম। ভাবলাম অনুর্বর নয় বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি।

একদা অচিন্ত্যকুমার 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র পাণ্ডুলিপি পড়ে দু'খানা আশ্চর্য চিঠি লিখেছিলেন। তখন ভেবেছিলাম, এ বুঝি স্নেহ ও প্রীতির আতিশয্য। এবার মিলিয়ে দেখলাম অন্তরালে রয়েছে একই সত্যসন্ধ দৃষ্টি। আবার ভাবতে বাধ্য হলাম বন্ধ্যা নয় বঙ্গভূমি!

॥ সাতাইশ ॥

দারিদ্র্য যত চরমে পৌঁছাচ্ছে, সংগ্রাম তত হচ্ছে তীব্র। জামা জুতায় তাপ্পির ওপর তাপ্পি। ঠিকানা জোগার করলাম দিলীপ গুপ্তের। 'মন্থন' বগলে নিয়ে সন্ধ্যার পর একদিন উপস্থিত। এলগিন রোড, কলকাতার সাহেব-সুব্বা অধ্যুষিত অঞ্চল। আমি দুরু দুরু বুকে গেট পেরুলাম। ভেবেছিলাম দারোয়ান বাধা দেবে, শামসুদ্দিনও সঙ্গে নেই আজ যে কিছু বুঝিয়ে বলবে ভোজপুরীকে।

বড় অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কেউ কোনো বাধা দিলে না। কার্ড পাঠালাম ; জনৈক সাহিত্যিক দর্শনপ্রার্থী।

১২।৬।৫৮—রাত্রি ২-৪টা

কিছুক্ষণ বাদে বৈঠকখানার লাইট জ্বল্‌ল আরো গোটা দুই।—আসুন আসুন ভিতরে আসুন।—বেরিয়ে এলেন দিলীপ গুপ্ত।

নমস্কার। আমি সেই 'দক্ষিণের বিলের' লেখক—অমরেন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরী বরিশাল থেকে বোধহয় একখানা চিঠি লিখেছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মনে আছে, ভিতরে এসে বসুন।—চির অতিথি-বৎসল দিলদরিয়া মানুষটিকে এক মুহূর্তেই চিনলাম আমি। কিন্তু ভিতরে কার্পেট, গালিচা মেহগনির কারুকার্য-করা টেবিল ইত্যাদি। র‍্যাকে র‍্যাকে থাকে থাকে বইর সজ্জা। প্রকাণ্ড কোঠাখানায় আরো কত আসবাব—সব যেন এইমাত্র কে মেজে ঘষে রেখেছে। আমার পক্ষে নাম বলা আজো কঠিন। মনে মনে ভাবলাম, এ না হলে এ হেন বিখ্যাত প্রেস!

এই জুতো জামায় ভিতরে ঢুকব?—আমি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

—স্বচ্ছন্দে!

আমি ভারসাম্য রাখতে না পেরে যেন একটা সোফার ভিতর তলিয়ে গেলাম। যাক ;—কিছুক্ষণ বাদে যেন মাটি পেলাম পায়।

বহুদিন বাদে প্রচুর সুগন্ধি সিগ্রেট। প্রকাণ্ড নক্সি-পেয়ালায় এককাপ চা। খোসবু ম-ম করছে। আজো ও-পথ দিয়ে চলতে গেলে চা সিগ্রেটের প্রলোভন এড়াতে পারিনে। আর এড়ান যায় না চির অতিথিবৎসল মানুষটির সঙ্গ। দায় নিদানে দরদে তুমি কেনা হয়ে থাকবে।

১৩।৬।৫৮—রাত্রি ২-৪টা

অনেক কথা হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিলীপ গুপ্ত জেনে নিলেন.

সব। অনুমোদন সাপক্ষে 'মন্থন' ওঁর জিম্মায় রইল এক পক্ষের জন্য। 'দক্ষিণের বিল' প্রকাশের ইচ্ছাও তিনি ব্যক্ত করলেন। বললেন, 'মন্থন' আমরা ছাপলে বাইশ ইম্প্রেশন দেবো। দাম হবে আনুমানিক তিন টাকা পার কপি। আপনি পাবেন ন'শো। এডিশন হলে আবার ন'শো'। পাণ্ডুলিপি না দেখলে 'দক্ষিণের বিলে'-র হিসাব এখন বলা কঠিন।

১৪।৬।৫৮—সন্ধ্যা ৬-৭টা

টাকা নয়—টাকার পাহাড়। মনে হল যেন এক গল্পলোকে বসে রয়েছি। আমি রাজপুত্র—স্বপ্নালোকে এ রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছি। আমার সম্পূর্ণ চৈতন্য আছে কী নেই বুঝতে পারছিনে। অর্ধস্ফুট আলোকে এক মহান যাদুকরকে দেখছি।

ওঠার মুখে দিলীপ গুপ্ত একখানা বিলিতি বাইণ্ডিং খাতা দিলেন হাতে। বেশ মোটা খাতা। দুখানা উপন্যাস লেখা হয়ে যাবে। সেই খাতাখানা নিয়ে ঘুরে ঘুরে কত বন্ধু-বান্ধবকে যে সগৌরবে দেখিয়েছি। আজো সে মলাট দুখানা সংরক্ষিত আছে। ফুরিয়ে গেছে ভিতরের সাদা পাতা। কিন্তু কথা ফুরাবার নয়। যখনই হাত পড়ে তখনই মনে হয়, তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে কাগজ একটা সমস্যা নয়। দিলীপ গুপ্ত আছেন বন্ধুপ্রীতি নিয়ে। এবার আর শ্যামবাজারের মোড়ে নয়—এলগিন রোডের রহস্যলোকে প্রত্যক্ষ করবে তাঁকে। ক্ষ্যাপার মত যদি খুঁজতে পারো, অবশ্য পাবে পরশপাথর।

১৫।৬।৫৮—সন্ধ্যা ৬টা

কিন্তু সোনা হয়েও হল না। তবে আর একটু কাহিনী আছে —বলছি শোনো।

বাড়ি ফিরেই জ্ঞানের নাড়ী টনটন করে উঠল। হায়রে, কোথায় দিয়ে এলাম পাণ্ডুলিপি! না আনলাম এতটুকু চিরকুট, না কোনো রসিদ। অতবড় বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে যদি আর

ভিতরে ঢুকতে না পারি! হাজার কেঁদে বললেও আমার কথা কানে তুলবে না। বলবে, মূর্খ। হয়ত এমনও হতে পারে দুচার সপ্তাহের মধ্যে নামধাম পালটে বেরিয়ে যেতে পারে উপন্যাস। একটা নকলও যদি থাকত!

সন্ধ্যা হতে না হতে পরদিন গিয়ে উপস্থিত। স্ত্রীর কাছেও কিছু ফাঁস করিনি লজ্জায়। চব্বিশটা ঘণ্টা কী করে যে গত করেছি!

সব শুনে দিলীপ গুপ্ত কী হাসি যে হাসলেন! শিশির ভাদুড়ী সরেজমিনে নেই। থাকলে এ হাসি অনুকরণ করা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব ছিল। নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু বুঝতে পারছি রঙ পালটাচ্ছে বারবার।

শ্রীগুপ্ত বললেন, এক রাত্তিরে আমি পাণ্ডুলিপিখানা শেষ করেছি। বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি উদ্ধৃতি করে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর জিজ্ঞাস্য, আপাতত কত টাকা চাই?

ঐ পূর্বের জবাব—বললাম, দু'শ। তবে এক মাসে সম্ভব না হলে দুমাসে দিন। দু'মাস বাদে আবার একখানা উপন্যাস নিয়ে আসব। আপনারা কী ছাপবেন?

নিশ্চয়।

১৬।৬।৫৮—সকাল ৬-৮টা

এখানে বসেই 'চরকাশেম'-য়ের বহিরেখা নির্দিষ্ট হল। আমি বললাম, দিলীপ গুপ্ত শুনলেন একান্ত হয়ে। ভূমিহীন একদল হিন্দু-মুসলমান জেলে-কৃষাণের অভিযান। রূপক কিন্তু ইতিহাস আশ্রয়ী। এ অন্ধকারের ইতিবৃত্ত নয়, জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। ওরা যুগ যুগ ধরে বাঁচতে চায়, কিন্তু অ্যাটম বমের মত অন্তরায় সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষের। তবু ওরা প্রতিবাদ করে বাঁচে। ছিয়াত্তর, তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর নির্মূল করতে পারে না

ওদের প্রাণ-কামনাকে। আমি যুগের হুজুগের একটা রেখাও টানিনে—দেখাই চিরন্তনকে।

শ্রীগুপ্ত বলেন, চমৎকার হবে—লিখে নিয়ে আসুন।

উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে কী না হয়! দুমাসও লাগে না 'চরকাশেম' লিখতে। কিন্তু এবার আর কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেন না শ্রীগুপ্ত। 'চরকাশেম' আর পড়া হয়ে ওঠে না। ভাল মন্দ একটা মতামতও জানতে পারছিনে। কী যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে! অবশেষে একজন পাঠক জুটে গেলেন। তাঁর চোখের মোটা ফ্রেমের চশমা জোড়া দেখে খুবই ভক্তি হল আমার। কারণ এতকাল অজগণ্ড গ্রামে বাস করে এমন চশমা দেখিনি। মনে হল ইনি যেমন রসিক তেমনি সুপণ্ডিত, নইলে অমন চশমা!

'চরকাশেম' পড়ে রায় দিলেন, কিছু হয়নি—একান্ত অসার্থক, নিতান্ত মামুলী। 'পদ্মানদীর মাঝিব' পরে এ বই না লিখলেও চলত।

আমি বললাম, তবে কী বাতিল করে দেবো? আপনি হুকুম করলে ছিঁড়েও ফেলতে পারি। কী হবে অসার্থক লেখা রেখে।

না, না সেকী কথা! আপনি অত সিরিয়াস হচ্ছেন কেন? আমার মন্তব্য অভ্রান্ত না-ও হতে পারে।

ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ কবে লাভ নেই। আমি মনে মনে বললাম শত ধিক এঁদের চরিত্রে। এরা অনায়সে পা ফেলে চলতে পারেন দু'নৌকাব ডালিতে। নিজের মতামতের ওপর একটা বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা পর্যন্ত নেই।

সাহিত্যে পরগাছার এই প্রথম সন্ধান পেলাম। প্রশ্ন এলো, এরাই কী আসল সমঝদার?

'চরকাশেম' তখনি ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। 'মন্থন' রইল দিলীপ গুপ্তের জিম্বায়। স্ত্রীর অসুখে, মেয়ের বিয়েতে দিলীপ

গুপ্ত বারবার দরাজ হস্তে সাহায্যে করলেন, কিন্তু কী যেন কারণে 'মন্থন' আর ছাপতে পারলেন না। হয়ত এ মন্থনে অমৃতের আশা ছিল না। কে আর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করে হলাহল তোলার দায়িত্ব নেয় বলো? আমার এ উপন্যাসখানা ছোট হলেও বক্তব্যে কেউটের ছোবল। অনেক দিন পরে জানতে পারলাম, একান্ত সত্য কথা বিশ্ব-প্রেমের অন্তরায়। কিন্তু জাতির বুকে ছুরি পড়েছে, টুকরা টুকরা হয়ে গেছে বাঙলার মাটি। সব জেনে আমি মৃত্তিকার কবি কী করে এ ক্ষেত্রে বিশ্ব-মৈত্রেয়ীর স্বপ্ন দেখি? তবু দিলীপ গুপ্ত আমার কাছে দানে সত্য, আমি গ্রহণে।

১৭।৬।৫৮—সকাল ৬-৯টা

তারপর অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। বয়স বেড়েছে মনের এবং দেহের। প্রায় একটা পরিণতির সীমান্তে এসে ঠেকেছি আমি। এখন আর দিলীপ গুপ্ত আমার কাছে প্রকাশক নন—যাঁর কার্পেটে একদা পা রাখতে সংকোচ বোধ করেছি। এঁদের বন্ধু বলে পরিচয় দেয়ার ধৃষ্টতাও আমার নেই। তবু বলব এঁরা আমার মূল সুর। কখনো সান্ধ্য ভৈরবী, কখনো বা ভীমপলশ্রী। তাই উদীয়মান বন্ধুদের এখনো উৎসাহচ্ছলে বলি ক্ষ্যাপার মত যদি খুঁজতে পারো অবশ্য পাবে পরশপাথর। সোজা এলগিন রোড ধরে এগিয়ে যাও পাঁচ মিনিট।

'চরকাশেম'-য়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে আছি, কোথাও যেতে সাহস পাচ্ছিনে অসার্থক লেখা নিয়ে। কিন্তু ছেলেমেয়ে ভাত চায়, স্ত্রী বলেন, আর ধার করা চলে না কয়লা ঘুঁটে চাল। আমিও অল্পতেই পরিশ্রান্ত বোধ করি। বুঝতে কষ্ট হয় না, একেই বলে কঠোর বেকারি। একটা ভরসা ছিল সেই দশ দশটাকার প্ল্যান, কিন্তু তারও মেয়াদ ফুরিয়েছে। কত আর বিরক্ত করা যায় আত্মীয়-বন্ধুদের! ব্যক্তির মজ্জা মাংস রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্রমে পুষ্টির অভাবে নেতিয়ে পড়ছে গোটা পরিবার। এই ছবিটা একটু বিশ্বগ্রন্থি

ঘুরিয়ে দিতে পারলে সিম্বলিক হল—আমি উপলব্ধির চাবুকে উপকরণ পেলাম।

একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল তাজা। ভাবলাম, আর দেরি করা চলে না। আলস্য করলে আর তো বলা হবে না আমার ঐতিহাসিক বক্তব্য। যে ভাঙন দেখলাম, তার তো রূপ দেওয়া হল না সাহিত্যে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ক্ষোভ করবে, দুঃখ করবে—তখন যেখানেই থাকি, কী কৈফিয়ত দেবো? আজ সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন কোনো উপন্যাস নেই, থাকলে আমরা কী এত বিড়ম্বনায় পড়ে হাবুডুবু খেতাম! স্ত্রীকে একটু কড়া সুরে বললাম, জামাইদের একটু শক্ত চাপ দাও, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আবার যাও, বুঝিয়ে বলো, সবার দায়িত্ব রয়েছে এ রচনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। আমাকে কেউ বিরক্ত করো না আর। মনে রেখো আমার সময় নেই কিন্তু।—সমস্ত পরিবারকে আমি উপোসের মুখে রেখে, রক্ত বমি করতে করতে ধ্যানস্থ হলাম। রচনা সুরু করলাম—'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'। পূর্ব বাঙলা ভাঙনের উপকরণে হাত দিলাম। মুখোশ খুলে দিলাম সমস্ত রাজনীতি ও অর্থনীতির। পড়ে বুঝলাম রচনা এপিক ধর্মী হচ্ছে। হচ্ছে প্রতিভূমূলক—যা সর্বকালের গ্রহণযোগ্য।

হ্যারিকেনের পলতে যখন তেলের স্পর্শ পায় না, তখন বুদ্ধিমান মাত্রে জল ঢেলে কলটা ঘুরিয়ে দেন। এমনি একটা কৌশল করে স্ত্রী সংসার চালাতে লাগলেন। মন্ত্রীসভার সভ্য তের বছরের মেয়ে গীতা এবং আট বছরের ছেলে বাসুদেব।

এখানে আমার স্ত্রী একটা মোক্ষম মোচড় দিতে পারতেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে। কেন শেষ জীবনে তোমার জন্য এত কষ্ট করব? আমার ভিতরে কী কোনো সুপ্ত প্রতিভা নেই? কিন্তু তিনি তা দেননি, তাই সমগ্র পরিবারের জীবন বইতে লাগল একই নাটকের খাদে।

রক্ত উঠছে গলা বেয়ে, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই, ক্ষিধায় পেট মোচড়াচ্ছে, সময় মত রেশন আনার সঙ্গতি নেই—কিন্তু লিখে চলেছি পুরো দমে। ব্যবহার করছি যা কিছু শরীরের সঞ্চিত পেট্রোল, এনার্জির ইন্ধন। আমার আর যে সময় নেই।

ক্রমে ক্রমে ডান হাতের কব্জিতে ক্র্যাম্পসের সঞ্চার হতে লাগল। তবু বিরতি দেয়ার উপায় নেই। এখন গড়ে দৈনিক লিখি এক পাতা, তখন দশ এগার পাতাও লিখে একেবারে নেতিয়ে পড়িনি।

এইবার রামমোহন ঘোষের আবির্ভাব। দ্বিতীয় রাম তাঁর মহিমা নিয়ে দেখা দিলেন উদয়াচলে। আমি চেয়ে দেখলাম এক বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গ সুপুরুষ। জোড়া ভ্রূ, খাড়া নাক। যেন মুহূর্তে অনেক কিছু তলিয়ে বোঝার অধিকার আছে এঁর। আপনি বুঝি লেখেন?

হ্যাঁ।

কি লেখেন? গল্প না উপন্যাস?

দুটোই।

পড়ুন তো! পাড়ায় আপনার কথা শুনে এলাম।—রামমোহন পাশে এসে বসলেন। পাণ্ডুলিপি সরিয়ে রেখে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। অল্পের ভিতর কথা হলো অনেক। ধারণা হল নিছক কৌতূহলে এসেছেন। কৌতূহলের গুটিপোকা প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেলে রামমোহন আবার চলে যাবেন। এঁর কাছে সাহিত্যের পরীক্ষা দেয়া মানে সময়ের অপচয়। তবু 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র খানিকটা অংশ পড়ে শোনালাম।

ক্রমে টের পেলাম রামমোহন শুধু কেরানী নন। এঁর একটা ব্রত আছে। সময়তে মনে হবে খেয়াল, সময়তে পাগলামি। আমি কিন্তু ঘোর তুফানে হালে পানি পেলাম।

তাই ভাবি কোন্ পুণ্যে দুই রাম সত্য হল এ অকিঞ্চিৎ রামায়ণে!

॥ আউাশ ॥

১৭।৬।৫৮—বিকাল ৩-৬টা

আজ একখানা চিঠি পেলাম, লিখেছে মানবেন্দ্র পাল। অনুযোগ, কেন যাইনি সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে গল্প পড়তে গত রবিবার? সে এবং বসন্ত সরকার নাকী শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। মানবেন্দ্র সতীর্থ, বসন্ত বন্ধুজন। একদিন ছিল চিরবসন্তের মতই সরস বলগাহীন। আমাতে শীতের মালিন্য দেখে ওরা ধীরে ধীরে বুঝি সরে গেছে। নতুবা অন্য কিছু, যার কার্য কারণ আমি জানিনে আজো। চিঠি আর লেখা হল না, জবানবন্দিতেই জবাব লিখে যাই—পাত্র কখনো খালি থাকে না, দুই রামের স্মৃতিতে আজ আমার বুকের পুঁথি ভরপুর। তবে আমন্ত্রণ রইল, মাঝ পথে এমন অনির্দিষ্ট ভাবে হতাশ না হয়ে, সোজা আগের মত এখানে চলে এসো। শুধু উৎসব ব্যসনে নয়, রাজদ্বার শ্মশান পর্যন্ত যে সঙ্গ দেয় সেই তো বান্ধব। তোমাদের আমন্ত্রণ রইল চিরদিন।

ধার-কর্জ শেষ সীমায় পৌঁছেছে। রামমোহনের নির্দেশ মত কচি বাসুদেবকে রিফিউজি সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে পাঠিয়েছি তাঁর অফিসে, বেলা গেছে, কিন্তু কাউর ফেরার নাম নেই। লিখতে লিখতে কেবল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি। স্ত্রী তো একবার ঘর একবার গেট করছেন। বাসুদেব সাত দিনের রেশন নিয়ে হাজির। হাওড়া থেকে সরকারী সাহায্য ধরে দিয়েছেন রামমোহন—অফিস আওয়ারে গা ঢাকা দিয়ে।

বাসুদেবের হাত দুখানা ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়। তার মা এলেন ছুটে।

আমরা পথ চেয়ে রইলাম। কিন্তু সেদিন আর পরিচিত গলায় বৌদি ডাকটি শোনা গেল না। পরদিন বাজারে যাচ্ছি, একটি আধবয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন রামমোহন। দাঁড়ালাম। একখানা কাঁসার থালা বন্ধক রেখে পাঁচটি টাকা জোগাড় করে

দিতে হবে এক্ষুনি। নটা বাজে, প্রায় অফিস টাইম। রাম বিরক্ত হয়ে বলেন, এই জন্যই আমার প্রমোশন হল না. আর হবেও না কোনো দিন—নিত্য লেট।

রামমোহন চলে গেলেন স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করে। একটা ধন্যবাদও জানাবার অবকাশ হল না।

আর একদিন দেখা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চোখ মুখে ক্লান্তির কালি। ছুটেছেন হনহনিয়ে রামমোহন। শতে শতে রিফিউজি এসেছে ভিটামাটি উৎখাত হয়ে টালিগঞ্জ। তাদের জোগাতে হবে দানাপানি। রোজ চার পাঁচ মন চাল চাই—সেই অনুপাতে ডাল নুন ইত্যাদি। আজো সময় দিলেন না এই মহিমাময় ধন্যবাদ জানাতে। আমি সকৃতজ্ঞ হয়ে মনে মনে প্রণতি জানালাম।

অবশেষে 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' শেষ হল। কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কাশির সঙ্গে তেমনি তাজা তাজা খুন। মনে মনে বললাম, এখন মরা তো চলবে না—আমার যে অনেক কাজ বাকি। এভাবে পাণ্ডুলিপি ফেলে গেলে, কেউ তো জানবে না কী লিখেছি! কেন আমরা যাযাবর? অনেক মূল্য দিয়ে কী আমরা পেয়েছি! তীব্র প্রাণ-কামনাকে তীব্রতম করলাম। লড়াই চলল দারিদ্র্যের চড়াই ভেঙে। কিন্তু বড় চোট পেলাম 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' শেষ করে। বেশ একটু শিথিল হয়ে গেছে ভিতরের বাঁধন। আবার সুরু করলাম লেখা। আবার কঠোর সংগ্রাম। হাতের আঙ্গুলগুলো টনটন করছে, মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যাচ্ছে কব্জি। ফুরিয়ে যাচ্ছে কেরোসিন। এবার পঁচিশ দিনে শেষ।

১৮।৬।৫৮—সকাল ৬-৯টা।

আমি শয্যা নিলাম। চারদিক অন্ধকার—জমাট, ঠাস বুনোট। বুঝি আর আলোর চিহ্ন দেখা যাবে না কোনো দিন।

আবার উদয়াচলে রাম। আশ্বাসের বিশ্বাসের সঞ্জীবনী

শক্তির বর্ণলীলা। ক্ষণকাল অভিভূত হ'য়ে চেয়ে রইলাম।—চলুন ডাক্তারের কাছে, এ ভাবে পড়ে মরতে দেয়া যায় না।

ডাঃ সন্তোষ পাল বাকিতে চিকিৎসা সুরু করলেন। বাকির ফল প্রায়ই ফাঁকি। কিন্তু আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম এই বিজ্ঞ স্বল্পভাষী চিকিৎসকের গোটা কয়েক সুঁইয়ের খোঁচায়। আলাপ হল ডাঃ কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। শিল্পী ডাক্তার। বহুধা রচনার অধিকারী। অভয় দিলেন, যখনই প্রয়োজন হয় ডাকবেন। শুধু সাহিত্য সভায় নয়, বারবার তাকে নানা বিড়ম্বনার মধ্যেও ডেকেছি। প্রতিশ্রুতি মত তিনি আজো সাড়া দিচ্ছেন। এঁদের কাহিনী বলতে গেলে টালিগঞ্জের আর একটি ডাক্তারের কথা মনে আসে, শিবপ্রসাদ বসু। ইনি লেখক নন, দুর্ধর্ষ সমালোচক—আজ পর্যন্ত তাঁর বাঙলা সাহিত্যে মাত্র একখানি বই-ই ভাল লেগেছে, নামটা আমার মনে নেই। তবে ইনিও বন্ধুবৎসল। সে প্রমাণের অভাব নেই।

কিছুদিনের জন্য আবার রাম হাওয়া—আবার উদয় অকস্মাৎ। —চলুন সাহিত্যিক আজ আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র পাণ্ডুলিপি বগলে করুন।

জামা কাপড় যে নেই পরিষ্কার।

যা আছে তা-ই পরে নিন। চটপট করুন। বৌদি চা? ও, বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে আদর কমে আসছে।

স্ত্রী হেসে বলেন, একটু সময় দেবেন তো তৈরী করার—কী মুশকিল! পায়ের তলায় কী সরষে? একটু বসুন।

দরকার নেই—বরং দাদাটিকে সাজিয়ে দিন। চা খাবো আর একদিন।

পাণ্ডুলিপি বগলে নিয়ে বেরুলাম। একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায় ছিল—নইলে মনে হত পিতৃমাতৃ দায়, চেহারাটা এমনি হয়েছে।

রাউণ্ড টেবেল কনফারেন্স যেন। দেবেশচন্দ্র বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় আই. সি. এস, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম. এল. সি (তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান), অধ্যাপক অনিল চক্রবর্তী এবং শিবশম্ভু সরকার উপস্থিত।

রামমোহন আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই সেই প্রতিভা, যাঁর পুনর্বাসন একান্ত জরুরী।

১৯।৬।৫৮—সকাল ৬টা-৯টা।

রামের অনুরোধে আমাকে খানিকটা পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতে হল। কিন্তু কয়েকটা পাতা পড়েই গলার স্বর ভেঙ্গে গেল। এ স্বরভঙ্গ রোগের প্রতিক্রিয়া নয়--মনে পড়েছে গোটা পূর্ব বাঙলার ছবি। গাছপালা মঠ মসজিদ জলবায়ু আকাশের রূপ, পিতা পিতামহ প্রতিবেশীর স্মৃতি—পঞ্চরত্ন, গোরস্থান, সোনালী ফসল। তারপর কান্না, অগ্নি, বলাৎকার, ধর্ষণ। মানুষের চরম অপমান। একটা বলিষ্ঠ জাতির বিশিষ্ট অংশ মুছে গেল বিংশ শতকের পাতা থেকে।

দেবেশবাবু বললেন, আজ না হক, আর একদিন হবে, এখন থাক।

রামমোহন পরদিন আবার নিয়ে এলেন আমায়। সাত দিন দেবেশবাবু শুনলেন পাণ্ডুলিপি এবং ঘনঘন মুছলেন চোখ। আজ তিনি ইহলোকে নেই। লিখতে লিখতে করকর করছে চোখ। চশমার কী পাওয়ার বদলাতে হবে? একটু মুছে নিতে হুকুম চাই পাঠক।

দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে দেবেশবাবু কদিন বাদে বললেন—আপাতত শ পাঁচেক টাকা তুলে দেবেন আমাকে।

আমি ভাবি, এক্ষুনি হলে দোষ কী ছিল?

সব শুনে রমেশদা বললেন, এখন নিশ্চিন্ত মনে কলম চালিয়ে

যান। আমি জানি এ হতেই হবে—কিন্তু গিন্নীর জন্য বেনারসী কই? তিনিই তো মূল গায়েন।

দিন যায়, রমেশদার ভবিষ্যৎ বাণী আর সফল হয় না। টালিগঞ্জের পাঁচ মুচ্ছুদ্দি আর এক হতে পারেন না। রামমোহন বলেন, এত ঝামেলা যে কাউকে কিছু দোষ দেয়া যায় না—অথচ আমার জুতোর বদলাতে হবে সোল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনোজদার কাছে নিয়ে গেলেন। 'পদ্ম-দীঘির বেদেনী' প্রকাশের চুক্তি করে পঞ্চাশটি টাকা অগ্রিম দিলেন বেঙ্গল পাবলিসার। তারপরই নারায়ণ 'চরকাশেম' প্রকাশের জন্য সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের সঙ্গে দিলেন যোগাযোগ করিয়ে। তখন তখনই টাকা পেলাম না, কিন্তু ভরসা পেলাম, সহানুভূতি পেলাম প্রচুর। ইনি কথায় দক্ষ, মমতায় মা।

সব ছাপিয়ে এঁর কবি সত্তা অতুলনীয়। তাই আমার 'চরকাশেম' ও সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' বুকওয়ার্লেডের মার ফত প্রথম প্রকাশ করে যে গৌরব পেলেন ও দিলেন তাতে খুশী থাকতে পারলেন না। এঁর বাণী আরো প্রসারিত দিগন্ত অন্বেষী। চায় চিত্ররূপ পেতে। চায় সহস্রের সঙ্গে কণ্ঠে মিলিয়ে চলতে। তাই সচ্চিদানন্দ আজ নতুন হয়ে 'যাত্রী'। পুরা কীর্তিকে হয়ত বর্তমানের রাখিবন্ধনে বাঁধার কল্পনা। এঁর আনন্দলোক যাত্রা সফল হক—সার্থক হক।

আজ আমার বই অনেক। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হল 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী'—এক তারিখে যমজ ভাই-বোনের মত। পাতা ওলটালে আজো অনুভব করি প্রীতির রোমাঞ্চ। আর একবার বলতে বাধা নেই নারায়ণ চির জাগ্রত!

এ-গেল আগের ও পিছের কথা। মাঝখানে রামমোহনেরও ঘুম নেই। রাম বিনিদ্র উৎকণ্ঠ। এ অযোধ্যার রাম নয়, নিতান্তই সেই মসিজীবি। তবু চিন্তা রামায়ণ সমাপ্ত হয়নি। রামমোহন

হন্যে হয়ে সপ্ত সমুদ্র মন্থন করে টাকা তুলছেন। মাঝে মঝে পাচ্ছি তার স্বাদ। রমেশদাও সঙ্গে আছেন। অধ্যাপক অনিল চক্রবর্তী দিচ্ছেন কলেজ কামাই। ইদানীং তিনি ‘পদ্মদীঘির বেদেনী’-র পাণ্ডুলিপি পড়ে আরো আকৃষ্ট হয়েছেন। ত্রুটি কিছু ধরলেও প্রশস্তি করেছেন বিস্তর। দক্ষিণ কলকাতায় একটা যেন সাড়া পড়ে গেছে, এসেছে, কে যেন এসেছে একজন—যার চালচুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কলম সম্বল! আমি ব্যঙ্গ শ্লেষ ঈর্ষা আদর্শ শ্রদ্ধা হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলাম। এখানে বসেই খবরের ঢেউ পাচ্ছি নানা বকম, ছড়িয়ে যাচ্ছি বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে।

ভাল মন্দ কোনো ঢেউতে আমাকে কাবু করতে পারলে না। কিন্তু কাবু করলেন দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়—কবি, রমেশদার এক বন্ধু। আমারও বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি কথায় কথায় বললেন, এ বার্থ অফ এ সঙ্।

অমনি নিম্ন বাঙলার ঢপ কীর্তন কবির পালা আমার ভিতরে ঢোল মৃদঙ্গ খোল মন্দিরা নিয়ে বেজে উঠল। শুনলাম মনা বৈষ্ণবী সৌদামিনীর স্বভাব দরদী গলা। কিশোর নিমাই বৈরাগ্য যায়, কিন্তু কচি বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনো ঘুম ভাঙেনি। দেখলাম রাগ-প্রধান কণ্ঠ নিয়ে ভক্ত মধু শীল গঙ্গাতীরে—(তোমার) ষোলকলার একটি কলা দাওহে···। ঈশ্বরাশ্রয়ী সমাজে দেখলাম, যারা পুণ্য নাম কীর্তন করে, তারাই বঞ্চিত অপাংক্তেয়। দেখলাম কুরূপ গদাইয়ের অপরূপা প্রণয়তৃষ্ণা। লিখলাম, ‘একটি সংগীতের জন্ম কাহিনী’। এই ঢপ কীর্তনের পিছু পিছু কত যে ছুটেছি! আমার বাপ দাদাও ছুটেছেন। তোমরাও ছুটতে, কিন্তু সে মাধুর্য এখন রেডিওর মিউজিয়ামে বন্দী। যারা গায় তারা জীবন নয়—মাইক। কালের কপোল থেকে ঝরে পড়েছে এক বিন্দু অপূর্ব সংস্কৃতি।

আভা ও অনুভা গুপ্তার সঙ্গে আলাপ হল—মাধ্যম দীনেশ

গঙ্গোপাধ্যায়, মাধ্যম উজ্জয়িনী সাহিত্য সভা। মধুক্ষরা আবৃত্তি শুনলাম। পেলাম সশ্রদ্ধ আতিথেয়তা। তাঁদের চেষ্টা রইল যাতে করে 'পদ্মদীঘির বেদেনী' বাণী-চিত্র হয়।

এই সময়েই অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়—'আজ প্রডাক্শনের' সর্বময় আজ। একদা ছিলাম দুজনে এক কলেজের ছাত্র। আলাপে আলাপে কত কথাই যে বেরুল। দেখলাম জীবনটা রেণু রেণু করে গুড়িয়ে তবে উঠেছে সুউচ্চ শিখরে। একদিন নিভৃতে প্রাণের সব উজাড় করে বললে। দেখালে জরির নক্সি চুলের কার্নিশে, বহু ক্ষত চিহ্নের দাগ। ব্যথা শ্রদ্ধা সমমর্মীতায় ভবে গেল বুক। বলে এলাম, তোকে একখানা বই উৎসর্গ করব। কিন্তু আমিও বিধ্বস্ত—আজো তা হয়ে ওঠেনি। অনুশোচনা যদি শুদ্ধি হয়, তবে বোধ হয় আমি ক্ষমার্হ। কিন্তু আবেগের ব্যাকুলতায়, এমন প্রতিশ্রুতি তো আরো দিয়েছি!

স্মরণ হয় 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষের কথা। পূর্বেই বলেছি ইনি অনেক মূক বন্ধুর সাহিত্যে মুখর করেছেন ভাষা। মুগ্ধ হয়ে সান্নিধ্য অনুভব করেছি। আবেগে যা বলেছি, আজো তা পালন করে উঠতে পারিনি। আরো মনে পড়ে আনন্দবাজারের মন্মথ সান্ন্যালের কথা। মিষ্টিভাষী পরহিতার্থী, কথা দিয়ে আজো তা পালন করতে পারিনি। হয়ত এ জীবনেই সম্ভব হবে না। তাই এ জবাবদিহি। তবু জিজ্ঞাসা করি হে ভগবান, যদি ক্ষমতাই না দিলে, তবে কেন দিলে এ আবেগের উচ্ছ্বাস? বারবার আমায় হীন করে কী তোমার লাভ? এই জন্যই কী তোমার ওপর বন্ধু আমার এত অবিশ্বাস? তাই কী একেবারে আমি নাস্তিক হয়েছি? ছেদেও তো সুখ নেই। অনন্তকাল কী নিয়ে মানুষ চলবে পথ যদি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানতপস্বী চিকিৎসক নিত্য মুমূর্ষুর কানে শোনাতে পারেন স্তোক বাক্য—তুমি বাঁচবে, বাঁচবে, যদি দেশ-প্রেমিক সৈনিক তুচ্ছ রুক্ষ মাটিকে ভাবতে পারে মা, তবে আমার

তোমাকে মিথ্যা করে ভাবতে দোষ কী? ভুল যদি বেঁচে থাকার মূল হয়, সে ভুল তো না ভাঙাই ভালো। জড়ে তুমি আবার জীবন ফুটাও, অর্থনীতিতে তোমার জ্যোতি দাও, ক্ষমতাকে করো অপরিমেয়। তোমার নতুন ব্যাখ্যা চাই এযুগে। আদর্শের ছেদেও তো শান্তি নেই। দেখলাম সকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন। কাঁদলাম অনেক। 'যদি বাসনাই দিলে, তা পূরণের ক্ষমতা দাও!

২০।৬।৫৮ সকাল ৬টা.

'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' বই হয়ে বেরুতে অনেক দেরি। চুক্তি হলেও প্রেসের গহ্বর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয় —আছে প্রচ্ছদ, বাঁধাই।

২১।৬।৫৮ সকাল ৬-৯টা.

রবীন বললে, একটা চাকরি করবেন? মাড়োয়ারী ফার্ম, ল্যাণ্ড কাস্টমের এজেন্ট—একজন সরকার চায়। কিন্তু মাইনে তেমন নয়, তথাপি—

আমি জবাব দিলাম, তথাপি—ভেবে দেখি! আচ্ছা করব, ঠিকানা দাও।—খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে এলাম। আবার পেশা বদল। চুর মাতালের নেশা ত্যাগের মত কঠিন। তবু দু'তিন দিন বাদে সাগরময় ঘোষ ও মন্মথ সান্যালের প্রশংসা-পত্র নিয়ে বড়বাজার হাজির হলাম। ছিল বোধহয় নারায়ণ ও তারা-শঙ্করেরও সার্টিফিকেট। গদির মালিক বাঁ হাত দিয়ে এগুলো তুললেন, সরিয়ে রাখলেন বাঁ হাত দিয়েই। বোধ হয় এগুলো তাঁর কাছে ডিস-কোয়ালিফিকেশন।

চাকরি হবে কিনা জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে পাঁচটা পর্যন্ত। এখন দুটো। বিকাল নাগাত মাড়োয়ারি দেবেন ভারডিক্ট। তারাশঙ্কর নারায়ণও এখানে কিছু নন, তখন আসবেন একজন ল্যাণ্ডকাস্টমের মহাশয় ব্যক্তি—যাঁর পুণ্য নামে এঁরা গলদাশ্রু। তিনি সুপারিশ করলে আর কথা নেই।

দেখলাম তেতলায় বসে, বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে একটা জীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ির আঙিনায় 'বে-আইনি জনতা' প্রবেশ করছে। অন্ধ-খঞ্জ-জুতোপালিশ-ভিখারী-বেকার। আছে সুন্দরী যাযাবর, রয়েছে বলিষ্ঠ জোয়ান। শিল্পী আছে, গায়ক আছে, আছে রঙিন কিন্তু ছেঁড়া ঘাগরা-পরা মধুয়ালী। এঁরা সব জড়িয়ে সমাজের একটা শক্তির উৎস। মাথা গোঁজার ঠাঁই চায়। কিন্তু এত হর্মমালার মধ্যেও এঁদের তৈজসপত্রটুকু রাখার স্থান নেই। তুমুল ঝগড়া হল, কার যেন হারিয়ে গেছে বাঁশের বাঁশীটা। দেখলাম খঞ্জের দৃষ্টি এবং অন্ধের শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সাময়িক একটা সংসার সাজালে দুজনে। এরা নারী-পুরুষ। এদের প্রাণ-কামনার সঙ্গে গর্ভ সঞ্চার হয় বে-আইনি স্থানে—আবার ভূমিষ্ঠও হয় মানব শিশু পিতৃপরিচয়হীন। যখন আমরা বলি জারজ, তখন বে-আইনি মাতা বুকে তুলে হয়ত দুধ দেয়, ঘনঘন খায় চুমো। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশালাম। তন্ন তন্ন করে আরো অনেক আস্তানা দেখলাম। একখানা উপন্যাসের কাঠামো খাড়া হল। দেখলাম রঙে বর্ণে ঝিলমিল উপনায়ক মোরগ শের সাহেবকে। আমিরনের শের সাহেব। এলো মীর্জা নন্দী কুলসম দৃষ্টিপথে। জনতা নায়ক, জনতাই নায়িকা। আমি 'কসাই' নাম দিয়ে একটা ছোট গল্প লিখে নিজেকে প্রস্তুতির পথে নিয়ে এলাম। কিন্তু যাচাই করব কী দিয়ে? কষ্টিপাথর চাই নতুন, রমেশদার থেকেও আস্থাভাজন। গল্পের নায়ক কুট্টি শুধু মুসলমান নয়, একেবারে চাবুক-খাওয়া নিচু তলার মানুষ। মাংসে বীতস্পৃহ, কিন্তু ভাগ্যদোষে কসাই। দিয়েছিল একখানা মাংসের দোকান অনেক ঘাম ঝরিয়ে, তাও টিকল না, এলো সাম্প্রদায়িক হল্লা। এই বিষয় বস্তু। অবশ্য শেষে আছে একটা বক্তব্যের মোচড়। কাকে শোনাই?

কষ্টিপাথরের মতই কালো মোহিতলাল। রমেশদার সঙ্গেই জল-বাদল ঠেঙিয়ে বড়িশা যাই। বসে থাকি বেলা দুটো থেকে

রাত নটা পর্যন্ত। কোনো পাত্তা পাইনে। মোহিতলাল কেবল নিজের লেখা পড়েন, পড়েন, পড়েন।...আর মাঝে মাঝে থেমে ঢাকা প্রবাসের কথা তুলে কটাক্ষ করেন বাঙালদের। গুরু-পুরোহিত শাসিত গ্রাম ছেড়ে এসে এই প্রথম দেখলাম কাকে বলে হিরো ওয়ারসিপ্! কিছু ভক্ত জোটেন প্রত্যহ—ঘটি বাঙাল, তাঁরা নির্বিবাদে শুধু চিলুচিলু হাসেন।

দিনের পর দিন আসি যাই কোনো জুত করতে পারিনে। এখন মনে মনে ভাবি, এঁর পরামর্শ নিয়েই কী ইস্ট এবং ওয়েস্ট জার্মানী, ফর্মোসা এবং চীন, ইস্রাইল মিশর? দেখলাম বাঙলা সাহিত্যে চরম বিভেদ—রাঢ় এবং পূর্ববঙ্গ। সহসা আমার মনে হয়, জীবনে মরণে মোহিতলাল নানা দেশে নানারূপে ছড়িয়ে আছেন। আফ্রিকার মরুভূমি থেকে এশিয়ার হিমালয় পর্যন্ত।

একদিন রাত সাড়ে নটা। শতরঞ্চি গুটাবার পালা। একটু জোর দিয়ে বললাম, রোজ আপনার লেখা শুনি, আমাদের লেখা শুনবেন না?

এলো একপ্রকার প্রতিবাদ। একটু থতমত খেয়ে গেলেন মোহিত-লাল। অপরিসীম ব্যক্তিত্বে যেন লাগল লাঞ্ছনার আঘাত। তিনি ছাড়া এখানে যে আর কেউ মাথা তুলে কোনো অধিকার দাবি করতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল না। বললেন, লেখা এনেছেন, বেশ তাড়াতাড়ি পড়ুন।

তাড়াতাড়ি কেন, ধীরে ধীরে পড়ব।

হেসে বললেন, জল আসছে।

ভিজে ভিজেই যাবো।

'কসাই' গল্পটা পড়লাম, মোহিতলাল শুনলেন স্থির গম্ভীর হয়ে। বললেন, এমন গল্প কী কেউ লেখে? ছিঃ ছিঃ। ধন্য হয়ে ফিরে এলাম। ঠিক করে নিলাম, মোহিতলালের তিরস্কার প্রগতিশীল চিন্তাধারার পুরস্কার। পাণ্ডিত্যের কংস কারাগারে এ যুগের ভগবান

বন্দী ছিল। রণজিৎকুমার সেন সেই গল্পটি বঙ্গশ্রীতে ছেপে আমাকে আরো উৎসাহিত করলেন। বুঝলাম শ্রীসেনের দৃষ্টি সেকালকে ছাড়িয়ে একালের দুঃখজর্জর পৃথিবীতে নেমে এসেছে। ক্রমে নিবিড় হলাম। সাহিত্যে ফলপ্রসূ বহু শাখার সন্ধান পেলাম তাঁর রচনায়। কবিতা গান প্রবন্ধ গল্পে গুচ্ছ গুচ্ছ আনম্র রসাল। আমি সংকল্প নিলাম সুদৃঢ়। 'বে-আইনি জনতা' লেখা শেষ করলাম দুই কি তিন মাসে। এমন কত গল্প যে আমাকে উপন্যাসের উপকরণ জুগিয়েছে। হালে 'বাণী দিন, বাণী দিন' গল্পটা লিখেই 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'-তে হাত দিয়েছিলাম। গত পূজায় (১৯৫৬) 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু' ছিল ছোট গল্প। এবার উপন্যাস। ব্যঙ্গ রচনার প্রেরণা কিন্তু এখানে নয়, আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে। খাদ্য বিভাগের চাল[illegible]গোডাউন নয় যে ভ্যাপসা গুমটে তোমার শ্বাসরোধ হয়ে আসবে। কলেজের বন্ধু রবীন মিত্র এসে বসল দক্ষিণ-খোলা বক্তিয়ার শা রোডের বারান্দায় এক পাশটিতে। সিনেমার পোকা—যা বলবে, তা ফেড আউট, ফেড ইন করে। মাত্র এক কাপ চা পেলেই নেশা জমল। তুললে চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটে'র কথা, অভিনয়ের ভঙ্গিতে জীবন্ত করলে 'দি গ্রেট ডিক্টর'-কে এই বারান্দায়।—হ্যাঁ, সিরিও কমিক বলতে এ সব বই-ই বুঝি। তারপর শোন্—

কিন্তু মোহিতলালের পরই একজন জ্ঞানতপস্বীর কথা এসে পড়ে—যিনি বিশুদ্ধ চিত্ত, চিন্তায় ভাবনায় পাণ্ডিত্যে মহীয়ান্। আয়রন সাইড রোডে তখন অন্নদাশঙ্করের বাস।

২২।৬।৫৮ সকাল ৬-৯টা.

তখন সবে মাত্র 'চরকাশেম' এবং 'পদ্মদীঘির বেদেনী' বেরিয়েছে। দু' কপি বই হাতে নিয়ে গেলাম। বৃটিশ আমলের আই. সি, এস-এর বাড়ি—বেশ একটু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো—যেন হাইডোজে কোনো ঘুমের ওষুধ খেয়েছি।

আরো শুনেছি এঁর স্ত্রী নাকি একজন অ্যামেরিকান লেডি।

গিয়ে দেখলাম গোপালদাস মজুমদার ভব্যসভ্য হয়ে বসে। আগে চেনা হয়নি, অন্নদাশঙ্কর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখনো বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম গোপালদার কেন এত আদর। আমরা এতগুলো বই লিখে যা পাইনি, তিনি তার অনেক বেশী পেয়েছেন। এযুগের কটা লেখক বলতে পারবেন, গোপালদাকে বাদ দিয়ে জীবন লেখা সম্ভব? তাই গোপালদাস মজুমদার কিছু না-লিখে অমর। মনোজ বসু, গজেন্দ্র মিত্র নিজেদের [illegible] নিজেরাই মেরেছেন কুড়োল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বয়স [illegible] তাঁ[illegible] দেখে-শুনেই উচিত ছিল ফেরা। এত পরিশ্রম ক[illegible] [illegible]ণী বেশী মুনাফা হল?

২৩।৬।৫৮ সকাল ৭-১০টা

অন্নদাশঙ্কর ধীর ভাষী, সংযত বাক। তবু কথা হল অনেক। লেখায় যে অপরিমেয় বুদ্ধির ছটা, কথায় কিন্তু সে আগুন চাপা—অনেকটা তুষের আগুনের মত। স্ত্রী লীলা রায়ের উচ্ছ্বাস বেশী। পরদেশী মহিলা ভিন্‌দেশে এসে যেন তার মাটির রস টেনে নিয়ে এদেশেরই ফুল হয়েছেন। ছিলেন বিশুদ্ধ শ্বেত ডালিয়া, হলেন থোক-বাঁধা সুগন্ধি জুঁই। আমি সেদিনই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, কিন্তু তাঁর অনেকগুলো বাঙলা বইয়ের ওপর সমালোচনা পড়ে বলছি। দেখেছি মমতাময়ীর প্রসন্ন অন্তর দৃষ্টি। ভিন্‌দেশের মেয়ে চিন্তায় কৃষ্টিতে এদেশের বধূ হওয়া সামান্য কথা নয়!

অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেহে মনে গান্ধীবাদের গেরুয়া রঙটি লেগেছে। আমার মনে হয় অহিংসাকে ইনি জপমালা করেছেন। তাই একজন সেকালের আই. সি. এস.—যাঁর হওয়া উচিত ছিল খরবুদ্ধি ডিপ্লোমেট, হলেন কিনা সন্ন্যাসী! সাহিত্য তাঁকে দিয়েছে আদর্শবাদ—নইলে এ পদমর্যাদা তুচ্ছ করা অসম্ভব ছিল।

২৪।৬।৫৮—সকাল ৬-১০টা

তাই ভাবি মোহিতলাল এবং অন্নদাশঙ্করে কত পার্থক্য।

রমেশদা প্রশ্ন তোলেন, সুক্ষ্ম মাপে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট কি সাম্প্রদায়িক নন? তাঁরা কি সত্যি সত্যি পরের মত সইতে পারেন?

আমি বলি রাজনীতি এবং সাহিত্যনীতি এক নয়। প্রথমটা পরিবর্তনশীল, দ্বিতীয়টা শাশ্বত চিরন্তন।

রবীন মিত্র বললে, চার্লি চ্যাপলিনের নিজের ডিরেক্শন্, নিজেরই অভিনয় মেইন রোলে। দি গ্রেট ডিক্টর যখন বক্তৃতা দিলে হুবহু যেন হিটলার। তার মুদ্রাদোষগুলো পর্যন্ত নিখুঁত তুলেছে চার্লি। এসব সিরিও কমিকের কল্পনা আমাদের দেশের পর্দায় এখনো একশো বছর দেরি।

পর্দায় দেরি থাক, আমি নাটকের আকারে লিখতে দুঃসাহস করলাম। ঠিক পনর দিনে লিখে ফেললাম 'এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ'। বেকার জীবনের ব্যর্থতা। যাদের পড়ে শোনালাম, তারা তারিফ করলে। কিন্তু মঞ্চস্থ করার সুযোগ পেলাম না। কারণ স্ত্রী ভূমিকায় অনেকগুলো চরিত্র। তা ছাড়া যে সব যোগা-যোগে হাতে-লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয়, সে সুযোগ আমি আজও পাইনি। কাবলিওয়ালার কান টেনে লম্বা করার মত অদৃষ্ট কোথায়?

অপেক্ষা করে রয়েছি। একদিন বান্ধবী শৈলজা চৌধুরীর কণ্ঠে একটি গান শুনলাম—ভাবলাম 'রোদনা ভরা এ বসন্ত'ই বটে, নাটক রূপান্তরিত হল উপন্যাসে। প্রকাশের দুঃসহ ব্যথা থেকে খানিকটা রেহাই পেলাম। তারপর আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করতে বোধহয় সাহায্য করলেন বানার্ড শ। বুদ্ধিদীপ্ত রচনার এমন উদাহরণ আমার আর নজরে পড়েনি। কৈশোরে মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ বয়সে তা আরো গভীর হল

কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে হন্যে হয়ে ঘুরে। একদিন রামপরায়ণের আসরে বসে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, নছোল্লা। খানিকটা ককেট্রির সামিল অর্থবোধক—পূর্ববাঙলার ভাষা। 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'-র নায়িকা অশ্রু অমনি এলো আমার কল্পলোকে নছোল্লার ভঙ্গি নিয়ে। শুনেছিলাম দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল এবং 'অন্য নগর' উপন্যাসের লেখক সুধীরঞ্জনের মুখে একটি কাহিনীই কয়েকবার। তখন হাসলেও শিল্পী-জীবনের লাঞ্ছনা আমাকে আহত করেছিল। কম বেশী আমরাও তো এ কাহিনীর নায়ক।

হাসলেও জ্বলুনি থাকবে ভিতরে। এ কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমার আগেই অন্য কাউর লেখা উচিত ছিল উপন্যাস। কিন্তু ধারে কাছেও নজির দেখছি নে। আমি আর না হেসে দীপ্তেন সান্ন্যালকে বললাম—আর একখানা বইর মালমসল্লা পেলাম। দিলেন আপনারা।

উনিশশো ছাপান্ন এবং সাতান্নর শীতের রাত্রিগুলো যখন হেঁটে কাটাই, তখন দেখি জগৎ কুহেলী ক্লান্ত—কাঁদছে ইনডাস্ট্রিয়াল সিভিলিজেশন। তার ভিতর থেকে বেছে নিলাম লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মুখ। ছুটে ঘরে আসি দু' চার লাইন অথবা একটা অনুচ্ছেদ লিখি, আবার শ্বাস কষ্টে পালিয়ে যাই। এমনি করেই বক্তব্যের পাথরটা ধীরে ধীরে বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে ফেললাম। যদি কখনো শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ো দেখতে পাবে কত অশ্রু কলেজ স্ট্রীটে।

হ্যাঁ, অনেক আগে হয়ত বলেছি কমলাকান্তের দপ্তর একদা আমার কিশোর মনকে কলঙ্কিত করেছিল। অবচেতন মনের ওপর তারও প্রভাব নিশ্চয় ছিল স্বচ্ছ ঝিল্লিজালের মত। বঙ্কিম-চন্দ্রকে বাদ দিয়ে সিরিও কমিক রচনার কথা কল্পনা করা অসম্ভব। আর এক শিল্পীর কাছেও আমার ঋণ অপরিমেয়। তিনি আইনানুগ প্রশ্ন তুলে একদিন কোড়া চালিয়েছিলেন আমার

অর্ধাহারী সত্তার ওপর। কিন্তু আঘাতে এলো সংকল্প—ব্যথায় সংঘাতে সৃষ্টির প্রেরণা।

এর আগে আর একটু গল্প আছে। ক'বছর হল এই শ্রদ্ধেয় শিল্পীর আশীর্বাদ কুড়াতে গিয়েছিলাম দু'খানা বই নিয়ে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, কত উদ্দীপনা! শ্রদ্ধেয় শিল্পী নানা কারণ দেখিয়ে বললেন, আমি তো বই পড়তে পারব না।···ফিরিয়ে নিয়ে এলাম উপন্যাস দু'খানি। কত যে হীন লাগল নিজেকে!

আবার বছর তিনেক বাদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবার উপন্যাসের সুপারিশ নয়—উপবাসের। তখন অনেকগুলো বই আমার বাজারে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু চাকরিটি নেই খাদ্য দপ্তরের। ছাড়তে হয়েছে স্বাস্থ্যের অজুহাতে। ভারত সরকারের কাছে আমি সাহায্যপ্রার্থী। একটু রেকমেণ্ডেশন্ চাই।

শ্রদ্ধেয় বললেন, আপনাকে তো আমি চিনিনে।

এই দেখুন কালিদাস রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখে দিয়েছেন।

তাতে হয়েছে কি? আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।

বুঝলাম এঁকে চেনাতে গেলে কোর্টের এফিডেফিট্ চাই। ক্ষোভে দুঃখে রাস্তায় নেমে এলাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবলাম সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক হিসাবে ওঁর খ্যাতি যতদূরই হোক না কেন, আমার ভার অনেক বেশী। কারণ আমার উপন্যাস অনেকগুলো। কিন্তু ওঁর বাড়ি এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের যে ধার তা আমাতে নেই। কোনো দিন হবেও না।

কোড়ায় ক্ষোভে রক্ত ঝরতে লাগল। মর্মান্তিক বেদনায় বোধহয় জন্মাল 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু'।

আজ আর আমার মনে কোনো গ্লানি নেই, পায়ের ধুলো নিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, হে গুণী তুমি আঘাত দিয়ে আমায় তোমার

চেয়েও ফলবান-গুণবান করেছ। আজ পর্যন্ত তো তুমি একখানাও এ ধরনের উপন্যাস লিখতে পারোনি!

আর একটি সাহিত্যাগ্রজের নাম এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। যত তাঁর লেখা পড়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর গল্প শুনেছি ছাত্রমহল থেকে। ইনি হচ্ছেন প্রমথ বিশী। এঁর এবং পরিমল গোস্বামীর কিছু প্রভাবও হয়ত আমাকে উজ্জ্বল করেছে। সমকালের প্রতিষ্ঠা এড়ান বড় দায়, বিশেষ করে তাঁরা যদি হন সাহিত্য চরিত্রে মহীয়ান্। শ্রীগোস্বামীর হিউমারের এখানে একটি নমুনা না দিয়েই পারলাম না। শারদীয়া যুগান্তরের লেখা সংগ্রহের মরশুমে হয়ত তিনি বলবেন, যা দেবেন, গল্প না হক, ছোট হওয়া চাই। ঘণ্টা খানেক কাছে বসলে এমনি এক ঝুড়ি হাসির সঙ্গে হুল নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরতে পারবে। তখন মনে হবে তোমার বাড়িটা দক্ষিণে না হয়ে উত্তর কলকাতায় যদি হত। আরো তো বসা যেত ঘণ্টা খানেক।

শিবরাম চক্রবর্তীকেও মনে পড়েছে এই অনুচ্ছেদ লিখতে গিয়ে। কৈশোরে তাঁর দেশের মাটি জল টিলা পাথর ছুঁয়ে এসেছি মহা-বিস্ময়ে, এখন প্রশ্ন জাগছে তাঁরও কিছু রঙ লেগেছে আমাতে? রবীন মৈত্রের তুলির টানও অস্বীকার করে লাভ নেই। আর একটি মহৎ শিল্পী সত্তা তুমি আবিষ্কার করতে পারবে, যদি সকাল সাড়ে সাতটা কি আটটা নাগাত গিয়ে চারু এ্যাভিনিউতে উপস্থিত হও। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আপ্যায়ণ করবেন তোমাকে। স্বল্পভাষী নিরালা গুণীজন তোমাকে বিস্মিত করবেন। এঁর সান্নিধ্যে এলেই আমার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে—সকল অহংকার, হে আমার ডুবাও চোখের জলে। কিন্তু সে অহংকার আজো তো ত্যাগ করতে পারিনি। আরো আরো চোখের জল চাই? কবে আসবে সে প্লাবন?

আবার রামায়ণে ফিরে যাই। বনবাস পর্ব শেষ, কিন্তু সেতু-

বন্ধে রাম নেই। এ রামায়ণ বিংশ শতাব্দীর, তাই অনুপস্থিত রামমোহন ঘোষ। আমি 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেখানে যা পেয়েছি তা কুড়িয়ে খেয়েছি। সাগর বাঁধার আর মালমসল্লা নেই।

২৫।৬।৫৮ বেলা ২-৫টা।

দুঃখের সাগরই বটে; শুধু নোনা স্বাদ। মাড়োয়ারী ফার্মে কিছুদিন কাজ করেছি। কিন্তু সে চাকরিও গেল ক'মাস বাদে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল—মাড়োয়ারী ফার্ম, ভেবেছিলেম এবার কিছু পয়সা লোটা যাবে কাস্টমের মারফত পাকিস্তানে মাল পাঠিয়ে। ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের অভাবে, অন্য ফার্মের মত এঁরা ল্যাণ্ড কাস্টমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তেল দিতে পারলেন না। তাই বেকার হলাম আবার। তবে কিছু যাদুমন্ত্র শিখে গেলাম—সিন্ধি, মারাঠী, গুজরাটী, বিহারী নানা সম্প্রদায়ের বেনের সঙ্গে মিশে। দেখলাম, ডালহৌসী পাড়া বড়বাজারকে চৌহদ্দিতে রেখে যে ইমারতগুলো খাড়া হয়েছে, যেখানে কেবল তাড়ায় তাড়ায় চেক নোট হুণ্ডি ফাটকাবাজির লেনদেন—সভ্যতার হৃদপিণ্ড, সেখানে প্রাণ নেই। এ এক চমকপ্রদ ভূখণ্ড। চিনলাম বণিক সভ্যতাকে ভাল করে। খেলাম অনেক চাঁদির জুতোর ঠোক্কর। আগে বলছি এখানে প্রাণ নেই, কিন্তু নীচুতলায় আছে মমতার ধুকপুকানি। কুলি কামিন শ্রমিকের কাছে আমি অনেক সহানুভূতি পেয়েছি। নইলে কাস্টম হাউসে বসে, কিংবা চিৎপুর রেল ইয়ার্ডে গিয়ে বিড়ি টোব্যাকুর বস্তার ভিতর শুয়ে কিছুতেই প্রুফ দেখতে পারতাম না 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী'-র। চেকিংয়ের যা কিছু ঝামেলা কানাইয়া পুইয়েছে। জগন্নাথঘাটের ঝামেলা আর একজন বিহারী যুবক।

চাকরি নেই, দালালি ধরলাম। এজেন্ট পি. সি. চক্রবর্তীর মারফত চালান পাস করতাম। লক্ষ লক্ষ টাকার চালান। উদ্দেশ্য

সেতু বন্ধন—সমুদ্র ডিঙান। দুঃখের সাগর পেরিয়ে সীতা উদ্ধারের সংকল্প।

ঠিক সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠি। এ্যালার্ম লাগে না—তখন ছিল না এ কাল ইনসোমনিয়া কিংবা হাঁপানি, পাঁচটায় লিখতে বসি। 'জোটের মহল' লিখছি তখন। দেখাতে চেষ্টা করছি, মানুষ বিপন্ন হলেই একতাবদ্ধ হয়ে চলে, সংগ্রাম করে হাতে হাত মিলিয়ে। এর জন্য কোনো পার্টির প্রেরণা অনিবার্য নয়। কোনো দিন একপাতা, কোনো দিন তিন পাতা, কোনো দিন এক লাইন। সকাল সাড়ে সাতটায় কোনো রকমে চারটি মুখে দিয়ে দৌড় দৌড়। সাড়ে আটটায় বড়বাজার হাজিরা পৌছান চাই। তারপর সারাদিন কাস্টম হাউস, চিৎপুর শিয়ালদা রেল ইয়ার্ড অথবা জগন্নাথঘাট, সন্ধ্যার পর কত পাঁচতলার যে সিঁড়ি ভেঙে রাই কুড়িয়ে বেল। তবু ডাঙা ফেরে না। কেবল নোনা স্বাদ। কিন্তু মনে রয়েছে সমুদ্র বাঁধার স্বপ্ন।

একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। পি. সি. চক্রবর্তী সকলের কাছে কমিশনের হিসাবে কড়া—শুধু আমার কাছে নন। অথচ তিনি তেমন জাঁদরেল এজেন্ট নন্ ল্যাণ্ড কাস্টমে। প্রদ্যোত চক্রবর্তী ছিল আমার মতই একজন হতভাগা দালাল। কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি ছিল অপরিসীম! কাস্টমের চালান লিখতে লিখতে কী যে গল্প লেখার বাই! সে নিত্য লাগাত কানকথা। তাই হয়ত পি. সি. চক্রবর্তী কখনো আমার সঙ্গে কড়া-ক্রান্তির হিসাব করেননি। এসব বন্ধুদের ফেলে যে কতদূর চলে এলাম!

২৬।৬।৫৮ সকাল ৭-৯টা

গত রাতটায় হঠাৎ আবার স্ট্রোক এসেছে হাঁপানি ও অনিদ্রার। বর্ষাকাল, আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ। জল নেই, দারুণ গুমোট। শ্বাস টানতে পারছিনে। উন্মুক্ত আকাশের তলে উঠানে শুয়ে শুয়ে সাধনা করছি, এসো এসো মরফিয়া মেশান ঘুম। যত রাত গড়িয়ে

যাচ্ছে তত টানা-হেঁচড়া বাড়ছে জীবন-মৃত্যুর। এখন ভাবি শুধু মরফিয়ায় কাজ না হলে একটু পটাসিয়াম স্যায়ানেট মেশাতেই বা আপত্তি কী! মরব? না—না আমার আপাতত মৃত্যু নেই। যদি মরলাম, তবে কে পাবে এ যন্ত্রণা, মৃত্যুর অধিক? জবানবন্দির শেষ চ্যাপ্‌টার, সীতা উদ্ধারের মুখোমুখি—এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিংয়ের আর কয়েক ফিট! ঘুম নইলে সব মাটি। এসো, এসো মৃত্যুর মত মধুর ঘুম।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। কয়েকদিন আগে একশো এগার ডিগ্রিতে পুড়েছে কলকাতা—এ বৃষ্টি তো পুষ্প-বৃষ্টি। আমি বিছানা-পত্র গুছিয়ে তুললাম। ঘর বারান্দায় জায়গা নেই তিলধারণের। পাঞ্জাব থেকে আসাম ঘুরে গীতা এবং গোপাল এসেছে আমায় দেখতে, এক ঘরে যেন বিয়ের যাত্রী। কোথায় রাখি মশারি, বালিশ, ওষুধ, জলের ঘটি-গ্লাস? তবু বস্তাবন্দী করি যেন। ঠেসে রাখি ঠাস বুনটের ওপর।

ছাতি লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ঝিরঝিরে পুষ্প বৃষ্টি। একটু ঘুরিয়ে দেখি দৃশ্যটা। সাহিত্যিকের চোখে আরোপ করে দেখি। একী অভিনন্দন?

হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি—স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, দিনের আলোর মত প্রত্যক্ষ। আমার কাছে ঘুমের মত মধুর—একটু আগে বিষ মিশান যে ঘুম চেয়েছি।

হয়ত আমার আপাতত মৃত্যু নেই। কিন্তু তা বলে আমি চিরজীবীও নই। তোমাদের মতই দোষে-গুণে রক্ত-মাংসে মানুষ।

আমি শুধু ফেইলিওর নই, অনেক সাক্‌সেস্‌। আমি যতটা প্রতিভা, তার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা, আমি শুধু ক্ষোভ নই, আমাতে রয়েছে সাগর প্রশান্তি। আমি যতটা এরর (ভুল) তার তুলনায় অনেক বেশী কমেডি। কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে বেঁচে হাঁপাই। তাই তো রিলিফ চাই বন্ধুরা। শীতে সুরু করেছি জবানবন্দি,

কান্নায় ভূমিষ্ঠ। বসন্ত গত হয়েছে পথে বিপথে। শেষ হয়ে এলো বর্ষায়। নেমেছে অঝোরে বাদল, আর পুষ্প-বৃষ্টি নেই। ছাতিটায় মানছে না, সেলটার দাও। হাঁপিয়ে হাঁটতে একটা লম্বা করিডোর দাও। আশ্রয় চাই, চাই আরো রিলিফ! রক্তাক্ত যীশুকে কখনো দেখনি, আমি তাঁর বর্তমান শতকের সাহিত্য-প্রতিনিধি।

॥ ত্রিশ ॥

ক্ষণিক হলেও আমার জীবনে পুষ্প-বৃষ্টি সত্য। সেতুবন্ধন সমাপ্ত হয়েছে রামমোহনের—হেঁটে পারাপার হলাম দুঃখের দুস্তর সমুদ্র।

'চরকাশেম' এবং 'পদ্মদীঘির বেদেনী" প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ছ'মাস হল। একটা লাল সালুতে মীরা কেমিকেলস্‌য়ের গেটে লেখা—"অমরেন্দ্র ঘোষ সংবর্ধনা"। টালিগঞ্জের একটা প্রাচীন বাড়ি। দোতলায় বাদশাহী হলঘর। একদা ছিল নাচের আসর। এখন হবে সংবর্ধনা সভা। তাই ফুল চন্দন অগুরুর গন্ধে বাতাস মাতাল।

কিন্তু গত শেষ রাত্রির মত অঝোরে নেমেছে জল—সপ্তাহ কেটে গেছে তবু বিরাম নেই। কে আসবে ঝড় বাদলে শুধু কৌতূহলে ভর করে টালিগঞ্জ? ট্রাম বাস ব্রিজের নীচ দিয়ে প্রায় সাঁতার কেটে চলে। যেদিকে তাকাও সমুদ্র। তবু রামায়ণ সমাপ্ত করতে হবে। রামের আহার নিদ্রা নেই। অভিনন্দন-পত্র লিখেছেন রমেশদা —লিখিয়েছেন রামমোহন। এ যেন নান্দীপাঠ! আর একজন ছিলেন এবং আজো আছেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবব্রত রায় চৌধুরী—সহৃদয় গুণগ্রাহী। মালা-চন্দন এনেছে কবি-বন্ধু নির্মল সিংহ। রামের সঙ্গে কত যে তার চড়াই ওৎড়াই ভাঙতে হয়েছে! এদের সঙ্গে রয়েছে আরো একটি পরম উৎসাহী যুবক, অমল ভট্টাচার্য। নানা জাতের ফুলের গ্রন্থি, অনেক রঙের রঙ, আজ কি

আমি সব স্মৃতিতে রাখতে পেরেছি! তবু তার সুগন্ধটুকু ভুলিনি। তাই কাগজে কলমে দাগ রেখে যেতে চেষ্টা করছি।

আগেই খানিকটা পরিচয় দিয়েছি দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি তো টালিগঞ্জের হৃদপিণ্ড। তাঁকে ছাড়া এখানে মহৎ কিছু হওয়ার জো নেই। একদা ছিলেন কবি, এখন পিতার পায়-চলা পথে জনহিতব্রতী, কর্মী। তাই বহু আদর্শের মূলধন নিয়ে এঁর আজ এগিয়ে চলার প্রয়াস। সকাল সন্ধ্যা দেখছি। মুখে একটি মিষ্টি হাসি, কাছে এলে কুশল প্রশ্ন। শত্রুমিত্র প্রার্থীকে কখনো ফিরিয়ে দেয়া এঁর নীতি নয়। অনেক অগ্নি পরীক্ষায় এখনো ইনি টিঁকে আছেন। জীবন দর্শনে কিছু মতান্তর থাকলেও এঁকে আমরা হৃদয় দিয়ে সবাই ভালবেসে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস যেখানে এঁর রাজনৈতিক সত্তা হার মেনেছে, সেইখানেই জয়ী হয়েছে কবি সত্তা। এক এক সময় নির্লিপ্ত হয়ে ভাবি, মানুষের যে কত রূপ দেখলাম!

তখনো আলাপ জমেনি ভাল করে, নইলে নিশ্চয় দেখা যেত উপস্থিত রয়েছেন আর একটি সমাজ-কল্যাণী—তারাপদ চক্রবর্তী, টালিগঞ্জ 'পৌরসেবক'-এ প্রতিষ্ঠাতা। ইনি আমার চোখে প্রথম উজ্জ্বল হন এক জনসভায়। বাংলার সীমানা নিয়ে হালফিলের লড়াই। ইনি দৃপ্তভঙ্গিতে সত্যিকার বাংলার জনমতের সপক্ষে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন—যুক্তি-তর্ক-তথ্যে দুর্বার। বললেন, মার্জার অসম্ভব। আমি মনে মনে এঁকে একটি মনের মালা দিলাম—যে শতনরীর একটি হার একদা দিয়েছিলাম নির্মল সিংহকে। তারপর বহুভাবে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শ্রীচক্রবর্তীকে দেখেছি, দেখেছি রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্যে এবং বাণিজ্যে। দেখে দেখে চোখের রূপ এখন বুকে এসে মূর্তি নিয়েছে। এ আর এক বিস্ময়!

নির্মলের কথা বললে আর একটু বলতে হয়। নির্মল সিংহ শুধু ভাল কবিতাই লেখে না, এর অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে ইংরেজীতে তর্জমায়। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে

দেয়ার এর ছিল বলিষ্ঠ কলম। কিন্তু স্বপ্ন কি সব সময় সফল হয়? প্রতিভা কি সর্বদা হাতে হাত মিলিয়ে চলে মিথ্যার সঙ্গে!

হয়ত বিনয় ঘোষকেও দেখতে পেতাম মীরা কেমিকেলস-য়ের হলঘরে। আজ তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারের অধিকারী, কিন্তু তখনো এ অসাধ্য-সাধন মানুষটির সঙ্গে পরিচয়ই হয়নি। বিনয় ঘোষ হচ্ছেন বাঙলা সাহিত্যে এক মূর্তিমন্ত অধ্যবসায়।

চেনা হলে আর একজনকে দেখা যেত—শিল্পী এবং শিল্পীপ্রিয় শৈলেশ রায়কে। অর্কিডে, ফুলে, ছবিতে এর বৈঠকখানাটি সর্বদা সাজান। রয়েছে থাকে থাকে আর্ট জার্নালা এবং সাহিত্য। অনবদ্য এক স্বপ্নালু পরিবেশ। তুমি গুটি দুই সিঙ্গারা ও এক কাপ চা পেলেই মন বিকিয়ে দেবে। অদ্ভুত খেয়ালী এই যুবক। চালু করবে এক টেপ্ রেকর্ডিং মেসিন। তোমার কণ্ঠগান গল্প আবৃত্তি ধরে তোমাকেই শুনিয়ে দেবে তখন তখন। তারপর আর একদিন এসে দেখবে, তুমি আর তার রেকর্ডের ফিতায় নেই। এসেছে নতুন গান, নতুন গলা। এই মুছে ফেলে এগিয়ে চলাই এঁর ছন্দ। একদা আমি বিস্ময় উদ্ঘাটনের অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলাম। তারপর নিষ্ঠুর আঘাত। এখন প্রীতিমুগ্ধ সমবেদনায়। এরা জীবনে সম্যক স্ফূরণের পথ যদি পেত!

দেখা হলেই কাঁটার মত হুল ফুটিয়ে, পাপড়ির মত আলাপ—এ আর এক চরিত্র টালিগঞ্জে। কমল ভট্টাচার্যের যাবতীয় হুলের ভিতর আমি পেয়েছি প্রতিষ্ঠার সৌরভ। ইনি রঙিন চশমা পরে আমার সাহিত্যে যেটুকু দেখছেন বক্তব্যের উগ্র হলাহল—গাঢ় রং, তা' হচ্ছে সূচিকাভরণ, মুমূর্ষুর প্রাণ সঞ্জীবনী। আছেন পূর্ণ স্বাস্থ্যে, তাঁর পক্ষে এর প্রয়োজনের মূল্য বোঝা বড় সুকঠিন। তবে ইচ্ছে করলে ধীরেন বিশী বুঝিয়ে দিতে পারেন। একদিন এক সভায় বুঝেছিলাম, তিনি মৃত্যু এবং সাহিত্যের স্বাদ বেশ খানিকটা পেয়েছেন। আমি সবিনয়ে শিক্ষা নিলাম।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র পাণ্ডুলিপি এক কবি পাবলিসারের কাছে কপি-রাইট বেচতে চাইলাম।—শুধু একশ টাকা চাই।

২৭।৬।৫৮ সকাল ৮-১০টা

ইতঃপূর্বে নাট্যকার দিগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন দ্বিধা দ্বন্দ্বে কাটিয়ে একেবারে না করে দিয়েছেন। এখন ব্যবসার যে ব্যবস্থা তাতে নতুন বই প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু পেট এ যুক্তি মানে না। তাই এই কবি প্রকাশকের খোঁজ। যে পাণ্ডুলিপি পড়ে টালিগঞ্জে সংবর্ধনা, সেই পাণ্ডুলিপি পড়ে কবি মন্তব্য করলেন, অপাঠ্য!

বেকার জীবন—মাথার ঘায় কুকুর পাগল; ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, তেমন দেশে জন্মালে বিশ্ব বিখ্যাত প্রাইজ পেতাম। নমস্কার, উঠি।—আজ ভাবি এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি।

অবশেষে বিনয় ঘোষ যোগাযোগ করিয়ে দিলেন কমলা বুক ডিপোর সঙ্গে। কমলা বুক ডিপো 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' ও 'বে-আইনি জনতা' প্রকাশের নিলেন দায়িত্ব। মাসিক একশো করে দেড় হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। এখানে কপি-রাইট নয়, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের মাত্র চুক্তি। এঁরাও পাণ্ডুলিপি পড়েই নিলেন। যত মুশকিল তত আসান—এ সত্যটার আর একবার প্রমাণ পেলাম।

একুশে শ্রাবণ—তেরশ সাতান্ন। বৃষ্টি আর বৃষ্টি! সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছে সকাল বেলা। সভাপতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি মনোজ বসু। আহ্বায়ক কবিশেখর কালিদাস রায় এবং দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রিত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নারায়ণ, বাণী রায় প্রভৃতি। হল-ঘরে প্রায় হাজার লোকের ঢালাও আসর, কিন্তু দু' একটি উদ্যোক্তা ছাড়া আর কেউ নেই। মাছির হরফে হলেও সারা বাঙলা দেশকে সংবাদ-পত্রের মারফত আহ্বান জানিয়েছে টালিগঞ্জ। কোনো ত্রুটি নেই।

সেদিনও দাড়ি গোঁফ কামান হয়নি রামমোহনের। বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে চোখ বুঝি ঝাপসা। আর বুঝি সীতা উদ্ধার হল না। বৃথা হল এই বিপুল সমুদ্র শাসন। বৃথা হল যত ইট কাঠ শিলা মাটি বওয়া। বৃথা হল রাত জাগা—দুপুরের তীব্র তীক্ষ্ণ রোদ।

দু'টি ছোট ঘটনা ঘটেছিল এর মধ্যে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বলেছিলেন, ওঁর কোনো বই পড়িনি, কী করে সভাপতি হবো?

রাম বলেছিলেন নাকি, এই দু'খানা বই রইল। সম্ভব হলে পড়ে নেবেন, নইলে আমরা একজন সাহিত্যিককে একটা তোড়া দেবো—আপনি কী হাতে করেও দিতে পারবেন না?

এ যুক্তি অকাট্য। ডাঃ শ্রীকুমার আর আপত্তি তুললেন না। তখন আর আমার বই পড়া হল না। অনেকদিন বাদে তিনি আমার কয়েকখানা বই পড়লেন। প্রতিশ্রুতি ছিল 'বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' দ্বিতীয় সংস্করণে বিশদ আলোচনা করবেন। কিন্তু আমার সামান্য পরিচিতি দেয়া ছাড়া বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেননি। তিনি আমার সাহিত্যের অন্নারম্ভে ছিলেন প্রধান পুরোহিত। জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, যদি খনি গর্ভ থেকে মণি তুলতে পেরে থাকেন অমরেন্দ্র ঘোষ, তবে সংবর্ধনা জানাতে আপত্তি কি!

আমি বলি, হে পুরোহিত—মণি তুলতে কি পারিনি? যদি না-ই পেরে থাকি কঠিন আঘাতে আমার ব্যর্থতা জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনিই তো কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'চরকাশেম' সম্বন্ধে বলেছেন, "শরৎচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান সমাজের উপর ভিত্তি করিয়া যে নতুন ধরনের উপন্যাস রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অমরেন্দ্র ঘোষের এই উপন্যাসে পালিত হইয়াছে।...তাঁহার 'কুসুমের স্মৃতি' নামে ছোট গল্প সংগ্রহের মধ্যেও তাঁহার শিল্পবোধ, সাঙ্কেতিক পরিমণ্ডল রচনা ও আঙ্গিক বিন্যাস-নৈপুণ্যের নিদর্শন সুপরিস্ফুট।...উপন্যাসে

'যিনি একাগ্রভাবে সমাজনীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিশ্লেষণ তৎপর ছোট গল্পে আবার তিনিই স্বপ্নাবিষ্ট, সৌন্দর্য ধ্যানমগ্ন, ভাবতন্ময়।..."

আজ আমি সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছি—আশীর্বাদ আশীর্বাদই। 'বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-য় যা-ই ঘটে থাকুক, শনিবারের চিঠির ঝরা পাতায় তো অনেক কিছু রয়ে গেছে। এই জবান-বন্দির জীবন-ধারায় তা বইয়ে দিলাম। জানি একদিন আমি মরে যাবো—এ নশ্বরদেহ মিলিয়ে যাবে চিতায়, কিন্তু ওঁদের গড়া স্মৃতি ফলক রইবে অম্লান। কেউ কি চোখ মেলেও পড়বে না!—দাঁড়াও. পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! ..তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে... কিংবা আমার মত অনেক অশ্রু, অনেক অস্থি যখন জড়ো হবে একস্থানে তখন বাটালি ঠুকে কেউ কি আমাদের মূক ভাষা মুখর করে তুলবে না—

When you go home
Tell them and say,
For their to-morrow
We did to-day.

সংবর্ধনার কিছু আগেই আলাপ হয়েছিল অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। তাঁর হাতে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে বললাম, নিজের বিয়ের নিজে নিমন্ত্রণ করার রীতি নেই, কিন্তু আমি এলাম। টালিগঞ্জর তরফ থেকে ক'জন এসেছিলেন, আপনার সাক্ষাৎ পাননি। সাধারণ অতিথি হয়ে আপনি কি এ সভায় যাবেন?

কবে?

শনিবার, সকাল আটটায়।

নিশ্চয় যাবো। নিশ্চয়। ঐ দিনটি আমার একান্তভাবে সাহিত্যের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে।

শ্রাবণের একুশে। সাতটা নাগাত হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল।

আমি যখন এলাম হলঘরখানা লোকে লোকারণ্য। শাঁখ, মালা,

চন্দন নিয়ে মেয়েরা প্রস্তুত। আকাশে জল নেই, কিন্তু ঘরের ভিতর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। দল মত নির্বিশেষে সভায় উপস্থিত হয়েছেন কলকাতার তথা সারা বাঙলা দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক। সুধী রসিকজনের ভিড়ে তিল-রাখার ঠাঁই নেই।

২৮।৬।৫৮ রাত্রি—২-৫টা

কবিশেখর আহ্বান জানালেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকীয় মধুর কণ্ঠে বিশ্লেষণ করলেন আমার সংগ্রামী সাহিত্য জীবন। মনোজ বসু মজিয়ে দিলেন তাঁর বৈঠকী ঢংয়ের বক্তৃতায়। কিছু অতুলচন্দ্র গুপ্ত বললেন। বাণী রায় তো অতুলনীয়া। তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠে পেলাম নতুন করে 'চরকাশেম'-য়ের আস্বাদ। আমি সম্ভ্রমে মাথা নোয়ালাম জনতার কাছে। কে যেন বললে, এমন সভা অভূতপূর্ব। একটি পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকার তোড়া পেলাম হাতে। টিপে দেখলাম তেমন কিছু নেই। ভেবে দেখলাম, আগে এনেই খরচ করেছি প্রায় সব। তবু পুষ্পবৃষ্টি সত্য। আপাতত রামায়ণ এইখানেই শেষ। তাই বুঝি রামমোহন একান্তে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিতে হাসছেন।

২০।২।৫৯—বিকাল-৪টা

তরুণ কথাকার ও কবি শংকর চট্টোপাধ্যায় একদিন এলো। বহু তপস্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার কুটিরে এনেছিলাম। তারই আমন্ত্রণে এলো শংকর। সন্ধ্যা সাতটা কি সাড়ে সাতটা। জবানবন্দির পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছিলাম। হ্যারিকেনের আলোতে দেখলাম এক লম্বা চওড়া জোয়ান এসে হাজির। একেবারে ফিটফাট কেতাদুরস্ত অতি আধুনিক সাহেবী সজ্জা। একটু বিব্রত হয়ে বসতে বললাম বারান্দার সেই শয্যাসনে। ধূলাসনও বলা যায়। অনেক ছেলে-মেয়ে অতিথি বন্ধু নাতি-নাতনীর পদরজও রয়েছে এখানে। ক'দিন আগেই কাচা উচিত ছিল চাদরটা। গৃহিনীর আলস্যে যে তা হয়নি, সে-কথা

সত্য নয়। সোডা সাবান হয়েছে দুর্মূল্য। আর এক চিন্তা ঘন ঘন কাচলে এ চাদর কদিন যাবে! সাহিত্যদরদী আশুতোষ বাগল কী নিত্য এমনি অর্ঘ নিয়ে আসবে?

শংকর বললে, আপনার সঙ্গে হাজরা পার্কে একদিন অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল।

আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম, কিছুই মনে পড়ল না। একটা রেখাও আঁকা নেই। খুবই লজ্জিত হলাম নিজের দুর্বল মেধার জন্য।

তবু জবানবন্দি বেছে বেছে পড়ে শোনালাম। ঘণ্টা আড়াই কেটে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল?

দীপেন্দ্র নীরব। শংকর সরবে আঘাত দিলে। আমি চমকে উঠলাম। প্রতিবাদও করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হল। শংকরের আঘাত প্রেম শ্রদ্ধা আবেগ যুক্তিতে থরথর। আমি আমার জবানবন্দির দুর্বল অংশগুলো লেখকের সহজাত মায়ায় লালন করেছিলাম, সে উপড়ে ফেললে আগাছা। এবার বাটালি কেটে কেটে বসল। একবার পেয়ে হারিয়েছিলাম শংকরকে, এখন আর সে ভয় রইল না। হাজরা পার্ক থেকে এ বার এই প্রীতিভাজন দরদী নিষ্ঠুর বন্ধুকে নিয়ে এলাম মর্মের পার্কে। তাই জবানবন্দি অগ্নিশুদ্ধি করতে হল।

আরো একখানা চিঠি এসেছে, লিখেছেন গজেন্দ্র মিত্র। এ শুধু চিঠি নয়, মিত্রতার পরিচয়লিপি—জবানবন্দি অগ্নিশুদ্ধি করারই ইঙ্গিত। কৃতজ্ঞচিত্তে মনের পর্দায় টুকে নিলাম নির্দেশগুলো। আবার এ মিত্রকে এনে বসাতে হল মনের উদ্যানে। নিশ্চয়ই আমি জবানবন্দি ত্রুটিমুক্ত করতে যত্ন নেবো। কিন্তু সমস্ত প্রয়াস কী সফল হয়? এত দগ্ধে পুড়ে আমিই তো খাঁটি নই। আমি ত্রুটি তুমি ক্ষমা, আমি ব্যথা তুমি মহানুভবতা, নইলে কী পথ চলা যায়?

যখন অগ্নিশুদ্ধি করতে বসেছি, তখন আরো একটি স্মরণীয় ঘটনা যোগ করে দি।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার পর স্ত্রী দিয়েছিলেন অভাবের ওয়ার্নিং নোটিশ। 'ফুটি-ফুটি আশার কুঁড়ির তোড়া বেঁধেই প্রায় শেষ করলাম জবানবন্দি। কাগজ কলম রেখে দেখি, খোলা বাজারে চাল নেই, চৌদ্দ পয়সার কেরোসিন কালো বাজারে আট আনা। মাঝে মাঝে কয়লা উধাও, ডালের দর আকাশ ছোঁয়া! ওষুধ পথ্যের কথা আর বলব কী! ছেলেমেয়ে স্ত্রীর জামাকাপড় আর না হলেই নয়। সভ্যতার এ প্রগতি তো আমরা কেউ কখনো আশা করিনি! কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে দেখলাম বই পাড়া ঝিমাচ্ছে। কাগজ সংকট অনেকদিন, এবার অবস্থা চরম। এখান থেকে একটি পয়সাও পাওয়া সম্ভব নয়। ধার হয়ে গেছে প্রায় তিনশ। লেখা আমার পেশা—ভিতরের বুড়ো পেশাকরটা ডুকরে উঠতে চাইলে।

তবে কী আশার তোড়াটা শুকিয়ে গেল? একটি কুঁড়িও জীবিত নেই? তবে কী বিবেকানন্দ দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি মিথ্যা? মিথ্যা অজয় ঘোষ, যে এসে প্রথম সাহায্য তহবিলে রাখলে একখানি দশ টাকার নোট ও কিছু ফল? কত আশার চিত্রই যে এঁকেছিল সেদিন অজয়।

কদিন অন্ধকারে কাটল—কাটল যম-যাতনার ভিতর। একখানা সিম্বলিক উপন্যাস লিখব ভেবেছিলাম, একটা কাঠামোও স্থির করেছিলাম। কিন্তু নিজেই তো স্থির হতে পারছিনে। এই কাঠামোর মালমসলা দিয়েছিলেন ভূপতি মজুমদার মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। রাইটার্স বিল্‌ডিংয়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে দেখা। তিন দিক ঘিরে সভাসদ, কিছু আবেদন-নিবেদনকারী। মাননীয় মন্ত্রী উত্তর বঙ্গের নদীপথের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তোর্ষা তিস্তা মহানন্দা করতোয়া। তারপর পদ্মা। অনেক সভ্যতার উত্থান পতন, বহু জাতির জাগরণ ও ক্ষয়। প্রামাণ্য সাল তারিখ দিয়ে যা-কিছু বলছিলেন মাননীয় অভিজ্ঞ মন্ত্রী। আমি ভেসে এলাম কীর্তিনাশা

ও মেঘনার পথে নিম্ন বঙ্গে। পড়লাম হেমিংওয়ে, হেনরি মিলার, হাওয়ার্ড ফাস্ট কিন্তু তৃপ্তি পেলাম না। আরও দু একখানা একালের বিশ্ববিখ্যাত চটি বই পড়লাম। আমার মনে হল যতটা প্রচার ততটা বস্তু নেই। বাংলাদেশে ছাপা কেন, হয়ত পাণ্ডুলিপির সূতিকাগারেও আছে এগুলোর তুলনায় সেরা বই। আবার টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ গোর্কি ওল্টালাম। মন ডুবে গেল গভীর রসে। মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল, সাগরের বদ্বীপ থেকে হিমালয়ের চূড়া পর্যন্ত বিরাট এক পটভূমি। একটা মরা হাঙর, কানশায় তার কালচে রক্ত। লোভ মানুষকে যে কোথা থেকে কোথা টেনে নিয়ে যায়, মৃত্যুরূপিনী বাইজি বাজায় পায়ের ঘুঙুর—পরিণতি দিয়ে সুরু, মরা হাঙরটা হচ্ছে সিম্বল। একটা ছোট গল্প লিখে ছাপতেও দিলাম। কিন্তু উপন্যাস লিখতে হলে ঘরে রসদ চাই।

কোনো উপায়ই করা যাচ্ছে না। গা এলিয়ে দিয়ে রয়েছি নির্যাতনের শরশয্যায়। হিতৈষী খগেন দাশ এলো। সে নাকি-একটি কথারসিকের সন্ধান পেয়েছে। আশ্চর্য হলাম, তার বালক-বালিকার টিউসনির রাজ্যে তো এব্যক্তির আবির্ভাব স্বাভাবিক নয়! ছুটলাম লাঠিতে ভর করে। আমার মালা গাঁথা এখনো শেষ হয়নি, যদি একটি মরকত কী নীলার টুকরা পাই। মঞ্জুলবরণ বসু শুধু সাহিত্য-রসিক নয়, আদর্শবাদী যুবক। লেখার প্রতিও বেশ কিছুটা ঝোঁক। রুমাল ছিল না, হৃদপিণ্ডের কাছে পকেটে ভরে আনলাম দুর্লভ ব্যবহার। আজ অনেক লিস্ট বাড়িয়ে মূল্য কমাব না। শুধু একটি ঘটনা জবানবন্দিতে গেঁথে রাখলাম। যদি সন্ত্রাসের রাজত্বে এ শহরে কারফিউও চলে, চলে অহিংস বুলেটে মানুষ শিকার—তুমি সপরিবারে দৈনিকের চিন্তায় ভাবিত, রাত্রির অন্ধকারে সে তখন পাঁচ মাইল পথ সাইকেল হাঁকিয়ে তোমার দুয়ারে উপস্থিত। তোমারই রেশনের জন্যে হাতে তার একখানা দশটাকার নোট। তখন টাকা নেবো না মানুষটাকে জড়িয়ে ধরব —এ এক ফ্যাসাদ।

এমনি ফ্যাসাদে পড়েই মঞ্জুলবরণ বসুকে চিনেছি, যে নিজের আলোকে নিজেই ভাস্কর তার কথা বেশী বলে লাভ নেই।

সীতাকে একবার মাত্র অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল, আমাকে দিতে হল বারবার। আবার জবানবন্দি শোধন করার হুকুম এলো কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে। ইনি এযুগের স্টিম-লঞ্চে সে-যুগের আদর্শ পারাপারে ব্যস্ত। সততা মানবতাবোধ এর বাণিজ্যের মূলসূত্র। ভেজালের মহোৎসবে নির্ভেজাল ঘৃত। আবেদন জানালাম, আপনার পরিচয় দিয়ে জবানবন্দির ঐশ্বর্য বাড়াতে চাই। এ ব্যক্তির যেমন চরিত্র আলাদা, নিষ্ঠুরতাও ভোলার নয়। বললেন, না—ওসব আমার নীতি বিরুদ্ধ। তবে এই প্রথম নয়, আরো সীতাকে দহন করা হয়েছে, অনেক খাদকে পুড়িয়ে খাঁটি। কিন্তু কোনো মহাকাব্য রচনার সুযোগ দেননি কেউকে। আশ্চর্য এই ঘাড়-খাটো চশমা-চোখে মাঝারি-গোছ কালো মানুষটি! জবানবন্দিতে নাম রইল না, পরিচয় দিতে পারলাম না যেমন দেয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার মুখের জবানবন্দি সেন্সর করা কাউর সাধ্যায়ত্ত নয়। আমি রটিয়ে যাবো, জানিয়ে যাবো যতদিন বেঁচে আছি। যে মহতের ইতিহাস নেই, তাঁর লোক-কথা, প্রবাদ-কথাই প্রামাণ্য। এ পৃথিবীতে এমন দলিল অনেক আছে। আমি না হয় আর একখানা যোগ করব।

এবার জবানবন্দি শোধন করার সাক্ষী শ্রদ্ধেয় শুভেন্দু ঘোষ। যোগাযোগের মাধ্যম বিশ্বহিতৈষী সাধন চাটার্জি। শ্রীঘোষ—কবিরাজ হলে বলতাম ভেষগাচার্য। কারণ এমন প্রবীণতা অভিজ্ঞতা দেখেছি খুব কমই। তিনি দু'দিন আমার এখানে এলেন, পাঠ শুনলেন মন দিনে, বারবার চা খেলেন বুঝি তার চেয়ে মন দিয়ে। প্রথম ভুল বুঝলাম, তারপর চিন্তা করে ধরলাম, এ চা-র পিপাসা নয়, একাগ্র করলেন মনীষীর মন উত্তাপ ছুঁইয়ে। একটি সত্যিকারের জগতের সমস্ত অলংকার শাস্ত্রে পারঙ্গম ব্রহ্মচারীমনা

মানুষের সন্ধান পেলাম 'শিল্প দর্শনের ভূমিকা'-য়। এ ক্ষীর হজম করার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য চাই, বিশেষ পাকস্থলী। শুভেন্দু ঘোষ পাঠ শুনে বললেন, আপনি যখন মানুষের কথা জবানবন্দি দিতে পেরেছেন, এর চেয়ে বড় সাহিত্য কিছু নেই। তর্ক কিছু থাকবেই, তর্ক হল সাহিত্যের অঙ্গাভরণ। আমি কিন্তু 'শিল্প দর্শনের ভূমিকা'র ভাষায় বুঝলাম—'সাজ', 'শোভা'।…'শোভা শব্দের মধ্যে শুভের অর্থাৎ মঙ্গলের বাচকতা সুস্পষ্ট।'… 'যেমন শাখা সিঁদুর।'

এ গেল আমার ধারণা—কিন্তু প্রতিজনেব লিখনীর বর্ণনা আমাতে সম্ভব নয়। তাই 'শিল্প দর্শনের ভূমিকা' আবার ওল্টালাম। 'কোনো বস্তুর গুণের ধারণা করতে হলে, তাকে তার পরিবেশের মধ্যে, তার বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে দেখতে হয়। গুণ বোঝাতে চাই বিশেষণ; বিশেষণের জন্য চাই বস্তুকে বিচিত্র সম্পর্কে আনয়ন। ইন্ধনের সম্বন্ধে এসে আগুন হয় দাহক, সোনার সম্বন্ধে এসে হয় দ্রাবক ও পাবক, আবার অন্ধকাবে এসে হয় দীপক।'

আমি এই জনারণ্যে র হট্টগোলে একখণ্ড কস্তুরী পেলাম। চারিদিক সৌরভে থৈ থৈ। তাই জবানবন্দি অগ্নিশুদ্ধি ইতি করলাম।

কয়েকটা দিন বিশ্রাম করে নেই।

টালিগঞ্জের বন্ধুদের অনেক আগেই জানিয়েছিলাম অভাবের সংবাদটা। হঠাৎ শুনলাম আবার সংবর্ধনার আয়োজন—অন্তত পাঁচশ এক টাকার একটি থলে পূর্ণকরা শপথ। দেখছি দক্ষিণারঞ্জন ফুটছেন, বিবেকানন্দ ফুটছেন, ফুটছেন বাঙলার বিধান সভায় জ্যোতি বসু আমাব পরিবারের ক্ষুৎপিপাসার স্বপক্ষে। চিঠিতে প্রীতি ও সহানুভূতি মাখিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন হরিপদ মহলানবীশ। কিশোর গুহ তো চির অন্তরঙ্গ। শীতের দেশে অসংখ্য গোলাপ, কিন্তু এই ছ-ঋতুর দেশেও কম নয় সংখ্যা এবং নাম।

দেবব্রত রায়চৌধুরী ও শম্ভু গাঙ্গুলী অগ্রণী হয়ে দিলেন সংবর্ধনার প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য আড়াই শ টাকা ধার, কানু চন্দ মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে। চাকা ঘুরল—অদৃষ্টের, অর্থের, মানুষের শুভবুদ্ধির।

মন টলল মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের। তিনি চ্যারিটি শো-র জন্য 'পথের পাঁচালী' বিনা মূল্যে দিতে স্বীকৃত হলেন।

দেখছি শান্তনু শিরোমণি ফুটছে, শিবদাস ভট্টাচার্য ফুটছে, প্রণয় ফুটছে—সঙ্গে তার প্রণয়িনী। দেখছি সত্য হচ্ছে যত শ্রদ্ধা প্রীতি অনুরাগ।

আমি যোগাযোগ রাখছি নিয়মিত। আমার সংবর্ধনা যখন, তখন এটা অনিয়ম। ফুল ফুটছে—কী করে আমি নিয়ম মেনে চলি; সুগন্ধ ছড়াচ্ছে কী করে আমি বাতায়ন বন্ধ রাখি? সংগৃহীত টাকা ফুরিয়ে যাবে ছদিনে, কিন্তু এদের স্পর্শ তো ফুরাবে না। আমি মরে গেলেও জড়িয়ে থাকবো সাহিত্যের এক কোণে। বলত কী করে আমি আমার মনের জানালা ভেজিয়ে রাখি এই শুভক্ষণে?

এবার প্রধান উদ্যোক্তা কে তা বলা কঠিন। সবিশেষ অনেকে। এলেন অমরেশ চৌধুরী, কখনো বিংশ শতকের প্রথম পাদের চাপ দাড়িওয়ালা এক বনেদী যুবক, ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। কালো সরু কারে পকেট ওয়াচ। আবার একদিন মাথায় ফেজ, গায় লংকোট, পরনে প্যাণ্ট। যেন এক আফগান অভিজাত—চোখ দুটোতে হীরার জ্যোতি, ইনি মনে প্রাণে আর্টিস্ট। এঁর সহযোগিতাও তেমনি শিল্পসম্মত।

এলেন রক্তের চাপ তুচ্ছ করে অমল দাশগুপ্ত। এলেন ডঃ শিবপ্রসাদ বসু মহা কর্মব্যস্ত, জীবনের কফালি ছিনিয়ে নিয়ে। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সেবা একেবারে ভিন্নমুখি গাণিতিক। কে কী নিলে এবং দিলে তার নির্ভুল হিসাব। এবার সংবর্ধনার টিকিট বেচে—তিল কুড়িয়ে তাল। তাই সে অত্যন্ত জরুরী। একদা

এর দাদা পরিতোষ নানা প্রয়োজনে আমাকে প্রায় ঘাড়ে নিয়ে ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন রোমান্টিক—কনিষ্ঠ ঠিক উল্টো পিঠ।

মানিক শেঠের আর এক রূপ! ব্যাকুলতা কর্ম এবং কুশলতায় সে যেন দীপ্ত হয়ে উঠল। আমি রুগ্ন দুর্বল ব্যয়ের জরায় জর্জরিত, বাতায়ন খুলে দেখছি, গোলাপ বনে মানিক জ্বলছে—একটি নয় দুটি নয় অনেক কর্ম চাঞ্চল্য, অনেক প্রাণ মাতান সুগন্ধ।

এবার ঘটনাচক্রে তারাপদ চক্রবর্তী অমরেন্দ্র ঘোষ সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি। অধীর ভট্টাচার্য দৈনন্দিন কুশল জিজ্ঞাসায় ব্যগ্র। দেখা না হলেও দেখা হওয়ার অধিক।

একটা মোটা ফাইল তৈরী হয়ে গেছে। তারাপদ চক্রবর্তীর গাড়ি বাড়ি ফোন খাটছে আমার জন্য। আর একটা বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলে নেমে আসছে তাঁর বৈঠকখানায় চা-গরম, সময় সময় খাবার—সুদৃশ্য কাপে এবং নক্সি ডিসে। অদৃশ্যে একটি স্নেহময়ী মূর্তি রয়েছেন যাঁর নাম আজো জানা হয়নি। কিন্তু তাঁর ছোঁয়া রয়ে গেছে, রয়ে গেছে উষ্ণ আপ্যায়ন। নাম নাই বা জানলাম, ধাম তো চিনলাম দেবীর। যে মন নিয়ে একদিন শৈলজা চৌধুরীকে প্রণাম করেছি, সেই মন নিয়ে এখানেও একটি প্রণাম রাখি।

একটু কলম থামালাম, তোমরা অসহিষ্ণু হয়ো না কেউ। একটু সমাহিত হতে দাও আমাকে।

সামান্যই আলাপ ছিল পবিত্রকুমার রায়ের সঙ্গে। এই ছিট-ছিট কথা ও কাহিনী তাঁর ঐতিহাসিক বন্দী জীবনের। সুভাষ বসু, জে. এম. সেনগুপ্ত, মুজাফ্ফর আমেদ, জহরলাল নেহেরু তাঁর কাহিনীর নায়ক। এবার সংবর্ধনার সেতুযোগে অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম পবিত্রকুমারের। একদা ইনি ছিলেন ইংরেজের জেলে, বর্ধমান আলিপুর ও নানা স্থানে। আজো বন্দী ইস্ট ইণ্ডিয়ার উঁচু চেয়ারে। বোঝা বোঝা দায়িত্বের ডাণ্ডাবেড়ি। এখনকার ইস্ট

ইণ্ডিয়া মানে কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। এখনো কথায় কাজে কর্মীসুলভ তৎপরতা। সেই রাজনৈতিক স্মৃতি। ওঁর সীমিত গণ্ডীর ভিতর মানবিক শর্তগুলো নিয়ে আজও উনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। ওঁর জীবনে অনেকগুলো পলেটিক্যাল বড় বড় অধ্যায়। সবগুলো পাঠ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু অন্তরঙ্গ হয়ে রইলাম আশায়। সে আশা কী পূর্ণ হবে আমার? যদি না-ও হয়, মহিমা বাঁচে নিজস্ব মহিমায়।

অনেক ঝামেলা অনেক কাজের চাপ তবু কুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার প্রথম সংবর্ধনার সময় খোঁজ নিয়েছেন অভিভাবকের মত। এবার তাঁর ছেলে সুধীর অন্যতম সম্পাদক। বৃদ্ধ বটের তরুণ ঝুরি মাটি স্পর্শ করেছে মহা উৎসাহে। দেখলাম প্রচার-পত্রে টালিগঞ্জের বিশিষ্ট এক নেতার নাম, ভূতপূর্ব মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এই প্রমথ মিত্র। এঁর কর্মতৎপরতা অসামান্য। আমি ভিন্ন পথের পথিক। এঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু আমি সুগন্ধে থমকে থাকি। ফুটছেন বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত শুভেচ্ছায়, ফুটছেন নির্মলকান্তি বসু পিচগলা দুপুরে তাঁর প্রিয় ঘনপত্র নিমগাছটির ছায়ার মত। সংবর্ধনার প্ল্যাকার্ডে পোস্টারে ফুটছে শিল্পী বীরেন ঠাকুরতা। সোনা-সুনীল নন্দীতে তো যমজ গোলাপের মিল। বরেণ্য হচ্ছে বরেন। এসেছে কথাকার বিজন ঘোষ সমমর্মিতায়।

আমি প্রায় মৃত্যু-শয্যায় হাসপাতালে। তখন একটি দিনের জন্যও দেখিনি নির্মল সিংহকে। বুকে দাগ ছিল আমার। এবার এলো ভগীরথের মত গঙ্গাধারাকে নিয়ে। আমার পরিচয় পত্রিকায় তার শঙ্খধ্বনি। আজো বিস্ময়ে অভিভূত হই, হে মহামানব তোমার কত বিচিত্র রূপ! হে কবি আমিই কী তোমার কবিতা? যদি একটি পংক্তিতেও সার্থক হয়ে থাকি, আমি ধন্য। সমস্ত কয়লার দাগ ধুয়ে গেছে গঙ্গোদকে। 'অমরেন্দ্র ঘোষ পরিচয় পুস্তিকা' শুধু

কী আমারই গৌরব, না তোমারও! আমার মাথা নত করে দিয়েছ যে চরণ ধূলার সঙ্গে!

কেন্দ্রীয় সরকার কুচবিহারকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল বাঙলার বুক থেকে। তারাপদ চক্রবর্তী নাকি ছিলেন প্রতিবাদের অন্যতম হোতা। তিনি সেদিন যে মন এবং সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন, দেখলাম তারই একটু ছায়া এখানে। সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত আয়োজন সিদ্ধ করতে হবে। শ্রীচক্রবর্তীই মন টলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর। এবার নির্মলের সঙ্গে পোস্টার নিয়ে ছুটছেন নিজের পেট্রোল পুড়িয়ে। পাঁচ শ এক টাকার শপথ হাজারের কোঠায় নিতে পারলে ভাল হয়।

একদিন বলেছিলাম, আবার সংবর্ধনা কেন? এতো ভিক্ষা চাইছি আমি।

তারাপদ চক্রবর্তী জবাব দিয়েছিলেন, ও কথা বলবেন না সাহিত্যিক। বরেণ্যকে যা-ই দিই আমরা, বরণ করে দেয়াই রীতি।

তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে শরীর, আমি চুপ করলাম।

৮-ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এলেন ভবানী প্রেক্ষাগৃহে। আজকার অনুষ্ঠানের তিনি সভাপতি।

ভবানী প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। টালা থেকে পর্যন্ত এঁসেছেন কথাকার বীরেশ্বর বসু। নিজে রুগ্ন, তবু কী যে প্রাণের টান! দেখলাম রবি পণ্ডিত এ্যামেচার ফটো আর্টিস্টকে।

ধিকিধিকি ক্ষয় হচ্ছে শরীর, তবু আমি বাতায়ন বন্ধ করিনি। ফুটছেন কবি-বন্ধু গোপাল ভৌমিক অনেক দূরে, ফুটছেন ভূষণচন্দ্র দাশ আরো দূরে। ফুটছে বিশ্ব নিখিল আজ আমার চোখে। কাকে রেখে যে কার দিকে তাকাই! ক্ষয় হচ্ছি তিলে তিলে, একী আমার পরাজয়?

অচিন্ত্যকুমারের স্বভাবসিদ্ধ কম্বুকণ্ঠে মীমাংসার সূত্র পেলাম।

অমর, অমর। ইন্দ্র তার অধিপতি। ঘোষ হচ্ছে ঘোষণা। ভারত বিভাগ যেমন এক ইতিহাস, অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্যে পুনরাবির্ভাবও এক সাহিত্য ইতিহাস। একদিকে পদ্মা ও মেঘনায় সাম্প্রদায়িক ভাঙন—'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'। আর এক-দিকে অজস্র প্রীতির 'চরকাশেম' জাগছে।

অচিন্ত্য ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—শতায়ু হও।

এবার আমাকে কিছু বলতে হবে, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবার কোষাধ্যক্ষ। তাঁর মারফত একখানা চেক আসল হাতে। পাঁচ শো একটাকা। তিন শো ধার। বাকি মাত্র দুশো।

দেবপ্রসাদ সত্যই দরদী প্রতিবেশী। মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, অমন শুকনা দেখাচ্ছে কেন? শরীরটা কী খুবই খারাপ যাচ্ছে?

তাঁর ব্যক্তিগত প্রশ্নের আর জবাব দিলাম না। ভাষণ সুরু করলাম। বললাম—

আমি আজ বিচলিত হয়েছি। তাই বেশী কিছু বলতে পারব না।. তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে আমি পূর্ববাঙলায় বসে গোলা কেটে ধান দিয়েছিলাম, প্রত্যেকের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে রেখেছিলাম যখন শস্য উঠবে তখন তারা আমায় ষোলআনা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেহ সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। পরবর্তীকালে যখন পশ্চিম বাঙলায় ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নিয়ে এলাম, তা বহুর আশীর্বাদে পূর্ণ। একদিন দীলিপ গুপ্ত, অতুল গুপ্ত প্রভৃতি দানে সত্য হয়েছিলেন, আমি গ্রহণে। আজো দেখছি তাই।

আমি খাগড়াই কাঁসার বড় একখানা থালা পেয়েছি, পেয়েছি ধুতি চাদর টাকা মালা, তবু বিচলিত হয়ে মোটরে বাড়ি ফিরলাম। আবার উদগ্র ক্ষুধার আশঙ্কায় কোথায় নেমে গেলাম কে জানে!

আজ রামমোহন কাছে থেকেও তাঁর পারিবারিক এবং ব্রতজীবনে বহুদূরে অপস্রয়মান। রামপরায়ণও প্রায় তাই। সে

জন্য নালিশ নেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্যথা লাগে যখন সেল্‌টারহীন ভাবে একা একা ঘুরে বেড়াই অনিদ্রায়। আমার জীবনে শুধু দুই রাম সত্য নয়, আজ বহু রাম সত্য। তবু প্রশ্ন অহল্যার অর্ধ অঙ্গ কেন আজো পাষাণে? বিংশ শতকের রামায়ণে তার কী পরিপূর্ণ বাঁচার দাবি নেই?

জবানবন্দি শেষ হয়ে এলো। আমি ভগবান তথাগতর বহু ভঙ্গির বহু মূর্তি এঁকেছি। দীপ জ্বেলেছি, মাল্য দিয়েছি, মাথা নুইয়েছি শ্রদ্ধায়, যদি কিছু বাদ গিয়ে থাকে, হয়ে থাকে ত্রুটি —প্রসন্নপুরুষের কাছে করজোড়ে মিনতি জানাই, আমার যত সাধ তত তো সাধ্য নেই।

২৮. ২. ৫৯.

অমরেন্দ্র ঘোষ

৩৮ প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড

কলিকাতা ৩৩.